NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Choice Based Credit System
(CBCS)

SELF LEARNING MATERIAL

HCO
COMMERCE

CC-CO-10
Entrepreneurship Development

Under Graduate Degree Programme

উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ'-গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল' / 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সামনে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধা। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক—উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই নতুন শিক্ষাক্রম এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে নির্বাচনভিত্তিক এই পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি. কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস. পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের পরম্পরা অনুযায়ী অন্যান্য বিদ্যায়তনিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এই নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একথা বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ে উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির এই বিদ্যায়তনিক উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। মুক্তশিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

পরিচিতি

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Under Graduate Degree Programme

Choice Based Credit System (CBCS)

(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)

বিষয় : সাম্মানিক বাণিজ্য (Commerce)

Subject : Honours in Commerce [B.Com (H)/(HCO)]

Entrepreneurship Development

Course Code : CC-CO-10

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, 2022

First Print : August, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Under Graduate Degree Programme

Choice Based Credit System (CBCS)

(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)

বিষয় : সাম্মানিক বাণিজ্য (Commerce)

Subject : Honours in Commerce [B.Com (H)/(HCO)]

পাঠক্রম : উদ্যোগ উন্নয়ন

(Entrepreneurship Development)

Course Code : CC-CO-10

: বিষয় সমিতি :

সদস্যবৃন্দ

ড. অনির্বাণ ঘোষ
Professor of Commerce, NSOU
(Chairperson)

ড. সজল কুমার মাইতি
Professor of Commerce (PG Dept.)
Hooghly Mohsin College

সি. এ. শুভায়ন বসু
Associate Professor of Commerce
Ananda Mohan College

ড. চিত্তরঞ্জন সরকার
Professor of Commerce
Netaji Subhas Open University

উত্তম কুমার দত্ত
Professor of Commerce
NSOU

ড. আশিষ কুমার সানা
Professor of Commerce
University of Calcutta

শ্রী সুদর্শন রায়
Assistant Professor of Commerce
NSOU

শ্রী তপন কুমার চৌধুরী
Associate Professor of Commerce
Netaji Subhas Open University

: রচনা :

ড. বিশ্বজিৎ ভদ্র
Associate Professor of Commerce
Netaji Nagar College

: সম্পাদনা :

ড. উত্তম কুমার দত্ত
Professor of Commerce
NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

UG : Commerce
(HCO)

উদ্যোগ উন্নয়ন
(Entrepreneurship Development)
Course Code : CC-CO-10

পর্যায়-1

একক-1 ❑ সূচনা 7–31

একক-2 ❑ উদ্যোক্তার গুণাবলী 32–40

একক-3 ❑ উদ্যোগের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন 33–53

একক-4 ❑ কারবারি ধারণার উৎসসমূহ এবং সম্ভাব্যতা পরীক্ষা 54–90

পর্যায়-2

একক-5 ❑ সম্পদ সংগ্রহ 55–109

একক-6 ❑ ভারতবর্ষে পারিবারিক কারবারি উদ্যোগ 110–129

একক-7 ❑ অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারি সংস্থা 130–140

একক-8 ❑ বিভিন্ন প্রতিনিধির ভূমিকা এবং কার্যাবলি 141–159

গ্রন্থপঞ্জী 160

একক-1 ❑ সূচনা (Introduction)

গঠন

1.0 উদ্দেশ্য

1.1 প্রস্তাবনা

1.2 উদ্যোগগ্রহণের সংজ্ঞা

1.3 উদ্যোগগ্রহণের প্রকৃতি

1.4 উদ্যোগের উপাদানসমূহ

1.5 উদ্যোগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

1.6 উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্ব

1.7 নতুন উদ্যোগের (স্টার্টআপ) ধারণা

1.7.1 নতুন উদ্যোগের মৌলিক সমস্যাসমূহ

1.7.2 নতুন উদ্যোগের সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ

1.8 উদ্যোগের ক্রমবিকাশ

1.9 উদ্যোগ কর্মজীবন হিসেবে

1.10 সারাংশ

1.11 প্রশ্নাবলী

1.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন—

- উদ্যোগ গ্রহণ বলতে কী বোঝায়?
- উদ্যোগ গ্রহণের প্রকৃতি, গুরুত্ব।
- উদ্যোক্তার সংজ্ঞা ও ভূমিকা।
- উদ্যোগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ
- উদ্যোগের উপাদনসমূহ
- উদ্যোগের ক্রমিবকাশ
- নতুন উদ্যোগ সংক্রান্ত ধারণা

1.1 প্রস্তাবনা

উদ্যোগ গ্রহণ হল একটি বিশেষ কর্মপ্রক্রিয়া। যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সেই দেশের কারবার কেমনভাবে চলছে তার উপর অনেকাংশ নির্ভর করে। আবার কারবার এমনি এমনি গড়ে ওঠে না। যে সব কারবার আজ খ্যাতির শীর্ষে তার পেছনে সংশ্লিষ্ট কারবারের উদ্যোক্তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এবং উদ্যোক্তাই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি প্রতিষ্ঠান তৈরী করা থেকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সমস্ত বিষয়েই তীক্ষ্ণ নজর রাখেন এবং প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনশীল করে তোলেন। কীভাবে বিষয়গুলি সম্ভব তা এই একক থেকে ধারণা পাওয়া যাবে।

1.2 উদ্যোগ গ্রহণের সংজ্ঞা

উদ্যোগ হল এমন এক বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা যা কোনো সুযোগকে কাজে লাগায় ও নতুন কিছু সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ঝুঁকি গ্রহণ করে। যারা উদ্যোগ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন তাদের উদ্যোক্তা বলা হয়। উদ্যোক্তা একজন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তি হতে পারেন। এই এক বা একাধিক ব্যক্তির প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা ও শ্রমকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ বলা হয়। উদ্যোক্তার ইংরাজি শব্দ হিসাবে 'Entrepreneur' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও তা কিন্তু ফরাসি শব্দ 'Entreprendure' থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এর থেকেই উদ্যোগের ইংরাজি প্রতিশব্দ Entrepreneureship-এর উদ্ভব হয়েছে। বস্তুত সংক্ষেপে উদ্যোগ বলতে বোঝায় কোনো কিছু উদ্ভাবনের ক্ষমতা যার ফলশ্রুতিতে নতুন কিছু সৃষ্টি হয়। সেকারণে উদ্যোগ বলতে বোঝায় নতুন কিছু সৃষ্টি করার লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা, সংগঠন গড়ে তোলা, বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় করা, ঝুঁকিবহন করা ও সাথে সাথে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করা। উদ্যোগের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। তবুও বিভিন্ন বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগের যেসব সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নীচে তুলে ধরা হল।

বেনজামিন হিগিনস (Benjamin Higgins) উদ্যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ''উদ্যোগ হল দূরদর্শিতার সঙ্গে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের সুযোগ সংক্রান্ত কার্যাবলি, কোনো নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য সংগঠন গড়ে তোলা, মূলধন সংগ্রহ ও কর্মী নিয়োগ, কাঁচামালের যোগান অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা এবং সংস্থার দৈনন্দিন কার্যকলাপ দেখভাল করার জন্য শীর্ষ ব্যবস্থাপকের নির্বাচন।''

রবার্ট রনস্টাড (Robert Ronstad) প্রদত্ত সংজ্ঞাটির গ্রহণযোগ্যতা সর্বাধিক। উদ্যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রনস্টাড বলেছেন, ''ক্রমবর্ধমান সম্পদ সৃষ্টির সচল প্রক্রিয়াই হল উদ্যোগ। সম্পদ সৃষ্টিতে এক বা একাধিক ব্যক্তি যুক্ত থাকে যে ওইসব পণ্য বা সেবা নতুন নয়, তবুও উদ্যোক্তাকে ওইসব পণ্য বা সেবার মধ্যে নিজের দক্ষতা ও কর্মকুশলতার মিশ্রণ ঘটাতে হয় যাতে পণ্য বা সেবার মূল্য বৃদ্ধি পায়।'' এই সংজ্ঞার সারবত্তা হল যে উদ্যোগ হল এমন এক প্রক্রিয়া যাতে উদ্যোক্তা দুঃসাহসিক কাজের ঝুঁকি বহন করে।

জে. সি. বার্না (J. C. Berna) সংক্ষিপ্তাকারে উদ্যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে ''উদ্যোগ হল এক ধরনের মানবিক দক্ষতা। অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে উদ্যোগ হল দক্ষতা ও সক্ষমতার সংযুক্তিকরণ।''

প্রখ্যাত ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ **পি. এফ. ড্রাকারের** (P. F. Drucker) মতে, ''সম্পদকে প্রগতিশীল কাজের উদ্দেশ্যে পরিচালনা করাই হল উদ্যোগ গ্রহণ।''

এম. সি. গুপ্তা (M. C. Gupta) উদ্যোগ সম্পর্কে বলেছেন, ''উদ্যোগ হল বিনিয়োগ ও উৎপাদনের সুযোগ সন্ধানের কাজ। বিনিয়োগ ও সুযোগ সন্ধানের এই প্রক্রিয়ায় মূলধন সংগ্রহ ও উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সংগঠন গড়ে তোলা, মানবিক সম্পদ ও কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা, কৌশল চূড়ান্ত করা ও ব্যবস্থাপক নির্বাচন করা আবশ্যক।''

প্রায় একই সুরে উদ্যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **পল. এইচ. উইলকেন** (Paul H. Wilken) বলেছেন—''উৎপাদনে পরিবর্তন শুরু করাই হল উদ্যোগ। উদ্যোক্তা সবসময়ই পরিবর্তনের সন্ধান করেন, পরিবর্তনে সাড়া দেন এবং পরিবর্তনকে সুযোগ হিসাবে গণ্য করে পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই নিজের স্বার্থপূরণ করেন।''

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ **জোসেফ শ্যুমপিটার** (Joseph Schumpeter) উদ্যোগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটি বিখ্যাত উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, ''উদ্যোগ হল গঠনমূলক ধ্বংস শক্তি (A force of creative destruction)। অর্থাৎ কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রচলিত পদ্ধতিকে বাতিল করে নতুন ও অপেক্ষাকৃত ভালো পদ্ধতির প্রয়োগ প্রক্রিয়াই হল উদ্যোগ।''

পরিশেষে উপরের সংজ্ঞাগুলির প্রেক্ষাপটে উদ্যোগের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়, ''যে প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক ব্যক্তির ক্ষমতা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতার সমন্বয়ে উৎপাদিত কোনো পণ্য বা সেবার মধ্যে বিশেষ কোনো মূল্য সৃষ্টি করা যায় সেই প্রক্রিয়াকে উদ্যোগ বলে।''

1.3 উদ্যোগ গ্রহণের প্রকৃতি

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন যে, উদ্যোগ গ্রহণ হল এমন একটি প্রচেষ্টা যার সাহায্যে ক্ষমতা, দক্ষতা, আকাঙ্ক্ষা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগানো যায়। উদ্যোগ গ্রহণের প্রকৃতি নীচে আলোচনা করা হল :

(ক) উদ্যোগ গ্রহণ একটি প্রক্রিয়া : উদ্যোগ গ্রহণ যেহেতু নির্দিষ্ট একটি কাজ করা নয়, পারস্পরিক বহু কাজের সম্মিলিত একটি প্রচেষ্টা, তাই এটিকে একটি প্রক্রিয়া বলা হয়।

(খ) সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন : সৃজনশীলতা হল একটি প্রতিভা যা নতুন ধারণার জন্ম দেয় এবং যার ফলস্বরূপ নতুন দ্রব্য এবং সেবা সৃষ্টি সম্ভব। এই নতুন সেবা এবং দ্রব্যকে নতুন স্তরে উন্নীত করাকে উদ্ভাবন বলে। উদ্যোগ গ্রহণের প্রকৃতি হল সৃজনশীলতা-উদ্ভাবন সৃষ্টিতে সাহায্য করা।

(গ) **নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন :** উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্ভব হয়। কাঁচামাল সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে মানবিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার উদ্যোগ গ্রহণের অন্যতম প্রকৃতি।

(ঘ) **গতিশীলতা :** ব্যবসার পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয়। যার সাহায্যে নতুন দ্রব্য ও সেবারও সৃষ্টি হয়। উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসার এই গতিশীলতা বজায় থাকে।

(ঙ) **ঝুঁকি গ্রহণ :** উদ্যোগ গ্রহণের অন্যতম প্রকৃতি হল ঝুঁকি গ্রহণ। নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও তার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি থকে। তাই বলা হয় উদ্যোগ গ্রহণের অন্যতম প্রকৃতি হল ঝুঁকি গ্রহণ।

(চ) **সামাজিক কাজ সম্পাদন :** নতুন নতুন প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উদ্যোগ গ্রহণের অন্যতম কাজ যেহেতু নতুন উদ্যোগ প্রস্তুত করা, সেজন্য বলা যেতেই পারে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

(ছ) **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের শিল্প ও সেবা উৎপাদনকারী সংস্থা গড়ে ওঠে এবং উদ্যোক্তার দক্ষতার উপর দাঁড়িয়ে সেই সব শিল্প তাদের সংশ্লিষ্ট দ্রব্য তৈরী ও বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে। এইরকমভাবে ক্রমান্বয়ে সমস্ত উদ্যোগগুলি আপন আপন কাজ সম্পাদন করার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

1.4 উদ্যোগের উপাদানসমূহ

উদ্যোগের উপাদানসমূহ বলতে বোঝায় যেগুলি ছাড়া একটি উদ্যোগ সাধারণভাবে গড়ে উঠে না। অর্থাৎ যেগুলি একটি উদ্যোগ বিশেষত বাণিজ্যিক উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে গণ্য হয়। উদ্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বই বা লেখা থেকে দেখা যা নীচের সাতটি উপাদানকে উদ্যোগের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এগুলি নীচে একটি তালিকার মাধ্যমে তুলে ধরা হল :

উদ্যোগের উপাদানসমূহ :

1. সৃজনশীল ধারণা (Innovative idea)
2. অনুপ্রেরণা ও অঙ্গীকার (Motivation and commitment)
3. ক্ষমতা ও দক্ষতা (Ability and Skill)
4. সম্পদ (Resources)
5. কৌশল ও দূরদৃষ্টি (Strategy and Vision)
6. পরিকল্পনা ও সংগঠন (Planning and Organising)
7. বাজার সংক্রান্ত ধারণা (Idea of Market)

নীচে এই সাতটি উপাদান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল :

1. সৃজনশীল ধারণা (Innovative Idia) : প্রতিটি উদ্যোগ একটি সৃজনশীল ধারণার উপর গড়ে ওঠে। সৃজনশীল ধারণাই হল উদ্যোগের বীজ যা কালক্রমে বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়।

সৃজনশীল বা সৃষ্টিশীল ধারণা হল যা নতুন কোনো বিষয়কে তুলে ধরে ও যার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা থাকে। এই সম্ভাবনার বিষয়টি সকলের চোখে ধরা পড়ে না। কেবলমাত্র উদ্যোক্তাদের চোখেই ধরা পড়ে। অর্থাৎ যারা নতুন কিছু গড়ে তুলতে চায় তারাই পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উদ্যোগ গড়ে তুলতে উৎসাহিত হয়। এই সৃজনশীল বা নতুন ধারণা ছাড়া কোনো উদ্যোগ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। তাই এটি হল উদ্যোগের বীজ যা উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় পরবর্তীকালে পল্লবিত হয় ও নতুন নতুন পণ্য বা সেবা বা পদ্ধতির জন্ম দেয়।

2. **অনুপ্রেরণা ও অঙ্গীকার (Motivation and Commitment) :** অনুপ্রেরণা হল মানুষের আবেগজনিত আচরণ। মানুষের অভ্যন্তরীণ আবেগকে ক্রিয়াশীল করে উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালনা করাই হল অনুপ্রেরণা। উদ্যোগ গঠনের উদ্যোক্তার মধ্যে এই অনুপ্রেরণা থাকা আবশ্যিক। অনুপ্রেরণাই উদ্যোক্তাকে নতুন কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করে। সেকারণে একে 'ইচ্ছাশক্তি' বা 'মানসিক শক্তি'-ও বলা হয়। আর উদ্যোগ গড়ে তুলতে যেহেতু ঝুঁকি বহন করতে হয় তাই উদ্যোক্তার মধ্যে সেই ইচ্ছাশক্তি থাকা বাঞ্চনীয়।

   অন্যদিকে অঙ্গীকার হল কোনো কিছু করার শপথ। মানসিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে বলেই উদ্যোক্তারা উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তিগুলি মোকাবিলা করার শক্তি পায়। অঙ্গীকার নতুন কিছু সৃষ্টি করার সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তাকে উদ্বুদ্ধ করে। সেকারণে অনুপ্রেরণা ও অঙ্গীকার উদ্যোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে গণ্য হয়।

3. **ক্ষমতা ও দক্ষতা (Ability and Skill) :** উদ্যোগের সাফল্য অনেকাংশই নির্ভর করে উদ্যোক্তার ক্ষমতা ও দক্ষতার উপর। বস্তুত একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে কর্মীদের ক্ষমতা ও দক্ষতার উপর। এখানে ক্ষমতা বলতে শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষমতাকেই বোঝায় এবং দক্ষতা হল কর্মদক্ষতা অর্থাৎ কাজের ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি, অপচয় ও দুর্ঘটনা হ্রাস। ক্ষমতা কমবেশি স্থিতিশীল কিন্তু দক্ষতা স্থিতিশীল নয়, পরিবর্তনশীল। একই কাজ বারে বারে করতে করতে অর্থাৎ অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করা যায়। উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সার্বিক ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করতে হয়। অন্যথায় উদ্যোগে সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয় না। সেকারণেই ক্ষমতা ও দক্ষতা হল উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

4. **সম্পদ (Resources) :** উদ্যোগের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য অর্থাৎ উদ্যোগের বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের জন্য সম্পদ সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্যোগ গঠনে ও উদ্যোগের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সম্পদের প্রয়োজন। উদ্যোগের প্রয়োজনীয় সম্পদ দু-ধরনের—বস্তুগত সম্পদ ও মানবিক সম্পদ। বস্তুগত সম্পদ আহরণের জন্য আবার আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়। উদ্যোগের কার্যকলাপ এই বস্তুগত ও মানসিক সম্পদের মিথস্ক্রিয়ায় সম্পন্ন হয় ও উদ্যোগের উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব হয়। তবে কোনো উদ্যোগই সম্পদ ব্যতিরেকে গড়ে উঠতে পারে না। তাই একে উদ্যোগের মৌলিক উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং এর অন্তর্ভুক্ত হল মূলধন, পরিকাঠামো, কাঁচামাল, কর্মী ইত্যাদি।

5. **কৌশল ও দূরদৃষ্টি (Strategy and Vision) :** কৌশল হল এমন এক পরিকল্পনা যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব হয়। অন্যদিকে দূরদৃষ্টি হল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুমান। এই অনুমানের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা কৌশল স্থির করা হয়। কৌশল ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার ঝুঁকি মোকাবিলা করা সহজ হয়। উদ্যোগ যেহেতু নতুন কিছু করার লক্ষ্যে গড়ে ওঠে তাই অনিশ্চয়তার ঝুঁকি থাকেই। এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য উদ্যোক্তাদের যেমন দূরদৃষ্টি থাকা দরকার তেমনি ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলও স্থির করতে হয়। সেকারণেই কৌশল ও দূরদৃষ্টিকে উদ্যোগের উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়।

6. **পরিকল্পনা ও সংগঠন (Planning and Organisation) :** পরিকল্পনা বলতে বোঝায় ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের রূপরেখা যা বর্তমানে স্থির করা হয়। পূর্বানুমানের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা রচিত হয়। উদ্যোগের সাফল্য অনেকটাই পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। প্রবাদ আছে যে 'পরিকল্পনা সঠিক হলে অর্ধেক কাজ সমাপ্ত হয়'। তাই পরিকল্পনাকে সাফল্যের অগ্রদূত বলা হয়। উদ্যোগের ক্ষেত্রেও সঠিক পরিকল্পনা অপরিহার্য। পরিকল্পনাহীন কোনো উদ্যোগ উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হয়। তাই উদ্যোগ গড়ে তুলতে সঠিক পরিকল্পনা অপরিহার্য।

   অন্যদিকে সংগঠন হল উদ্যোগের কর্মীদের কাজের সাথে যুক্ত করা ও তাদের মধ্যে দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বণ্টন করা। সংগঠন ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। সঠিক কাজে সঠিক কর্মীকে সঠিক সময়ে নিযুক্ত করাই হল প্রতিষ্ঠানে সংগঠন গড়ে তোলা। সংগঠনের মাধ্যমেই উদ্যোগের বস্তুগত, আর্থিক ও মানবিক সম্পদ ক্রিয়াশীল হয়, লক্ষ্যসাধনে ব্রতী হয়। কাজেই উদ্যোগকে সফল করতে সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একারণে সংগঠনকে উদ্যোগের উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়।

7. **বাজার সংক্রান্ত ধারণা (Idea of Market) :** উদ্যোগ হল একটি বাণিজ্যিক প্রয়াস। উদ্যোগের মাধ্যমে নতুন কোনো পণ্য বা সেবা বা পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। এই নতুন পণ্য বা সেবা বাজারে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করাই উদ্যোগের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য। উদ্যোগ সবসময়ই প্রচলিত পণ্য বা সেবার চেয়ে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে ক্রেতাদের অধিক সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা করে। আর যেহেতু ক্রেতাদের রুচি, পছন্দ, প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার মধ্য দিয়েই বাজার গড়ে ওঠে তাই উদ্যোক্তাদের বাজার সংক্রান্ত সঠিক ধারণা থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ উদ্যোগকে টিকে থাকতে হলে ও উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে হলে বাজার সংক্রান্ত ধারণা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেকারণেই বাজার সংক্রান্ত ধারণাকেও উদ্যোগের উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়।

1.5 উদ্যোগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

উদ্যোগ গঠন ও উন্নয়ন কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার নয়। বরঞ্চ এটি হল একাধিক বিষয়ের সম্মিলিত ফল এবং এগুলি হল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ। উদ্যোগ গঠনে এই

বিষয়গুলির ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় প্রভাবই থাকে। ধনাত্মক প্রভাব উদ্যোগ গঠনে সহায়তা করে আর ঋণাত্মক প্রভাব উদ্যোগ গঠনে বাধা দেয়। উদ্যোগের উদ্ভব ও উন্নয়নে এই বিষয়গুলিই নির্ধারণকারী বা প্রভাব বিস্তারকারী বিষয় হিসাবে গণ্য হয়। এই বিষয়গুলিকে প্রাথমিকভাবে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। নীচে রেখাচিত্রের মাধ্যমে এই বিষয়গুলি তুলে ধরা হল :

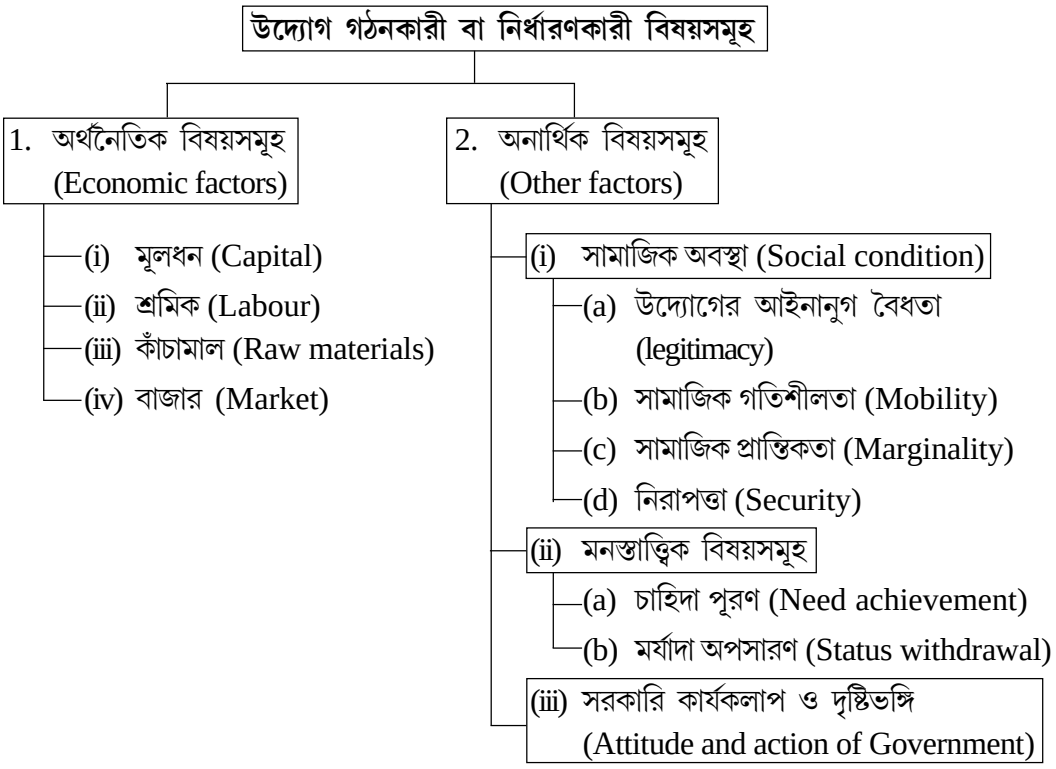

নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল—

1. অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ (Economic Factors) : অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে যেসব বিষয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা দেয় সেই বিষয়গুলিই উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়নে সহায়তা করে। অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ বলতে প্রধানত বোঝায় মূলধন, শ্রমিক, কাঁচামাল ও বাজার। এদের সম্বন্ধে নীচে ধারণা দেওয়া হল :

(a) মূলধন : কোনো কারবারি উদ্যোগ গড়ে তুলতে প্রথমেই যার প্রয়োজন সর্বাধিক তা হল মূলধন। মূলধনের মাধ্যমেই উদ্যোক্তা জমি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও শ্রমিক সংগ্রহ করে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করে। অভিজ্ঞতার নিরিখে দেখা গেছে যে অর্থনীতিতে মূলধনের যোগান ভালো থাকলে বিনিয়োগ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় ও উদ্যোগ স্থাপনও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিলে মূলধনের অভাব উদ্যোগ স্থাপনে বাধা দেয়।

(b) শ্রমিক : উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। শ্রমিকরাই হল প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ যা কাঁচামালকে পণ্যে পরিণত করে ও উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখে। তাই উদ্যোগ স্থাপনে শ্রমিকের সংখ্যাগত মান ও গুণগত মান উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতার উপরও উদ্যোগ স্থাপন নির্ভর করে। অবশ্য বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কম সংখ্যক দক্ষ শ্রমিকের সাহায্যেই উদ্যোগ স্থাপন করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উদ্যোগের মূলধনের পরিমাণ বেড়ে যায়, কারণ উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। ভারতের মতো অধিক জনসংখ্যার দেশে শ্রমিক সহজলভ্য। তবে শ্রমিকদের গুণগত মান খুব উন্নত না হওয়ার কারণে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলতে হয়। অন্যথায় উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এদেশে শ্রমিক সমস্যা সেভাবে না থাকলেও মূলধন সংগ্রহই প্রধান সমস্যা বলে গণ্য হয়।

(c) কাঁচামাল : যেকোনো শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল পণ্যে পরিণত হয় যা ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। কাঁচামাল ছাড়া কোনো শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে না। যদিও প্রযুক্তি কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ হ্রাস করতে পারে কিন্তু কাঁচামাল ছাড়া উৎপাদন চালাতে পারে না। তাই বলা হয় যে কাঁচামালের সহজলভ্যতা উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে। অন্যভাবে বলা যায় যে কাঁচামালের সহজলভ্যতা পরোক্ষভাবে উদ্যোগ স্থাপনে ও উদ্যোগ উন্নয়নে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

(d) বাজার : উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বাজার বা বাজারের সম্ভাবনা একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক বিষয় হিসাবে গণ্য হয়। উদ্যোগ হল একটি বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা এবং সাফল্য নির্ভর করে বাজারের চাহিদার ধরন, প্রকৃতি ও গভীরতার উপর। উৎপাদিত পণ্য বাজারে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তবেই উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে। কারণ উৎপাদিত পণ্য বাজারেই বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত হয়। কাজেই বাজারের আয়তন ও গঠন উভয়ই উদ্যোগ স্থাপনে বিশেষ গুরুত্ব পায়। তাই একচেটিয়ার বাজারে উদ্যোগ স্থাপন যত আকর্ষণীয় হয় প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ততটা আকর্ষণীয় হয় না। তাই বলা হয় যে নতুন বাজারের উদ্ভব ও প্রসারের সাথে নতুন উদ্যোগও গড়ে ওঠে। আর বাজারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই উদ্যোগ গঠনের প্রধান নির্ণায়ক বিষয় হিসাবে গণ্য হয়।

2. অন্যান্য বিষয়সমূহ (Other Factors) : সমাজবিদ ও মনোবিদরা দাবি করেন যে উদ্যোগ স্থাপনে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে অপরিহার্য শর্ত হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু সেগুলি উদ্যোগ স্থাপনে ও উন্নয়নে একমাত্র শর্ত হিসাবে গণ্য হতে পারে না। তাঁরা আরও বলেন যে অর্থনৈতিক বিষয়গুলির উপস্থিতির সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়গুলির উপস্থিতিও উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য এবং এই বিষয়গুলি হল সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক। এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।

(i) সামাজিক বিষয়সমূহ (Social factors) : এর অন্তর্ভুক্ত হল উদ্যোগের আইনানুগ বৈধতা, সামাজিক সচলতা, প্রান্তিকতা (marginality) ও নিরাপত্তা। নীচে এগুলি আলোচনা করা হল।

(a) উদ্যোগের আইনানুগ বৈধতা (Legal validity) : সামাজিক বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম অপরিহার্য বিষয় হল উদ্যোগের আইনানুগ বা আইনগত বৈধতা। **শুমপিটার** (Schumpeter) এধরনের বৈধতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে সামাজিক আবহাওয়া অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। **কোচ্‌রান** (Cochran) একে সাংস্কৃতিক ভাব (theme) ও অনুমোদন হিসাবে অভিহিত করেছেন। উদ্যোগ গঠন গতিশীল হয় যখন আইনানুগ বৈধতা বেশি মাত্রায় থাকে। অবশ্য বিপরীত অবস্থাতেও উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে যদি সেক্ষেত্রে সরকারি কার্যকলাপ উদ্যোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান করে।

(b) সামাজিক গতিশীলতা (Social dynamics) : সামাজিক গতিশীলতা বলতে সামাজিক ও ভৌগোলিক গতিশীলতার মাত্রা এবং একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে গতিশীলতার প্রকৃতিকে বোঝায়। তবে উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক গতিশীলতাকে নির্ধারণকারী বিষয় হিসাবে গণ্য করার ক্ষেত্রে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে বেশি মাত্রায় সামাজিক গতিশীলতা উদ্যোগ স্থাপনের সহায়ক। আবার অন্যান্য কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে সামাজিক গতিশীলতার মাত্রা কম হলে উদ্যোগ স্থাপনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তবে উভয়পক্ষই যে বিষয়ে একমত হন তা হল যে সামাজিক গতিশীলতার মাত্রা বা প্রকৃতি এককভাবে উদ্যোগ স্থাপনকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং উদ্যোগ স্থাপন সম্ভব করতে হলে এর সাথে অন্যান্য প্রভাবকারী বিষয়েরও উপস্থিতি থাকতে হবে।

(c) প্রান্তিকতা (Marginality) : বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সমাজের প্রান্তিক ব্যক্তিদের মধ্যে উদ্যোগ গড়ে তোলার প্রবণতা বেশি। সমাজের প্রান্তিক মানুষদের অবস্থান তাদের উপর একধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তৈরি করে। এর ফলে তারা উদ্যোগ স্থাপনের মাধ্যমে সমাজে তাদের অবস্থানকে উন্নত করতে চায়। তাদের প্রান্তিক অবস্থানের কারণে তারা যে অসুবিধা সম্মুখীন হয় তা দূর করার লক্ষ্যেই তারা উদ্যোগ স্থাপনে আগ্রহী হয়। তবে সমাজে প্রান্তিক অবস্থানই উদ্যোগ স্থাপনের কারণ হতে পারে না যদি না উদ্যোগ স্থাপনের অন্যান্য বিষয়গুলি অনুকূল হয়। সে কারণে উদ্যোগ স্থাপনের এটিই একমাত্র কারণ নয়।

(d) নিরাপত্তা (Scecurity) : অনেক উদ্যোগ বিশষজ্ঞ এই মত পোষণ করেন যে উদ্যোগজনিত নিরাপত্তা উদ্যোগমূলক আচরণকে প্রভাবিত করে। আবার অনেকে বলেন যে নিরাপত্তাহীনতা উদ্যোগ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে না বরঞ্চ বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তাহীনতা বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ স্থাপনের সাহায্য করে। বস্তুত নিরাপত্তা উদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গণ্য হয়। এর পিছনে কারণ হল

যে উদ্যোক্তা যদি তার অর্থনৈতিক সম্পদ হারানোর ভয় পায় বা সে নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হয় তাহলে সে উদ্যোগ স্থাপনে অগ্রসর হতে চায় না কারণ এর ফলে তার সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

(ii) মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ ((Psychological factors) : উদ্যোগীয় তাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেকেই উদ্যোগ স্থাপনে উদ্যোক্তার মনস্তাত্ত্বিক দিকের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা উদ্যোক্তার মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেসব তত্ত্ব দিয়েছেন সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল।

(a) চাহিদা পূরণ : এইসব উদ্যোগীয় তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে উদ্যোগ স্থাপনের পিছনে প্রধান কারণটি হল উদ্যোক্তার নিজস্ব চাহিদা পূরণ। সেকারণেই একে উদ্যোগ স্থাপনের অন্যতম প্রধান নির্ণায়ক বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। এঁদের মতানুযায়ী চাহিদা পূরণের ইচ্ছা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা যায়।

(b) মর্যাদার অপসারণ : সমাজে যেসব ব্যক্তি শ্রদ্ধার আসনে আসীন থাকেন তাঁদের এই মর্যাদা যদি পরবর্তীকালে অপসৃত হয় তাহলে তাদের মধ্যে উদ্যোগ স্থাপনের আগ্রহ জন্মে। কারণ তারা তাদের পূর্ব মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চায়। উদাহরণ হিসাবে এসব তাত্ত্বিকরা জাপানের উদ্যোগ উন্নয়নের বিষয়টি তুলে ধরেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার ফলে তার অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে বিশ্বে নিজের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য জাপান আধুনিক উদ্যোগ স্থাপনে এগিয়ে আসে ও তার অর্থনীতিকে মজবুত করতে সক্ষম হয়।

(iii) সরকারি কার্যকলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গি (Government actions and attitude) : সরকারি কার্যকলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গি উদ্যোগ গঠনের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে। দেশের সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিলে একটি স্বচ্ছ শিল্পনীতি তৈরি করে এবং উদ্যোগ স্থাপনে সহায়তা করে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন, মূলধন ও কাঁচামালের ব্যবস্থা, শিল্পের নিরাপত্তা ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার উদ্যোগ গঠনে সহায়তা করে। অর্থাৎ উদ্যোগীয় পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারি কার্যকলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে ভারতবর্ষে সরকার বিভিন্ন শিল্প তালুক, রপ্তানি উন্নয়ন এলাকা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) ইত্যাদি গড়ে তুলে উদ্যোগ গঠনের সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। এছাড়াও এসব অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের বিশেষ ছাড়, বিশেষ উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ ভারত সরকার 1991 সালে 'অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ কুটিরশিল্পের উন্নয়ন ও শক্তিশালী করার নীতি' ঘোষণা করেন। এর ফলে ভারতে এসব ক্ষেত্রের শিল্পোদ্যোগের প্রভূত উন্নয়ন হয়। এছাড়াও 2006 সালে 'অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোগী সংস্থার উন্নয়ন আইন' (MSMED) চালু হয়। এর ফলে এসব উদ্যোগের স্থাপন ও উন্নয়ন অনেকাংশে বৃদ্ধিপায়। সাথে সাথে এধরনের (MSMED) সংস্থাগুলির জন্য একটি পৃথক মন্ত্রক সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ সরকারি সহায়তায় নতুন নতুন উদ্যোক্তা ও নতুন নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকার কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ সরকারি সহায়তার ফলে

উদ্যোগের ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পায়। এছাড়াও ঝুঁকিবহুল ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ গড়ে ওঠার ফলে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় ও উদ্যোগের কাজকর্মে উদ্যোক্তরা বেশি বেশি করে যত্নশীল হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায় যে উদ্যোগ স্থাপনে বা উদ্যোগ উন্নয়নে কোনো একটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায় না। যেসব বিষয়গুলি আলোচনায় উঠে এসেছে সেই সব বিষয়গুলিই উদ্যোগ গড়ে ওঠার পিছনে প্রভাব বিস্তার করে। কারণ এই সমস্ত বিষয়গুলিই স্বাধীন কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং পরিপূরক ও নির্ভরশীল এবং উদ্যোগ গঠনে প্রতিটি বিষয়েরই বিশেষ ভূমিকা থাকে।

1.6 উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্ব

উদ্যোগ গ্রহণ হল ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কারবার স্থাপন ও পরিচালনা করা। উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্ব অসীম। নীচে সেইসব বিষয় আলোচিত হল :

(ক) নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি : উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য নানা প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবহার করা হয়। নিত্যনতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ফলে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে থাকে।

(খ) ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি : উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পায় এই কারণে যে, এতে সৃজনশীলতা ও গঠনমূলক চেষ্টা থাকে। এই প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপকরণগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে সমাজে মোট সম্পদের বৃদ্ধি ঘটায়।

(গ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ : মালিকানা, ব্যবস্থাপনা, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন, উৎপাদন ইত্যাদির সমন্বয় ঘটে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে। এই বিষয়গুলি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদনে সহায়তা করে এবং নতুন অর্থনৈতিক কাজকর্মের দিশা দেখায়।

(ঘ) উদ্ভাবন : উদ্ভাবন হল নতুন কিছু আবিষ্কার করা। উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে উদ্ভাবনকে বাণিজ্যিক সাফল্যে ব্যবহার করা হয়। তাই উদ্যোগগ্রহণ উদ্ভাবন করার স্পৃহাকে জাগ্রত করে যা দেশের মানবিক সম্পদের বৃদ্ধি ঘটায়।

(ঙ) সমাজমুখী প্রচেষ্টা : উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ধরনের উপকার হয় যেমন, নতুন কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হয়, ভোক্তার চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী পণ্য বা সেবা উৎপাদন হয় ইত্যাদি। সুতরাং, বলা যেতেই পারে, উদ্যোগ গ্রহণ যে কোনো ধরনের সমাজমুখী প্রচেষ্টাকে চালু রাখে।

(চ) সম্পদ ও মূল্য সৃষ্টি : উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ ও মূল্য সৃষ্টি সম্ভব হয়। উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন কাঁচামাল ও দ্রব্য সামগ্রী উদ্ভাবন সম্ভব হয় যা নতুন সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। সুতরাং, বলা যেতে পারে উদ্যোগ গ্রহণ বিশেষ মূল্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

1.7 নতুন উদ্যোগের (স্টার্টআপ) ধারণা

কোন নতুন পণ্য বা সেবা বাজারে আনার জন্য উদ্যোক্তা নতুন উদ্যোগ (Startup) গ্রহণ করেন। যেহেতু নতুন পণ্য বা সেবা তাই খরিদ্দার সেই পণ্য বা সেবা গ্রহণ করবেন কি না সেই বিষয়ে খুবই ঝুঁকি দীর্ঘদিন ধরে উদ্যোক্তাকে বহন করতে হয়। তবে যাই হোক না কেন মানব সভ্যতার উন্নয়নে নতুন উদ্যোগ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। নতুন নতুন উদ্যোগ মানুষের জীবন যাত্রার ধরনকে পাল্টে দিতে পারে এবং কর্ম-সৃষ্টির এক অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। নতুন উদ্যোগ হল এমন এক প্রচেষ্টা যা ঝুঁকিবহুল, গতানুগতিক কারবারি প্রচেষ্টা নয় এবং যার মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন থাকে। তাই যে সমস্ত মানুষের মধ্যে সাহস, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, প্রচেষ্টা ও বুদ্ধিসত্তা থাকে তারাই নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উদ্যোগের মাধ্যমে কারবারের বিকাশ ও অগ্রগতি ঘটে। কোন আকর্ষণীয় সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করেন তখনই উদ্যোগের সূচনা হয়।

ভারতে ক্রমবর্ধমান স্টার্টআপ ইকো-সিস্টেম ইতিমধ্যেই ৬ লক্ষ চাকরি তৈরী করতে পেরেছে। ২০১৬ সাল থেকে আমাদের দেশে ৫৬টি আলাদা সেক্টরে ৬০,০০০ স্টার্টআপ সংস্থা গড়ে উঠেছে। দেশের তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে স্টার্টআপ ইন্ডাস্ট্রি অসংখ্য নতুন সম্ভাবনা নিয়ে দ্রুত একটা নির্দিষ্ট চেহারা নিচ্ছে। ২০১৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত (মার্চ ২০২২) ৬০,০০০ নতুন স্টার্টআপ গড়ে উঠেছে আমাদের দেশে ৫৬টি আলাদা ক্ষেত্রে। ২০২১ সালে করোনার প্রকোপের মধ্যে দেশে ৪০টি ইউনিকর্ন স্টার্টআপ গড়ে উঠেছিল, যার প্রত্যেকটির মার্কেট ভ্যালুয়েশন বা বাজার দর কমপক্ষে ৭৪০০ কোটি টাকা। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী ২০২১ সালে ভারতীয় স্টার্টআপ-এর বৃদ্ধি হয়েছে রেকর্ড পরিমান। ২৪.১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে যা কোভিড পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় প্রায় দু-গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এসেছে ১১টি স্টার্টআপ আইপিও-র মধ্যে পাবলিক মার্কেটের মাধ্যমে।

1.7.1 নতুন উদ্যোগের মৌলিক সমস্যাসমূহ

নতুন উদ্যোগের যাত্রাপথ অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল। কারণ যে পথে একটি উদ্যোগ যাত্রা শুরু করে তা পরীক্ষিত নয়। তাই শুরুই সময়কে অত্যন্ত সঙ্কটজনক বলা হয়। কারণ নতুন উদ্যোগের মূলধন সংগ্রহ করা, উদ্যোগের পরিকাঠামো ও সংগঠন গড়ে তোলা, পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে ও প্রতিযোগীদের মোকাবিলা করা ইত্যাদি নানা কারণে সমস্যা দেখা দেয়। তাই উদ্যোগের প্রাথমিক কাজ হল অপর সমস্যার নিরসন ঘটিয়ে উদ্যোগকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানো যাতে উন্নয়নের পথে উদ্যোগকে চালনা করা সম্ভব হয়। নতুন উদ্যোগের অর্থাৎ স্টার্ট আপ সংস্থার সমস্যার তালিকা দীর্ঘ। তাই উদ্যোক্তাকে সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে আগাম ধারণা গড়ে তুলতে হবে এবং সমস্যা মোকাবিলার উপায়ও স্থির করতে হয়। যেসব সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব সেগুলিকে চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বাকি সমস্যাগুলির সমাধানের উপায় আগাম স্থির করতে হয়। নতুন উদ্যোগের সম্ভাব্য মৌলিক সমস্যাগুলি সন্নিবেশিত করলে আমরা নীচের তালিকাটি পাই—

নতুন উদ্যোগ তথা স্টার্ট-আপের মৌলিক সমস্যাবলি :

(i) কারবারি ধারণার উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যা

(ii) মূলধন সংগ্রহজনিত সমস্যা

(iii) কারবারি মডেলের ব্যর্থতা

(iv) দূর্বল ব্যবস্থাপনা

(v) তারল্য বা অর্থের অভাব

(vi) পণ্যের সমস্যা

(vii) ভালো কর্মী পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা

(viii) ভালো ক্রেতা পাওয়ার সমস্যা

(ix) প্রতিযোগীদের মোকাবিলা

(x) কারবারি বাধা এবং ব্যয় অপ্রত্যাশিত

এই সমস্যাগুলি নতুন উদ্যোগের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই বাধাগুলি মোকাবিলা করা উদ্যোক্তার প্রধান কাজ বলে গণ্য হয়। উদ্যোগের এই সমস্যাগুলিই হল মৌলিক প্রকৃতির। তবে সব উদ্যোগের ক্ষেত্রেই যে সব সমস্যা দেখা দেয় তা কিন্তু নয়। বিভিন্ন সমস্যা কম-বেশি উদ্যোগের কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। নীচে সমস্যাগুলি আলোচনা করা হল।

(i) **কারবারি ধারণার উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যা (Problems relating to developing business idea) :** কারবারি উদ্যোগ গড়ে ওঠে নতুন কোনো ধারণার উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ যে ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা উজ্জ্বল তাই হল উদ্যোগ ধারণা বা কারবারি ধারণা। তবে সকলে এই ধারণার সন্ধান পায় না, যারা এর সন্ধান পায় তারাই উদ্যোক্তা হিসাবে গণ্য যদি তারা উদ্যোগ ধারণাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য অগ্রসর হয়।

বস্তুত বাণিজ্যিক পরিবেশের পরিবর্তন যেমন প্রচলিত বাণিজ্যিক ধারণাকে ধ্বংস করে তেমনি সাথে সাথে নতুন কারবারি সুযোগও সৃষ্টি করে। তথাপি সঠিক কারবারি সুযোগকে সনাক্ত করা ও সৃজনশীল সত্তার মাধ্যমে কারবারি ধারণার পরিবর্তন করা খুব সহজ কাজ নয়। সেজন্য প্রচলিত আছে যে উদ্যোক্তার দেখার দৃষ্টি থাকতে হবে। অন্যান্যরা যাকে সমস্যা হিসাবে দেখে একজন উদ্যোক্তা তাকে সুযোগ হিসাবে দেখে। সুতরাং কারবারি ধারণার উন্মেষ সংক্রান্ত সমস্যা হল প্রাক্-উদ্যোগ সমস্যা। আর এই সমস্যা সমাধানের উপরই ভবিষ্যৎ উদ্যোগের সম্ভাবনা নিহিত থাকে।

(ii) **মূলধন সংগ্রহজনিত সমস্যা (Problems of raising capital) :** কারবারি ক্ষেত্রে মূলধনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। উদ্যোগের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। মূলধনকে কারবারের জীবনরক্ত (life blood) হিসাবে গণ্য করা হয়। নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহ করা অত্যন্ত জটিল কাজ। এর কারণ হল যে একটি স্টার্ট-আপ সম্পূর্ণ নতুন ধারণার উপর গড়ে ওঠে

যা পরীক্ষিত হয় নি। তাই এরূপ উদ্যোগে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি সর্বাধিক হয়। কাজেই বিনিয়োগকারীরা নতুন উদ্যোগে লগ্নি করতে ইতস্তত করে। একারণেই নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহ জটিল হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লগ্নিকারীদের অর্থাৎ মূলধন সংগ্রহকারীদের উদ্যোগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে বোঝাতে হয় ও তাদের আস্থা অর্জন করতে হয়। আর মূলধন সংগ্রহের সমস্যা না মিটলে উদ্যোগ আর এগোতে পারে না এবং উদ্যোগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(iii) **কারবারি মডেলের ব্যর্থতা (Failure of business model) :** স্টার্ট-আপের ব্যর্থতার পিছনে অন্যতম কারণ হল কারবারি মডেলের ব্যর্থতা, কারবারি মডেল বলতে বোঝায় কারবারের নক্শা বা রূপরেখা যে পথ বা পরিকল্পনা অনুসারে একটি নতুন উদ্যোগ উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলে। অনেক সময়ই উদ্যোক্তারা স্টার্ট-আপের উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বিপণন সাফল্য সম্বন্ধে খুব বেশি আশাবাদী হয়ে থাকে। তারা মনে করে যে যেহেতু তারা নতুন পণ্য বা সেবা বাজারে নিয়ে আসছে যা আরও বেশি উন্নতমানের তাই ক্রেতারা পণ্য ক্রয়ের জন্য উদ্যোক্তার দরজায় লাইন দেবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না এবং উদ্যোক্তারা আশাহত হয়। এর ফলে বিপণন ব্যয়ও বেড়ে যায় এবং নতুন উদ্যোগের উপর আর্থিক চাপ পড়ে।

(iv) **দুর্বল ব্যবস্থাপনা (Poor management) :** নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপের ক্ষেত্রে একটি জ্বলন্ত সমস্যা হল উদ্যোগের দুর্বল পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা। উদ্যোক্তা নতুন ধারণা উন্মেষ ঘটায় একথা ঠিক কিন্তু তার ব্যবসায়িক জ্ঞানও যে প্রখর হবে তার কোনো মানে নেই। স্টার্ট-আপের ব্যবস্থাপনায় সঠিক পরিকল্পনা, সঠিক সংগঠন গড়ে তোলে, কর্মী ও কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো ও সর্বোপরি নিয়ন্ত্রণ করা হল ব্যবস্থাপনার সাফল্যের পূর্বশর্ত। তাই স্টার্ট-আপ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যদি দুর্বল ব্যক্তিদের উপর দায়িত্ব থাকে তাহলে বিভিন্ন সমস্যা যেমন বিপণন কৌশল তৈরি ও প্রয়োগে দুর্বলতা, পণ্য নক্শায় ত্রুটি ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয় যা উদ্যোগের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

(v) **আর্থিক তারল্য না থাকা বা অর্থের অভাব (Liquidity or Crash Cunch) :** নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি অত্যন্ত প্রকট এবং একটি স্টার্ট-আপ কারবার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে এটি একটি অন্যতম কারণ। স্টার্ট-আপের সংগৃহীত অর্থ যদি স্থায়ী সম্পত্তি সংগ্রহ করতেই ব্যয় হয়ে যায় এবং দৈনন্দিন কারবারি কার্যকলাপ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকরী মূলধন অর্থাৎ নগদ অর্থ না থাকে তাহলে নতুন উদ্যোগ অত্যন্ত সমস্যায় পড়ে। কাজেই উদ্যোক্তাদের আগাম পরিকল্পনা করা প্রয়োজন যে সংগৃহীত অর্থ কীভাবে ব্যবহার করা হবে এবং যাতে দৈনন্দিন কাজকর্ম কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয়। এজন্য উদ্যোগের একটি সম্ভাব্য নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করা দরকার এবং সাথে সাথে এও দেখা দরকার যে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক তারল্য যেন কাম্য স্তরের নীচে না যায়।

(vi) **পণ্যের সমস্যা (Product Problem) :** একটি স্টার্ট-আপ কারবার নতুন কোনো পণ্য বা সেবার উৎপাদন বা আরও উন্নত পদ্ধতিতে তাদের উৎপাদনের লক্ষ্যে গড়ে ওঠে। নতুন পণ্য

বা সেবার মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রচলিত পণ্য বা সেবার চেয়ে অধিক উপযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্য বা সেবা ক্রেতাদের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়। আর পণ্য বা সেবা যদি বাজারের চাহিদা পূরণে অসমর্থ হয় তাহলে নতুন উদ্যোগ কিছুতেই সফল হতে পারে না। এর পিছনে হয়তো প্রকল্প রূপায়ণে ঘাটতি থাকতে পারে বা কৌশলজনিত ঘাটতি থাকতে পারে। সুতরাং পণ্যের মধ্যে কোনো ত্রুটি বা কৌশলজনিত কোনো ঘাটতি না থাকে সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

(vii) **ভালো কর্মী পাওয়ার সমস্যা (Problem of finding good employees) :** কারবারের কর্মীরাই হল প্রকৃত সম্পদ কারণ তারাই কারবারের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পাদন করে। সেজন্য ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিতে উদ্যোগের কর্মীদের মানবসম্পদ বলা হয় এবং এই সম্পদ উদ্যোগের অন্যান্য সম্পদকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে উদ্দেশ্যপূরণে সাহায্য করে। একটি নতুন উদ্যোগ অর্থাৎ স্টার্ট-আপ যেহেতু ছোটো আকারে শুরু করা হয় এবং তার আর্থিক ক্ষমতাও সীমিত থাকে তাই ভালো কর্মী সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়। বস্তুত ভালো কর্মী বলতে বোঝায় যারা পরিশ্রমী, সৎ এবং বিশ্বাসী। এ ধরনের কর্মী পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার কারণ কর্মীদের মানসিকতা হল তারা আশা করে যে কম কাজ করবে কিন্তু বেশি মজুরি বা পারিশ্রমিক পাবে। সুতরাং ভালো কর্মী সংগ্রহ করাও একটি নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে বড়ো সমস্যা।

(viii) **ভালো ক্রেতা পাওয়ার সমস্যা (Problem of finding good customer) :** স্টার্ট-আপ বা নতুন উদ্যোগের আরও একটি সমস্যা হল উদ্যোগের তৈরি পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত ও ভালো ক্রেতা পাওয়া। কারণ ক্রেতাদের মধ্যে ভালো ও খারাপ উভয় ধরনের ক্রেতাই থাকে। এই খারাপ ক্রেতাদের থেকে উদ্যোক্তাকে সাবধান থাকতে হবে। তবে শুধুমাত্র ভালো ক্রেতা পাওয়া সত্যিই দুরূহ। খারাপ ক্রেতারা উদ্যোগের সুনামকে নষ্ট করে এবং এরাই কু-ঋণের বড়ো কারণ। অন্যদিকে ভালো ক্রেতারা উদ্যোগ গড়ে তুলতে ও উদ্যোগের উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে। তাই উদ্যোক্তার উচিত কাজ হল খারাপ ক্রেতাদের যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা ও তাদের সাথে লেনদেন না করা।

(ix) **প্রতিযোগীদের মোকাবিলা (Dealing with competition) :** একটি স্টার্ট-আপ উদ্যোগকে শুরুতে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তে হয়। সুতরাং বাজারের প্রতিযোগিতা উদ্যোগের কাছে একটি এমন সমস্যা তৈরি করে যাতে তার অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দেয়। যদিও অধিকাংশ উদ্যোক্তা একে অভিশাপ হিসাবে গণ্য করে তবুও স্বীকার করা হয় যে অল্পবিস্তার প্রতিযোগিতা থাকা ভালো। কারণ প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করার মাধ্যমে উদ্যোগ আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারে। এটি সৃজনশীলতার অনুঘটক হিসাবে কাজ করে এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে উন্নত মানের পণ্য ন্যায্য দামে পাওয়ার পথ প্রশস্থ করে। এও স্বীকার করা হয় যে প্রতিযোগিতা ছাড়া উদ্ভাবন সম্ভব নয় এবং উদ্ভাবন ছাড়া এ পৃথিবী স্থির থাকবে এবং কোনো উন্নয়ন হবে

না। **ভিক্টর কিয়াম** (Victor Kiam)-এ ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছিলেন তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তার কথায় 'কারবারে প্রতিযোগিতা সব সময় কামড় দেবে যদি কারবারকে সচল রাখতে হয়, কিন্তু কারবার যদি এক জায়গায় স্থির থাকে তাহলে প্রতিযোগিতা কারবারকেই গিলে ফেলবে।' সুতরাং প্রতিযোগিতা এমন এক সমস্যা যাকে মোকাবিলা করা উদ্যোগের অন্যতম কাজ।

(x) **অপ্রত্যাশিত কারবারি বাধা ও ব্যয় (Unexpected business challanges and expenses) :** ভবিষ্যৎ সর্বদাই অনিশ্চিত। একজন নাবিক যেমন অপ্রত্যাশিত ঝড়ের জন্য তৈরি থাকে, একজন পাইলট যেমন খারাপ আবহাওয়া ও ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রতি সজাগ থাকে, তেমনি একটি নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপের উদ্যোক্তাকেও অপ্রত্যাশিত বাধা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ও সর্তক থাকতে হয়। একটি নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপের ক্ষেত্রে যেসব অপ্রত্যাশিত বাধা বা সমস্যার উদ্ভব হতে পারে সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল—

(ক) অপ্রত্যাশিত মামলা ও মোকদ্দমা

(খ) সরকারি নীতির অসংগতি

(গ) কোনো ভালো কর্মীর অপ্রত্যাশিত পদত্যাগ

(ঘ) ক্রেতাদের থেকে পাওনা অনাদায় অর্থাৎ কু-ঋণ

(ঙ) বাজার অংশে ক্ষতি

(চ) স্বল্প কার্যকরী মূলধন

(ছ) মজুত সম্ভারের অপ্রতুলতা

এই কারবারি বাধাগুলি যদি যথাযথভাবে নিরসন করা না হয় তাহলে নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপ ব্যর্থ বা ধ্বংস হয়ে যায়। এগুলির অতিরিক্ত আর একটি সমস্যা হল অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্যোগের ব্যয় বৃদ্ধি। অপ্রত্যাশিত ব্যয়কে তো বটেই উদ্যোগের সঠিক ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অচিরেই কারবার বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত বাধাগুলির সঠিক মোকাবিলার উপরই নতুন উদ্যোগ তথা স্টার্ট-আপের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

1.7.2 নতুন উদ্যোগের সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ

একটি নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপ তার কারবারি জীবনে নানাধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এসব সমস্যার মোকাবিলা বা সমাধানের উপর তার ভবিষ্যৎ অস্তিত্বই শুধু নয়, তার সাফল্যও নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে সাফল্যের সংজ্ঞা হল সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা (The ability to solve the problems)। একজন সফল উদ্যোক্তা বলতে বোঝায় যে সহজেই কারবারের সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং ক্রেতাদের প্রয়োজন অধিক কার্যকরভাবে ও ভালোভাবে মেটাতে সক্ষম হয়। নতুন উদ্যোগের উপরে উল্লিখিত সমস্যাগুলির সমাধানে বা সমস্যা হ্রাস করার জন্য যেসব উপায় অবলম্বন করা হয় সেগুলি রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

স্টার্ট-আপ সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ

(i) সমস্যা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা

(ii) বিকল্প পথ অনুসরণ করা

(iii) সমস্যার পথ অনুসরণ করা

(iv) সম্ভাব্য সকল সমাধান-সূত্র সনাক্ত করা

(v) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(vi) প্রাপ্তি স্বীকার ও সংশোধন

(vii) অভ্যন্তরীণ ব্যয় হ্রাস করা

(viii) ঝুঁকিবহনের ভয়কে জয় করা

(ix) মজবুত কারবারি কৌশল তেরি করা

নীচের সমস্যা সমাধানের প্রতিটি উপায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল। তবে মনে রাখা দরকার যে সমস্যার গভীরতা ও ব্যাপ্তি অনুযায়ী উপায়গুলি এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে সমস্যার পুরোপুরি নিরসন না হলেও সমস্যার তীব্রতা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

(i) **সমস্যা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করতে হবে (Create a clear idea of the problem) :** সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্যাকে ভালোভাবে জানা দরকার। একজন ডাক্তার যেমন একজন রোগীর সমস্যা মেটানোর জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অসুখ সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করে এবং চিকিৎসা করে তেমনি নতুন উদ্যোগের সমস্যাকে প্রথমে ভালোভাবে জানতে হবে, কারণ অনুসন্ধান করতে হবে সবশেষে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। আবার উদ্যোক্তা যেটি সমস্যা হিসাবে দেখে হয়তো তার মধ্যেই ভবিষ্যতের সুযোগ নিহিত আছে। সুতরাং সমস্যাকে ভালোভাবে অনুধাবন না করে সমাধানের পথে এগোনো ঠিক নয়। সমস্যা সমাধান করতে হলে সমস্যার বিভিন্ন দিক ভালোভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং তারপর সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ii) **বিকল্প পথ অনুসরণ করা (Pursue alternative path) :** এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যা উদ্যোগে দেখা দিলে সেগুলির সমাধান করা সম্ভব নয়। যেমন একজন দক্ষ কর্মীর মৃত্যু হলে সমস্যা সমাধানের সহজ পথ থাকে না। কারণ এগুলি হল জীবনের ঘটনা (event of life)। এরূপ ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণই একমাত্র সমাধান।

(iii) **সমস্যার কারণ চিহ্নিত করা (Identification of the cause of problem) :** সমস্যার সমাধান করতে হলে তার কারণ চিহ্নিত করতে হবে। তাই বলা হয় কারণের বহিঃপ্রকাশই হল সমস্যা। প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করতে পারলে সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান সম্ভব। অন্যথায় সমস্যা বারে বারে দেখা দেয় যদিও বহিঃপ্রকাশের ধরন বদলায়।

(iv) **একাধিক সম্ভাব্য সমাধান (Identification of multiple possible solution) :** একটি সমস্যার জন্য যতগুলি সমাধানের সম্ভাব্য পথ থাকে সেগুলি চিহ্নিত করা দরকার। কারণ একাধিক সম্ভাব্য সমাধানের থেকে সঠিক সমাধানটি বেছে নেওয়া সহজ হয় এবং স্বীকার করা হয় যে সমাধানের গুণগত সমাধানের পরিমানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে আনুপাতিক।

(v) **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Prompt decision making) :** সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি হলে তা সমস্যাকে আরও গভীর করে তোলে। যে-কোনো সমস্যার একটি সমাধান সূত্র তৈরি করতে হবে এবং দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্তের রূপায়ণ ঘটাতে হবে। কিন্তু যদি সমস্যা সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তাই চলতে থাকে যার ফলে সময়ের অপচয় হয় এবং সমাধান সূত্রের প্রভাব হ্রাস পায়। এর ফলে উদ্যোগের ব্যয়বৃদ্ধিও ঘটে। অনেক স্টার্ট-আপ কারবার সিদ্ধান্তহীনতার জন্য বা সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার ফলে ব্যর্থ হয়েছে এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে।

(vi) **প্রাপ্তি স্বীকার ও সংশোধন (Acknowledgement and correction) :** অনেক সময় পণ্য বিপণনে এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয় যা পণ্য বিক্রয়কে স্তিমিত করে দেয়। এই সমস্যার পিছনে যেসব কারণ অনুমান করা হয় সেগুলি হল পণ্যে ঘাটতি বা প্রতিযোগীদের পণ্য সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার যাতে তাদের পণ্য-বিক্রয় সহজ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের উপায় হল যে উদ্যোগের পণ্য-বণ্টনকারী খুচরা কারবারি ও ক্রেতাদের মতামত গ্রহণ করা এবং যেসব ত্রুটি থাকে সেগুলি সংশোধন করা।

(vii) **অভ্যন্তরীণ ব্যয় হ্রাস করা (Cut costs in-house) :** উদ্যোগের উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে ব্যয় হ্রাস করার চেষ্টা করতে হবে এবং এই ব্যয় হ্রাসের প্রক্রিয়ায় কর্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং যাতে তারা স্বেচ্ছায় ব্যয় হ্রাসের জন্য চেষ্টা চালায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এটি সমস্যা নিরোধক একটি প্রয়াস।

(viii) **ঝুঁকিবহনের ভয়কে জয় করা (Overcome the fear of risk-taking) :** উদ্যোক্তারা নতুন ধারণার উপর নির্ভর করে উদ্যোগ শুরু করে। এ-ধরনের কারবারে কোনো অতীত রেকর্ড থাকে না যাতে উদ্যোক্তা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা পেতে পারে। স্টার্ট-আপের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা অনিশ্চিত পথে অগ্রসর হয় এবং ঝুঁকি বহন করে। এই ঝুঁকিবহনের ভয়কে দূরে সরিয়ে না রাখতে পারলে উদ্যোক্তার পক্ষে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। তাই সমস্যা সমাধানের একটি উপায় হল ঝুঁকিবহনের ভয়কে কোনোভাবেই মনে স্থান না দেওয়া। প্রবাদ আছে যে 'সাহসীরাই জয়ী হয়'।

(ix) **মজবুত কারবারি কৌশল তৈরি করা (Formulate strong business strategy) :** কৌশল ছাড়া পরিবর্তন কেবলমাত্র পরিবর্ত, অগ্রগমন নয়। যে-কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমেই একটি মজবুত কৌশল তৈরি করতে হয়। অনেক স্টার্ট-আপ সমস্যার ব্যবচ্ছেদ করতে চায় অথচ সমস্যার মধ্যে যে পরিবর্তন কৌশল থাকে তা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং ছোটো-বড়ো যে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধানে কৌশল অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

1.8 উদ্যোগের ক্রমবিকাশ

উদ্যোগ সংক্রান্ত ধারণাটি বহুকাল আগে উদ্ভূত হলেও বহুদিন পর্যন্ত এটি তেমন পরিচিতি লাভ করেনি। অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপাদান হিসাব জমি, শ্রম, মূলধন ও উদ্যোগকে গণ্য করা হত। অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান হিসাবে বহুকাল আগেই উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। 1755 সালে **রিচার্ড ক্যাটিলন** (Richard Cantillon) প্রথম উদ্যোগকে অর্থনীতির কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর মতে উদ্যোক্তারা সম্পদ বণ্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সচেতনভাবে গ্রহণ করেন।

1776 সালে **অ্যাডাম স্মিথ** (Adam Smith) তাঁর বিখ্যাত "Wealth of Nation" গ্রন্থে enterpriser কথাটি উল্লেখ করেন। এর মাধ্যমে তিনি এমন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছেন যিনি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোনো সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর মতে উদ্যোক্তারাই অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সাড়া দেন এবং তাঁরা অর্থনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে চাহিদাকে যোগানে রূপান্তরিত করেন। **স্মিথের** ভাবনার রেশ পরবর্তীকালেও দেখতে পাওয়া যায় অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের লেখাতেও। **কার্ল মেনজার** (Karl Menger) 1871 সালে বলেন যে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উদ্ভব পরিস্থিতি থেকে হয় না, পরিস্থিতি সম্পর্কে মানুষের সচেতনা ও অনুধাবন ক্ষমতা থেকে ওই পরিবর্তন ঘটে। তিনি আরও বলেন যে তাঁর মতে একজন উদ্যোক্তা হলেন পরিবর্তন সাধনকারী যিনি সম্পদকে ব্যবহারের উপযোগী পণ্য বা সেবায় পরিবর্তন করেন। এভাবেই উদ্যোক্তা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যাতে শিল্পের উন্নয়ন ঘটে।

উনিশ শতকে উদ্যোক্তাদের শিল্পের কান্ডারী, ঝুঁকি বহনকারী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বলা হত। যেসব ব্যক্তি ঝুঁকি নিয়ে সম্পদ অর্জনে আগ্রহী এবং যাঁরা নতুন শিল্প, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যাবতীয় কাজ করেন তাঁরাই হলেন উদ্যোক্তা। **শ্যুমপিটার** (Schumpeter) উদ্যোগ ধারণাটির পরিমার্জন করেন বিশ শতকে। তিনিই প্রথম উদ্যোগকে **গঠনমূলক ধ্বংসের শক্তি** (Creative destruction force) নামে অভিহিত করেন। তাঁর মতে উদ্যোগ হল একটি প্রক্রিয়া এবং প্রকৃতপক্ষে এটি হল একটি গঠনমূলক কাজ। উদ্যোক্তারা সম্পদের নতুন সমন্বয় ঘটিয়ে ও নতুন পদ্ধতির প্রবর্তনের মাধ্যমে শিল্প-বাণিজ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন করেন বলেই তাঁদের উদ্ভাবক বলা হয়। তিনি আরও বলেন যে সমাজে এই ধরনের উদ্ভাবনকারী খুব বেশি থাকে না এবং তাঁদের উন্নয়নের কান্ডারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ **ম্যাক্স ওয়েবার**-এর মতে সৃষ্টিমূলক ও উদ্যোগ সংক্রান্ত কার্যকলাপ বাহ্যিকভাবে গড়ে ওঠা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এর ফলে নতুন দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন সম্ভব হয়। তাঁর মতে উদ্যোক্তারা এক বিশেষ সামাজিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হন। আর এই পরিবেশ হল যে সামাজিক পরিবেশে তাঁরা বসবাস করেন এবং যে পরিবেশ প্রকৃতই তাঁদের উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলে।

ভারতে উদ্যোগের ক্রমবিকাশ (Evolution of Entrepreneurship of India)

ভারতে উদ্যোগ বিকাশের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। ভারতবর্ষ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ—প্রায় দু-শতক পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। কাজেই শিক্ষার প্রসার যেমন হয়নি, সাথে সাথে শিল্পের বিকাশও সেভাবে গতি পায়নি। কেবলমাত্র কৃষিজ কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে এই দেশে বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্পের

মতো কিছু শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল প্রধানত ইংরেজ বণিকদের হাত ধরে। তাই প্রকৃতপক্ষে ভারতে শিল্পোদ্যোগের সূচনা হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পত্তনের পর। 1673 ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে জাহাজ তৈরির কারখানা গড়ে তোলে। উদ্যোক্তা হিসাবে ভারতের পার্শি সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথম উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসে এবং ওই সম্প্রদায়েরই **মনজিধনজি** নাম এক ব্যক্তি বারুদ তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। পরবর্তী দুশো বছরে ভারতবর্ষে উদ্যোগের সেভাবে অগ্রগতি হয়নি। এর পিছনে প্রধান কারণ হল ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে শিল্প-উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। বরঞ্চ ভারতীয় উদ্যোগপতিদের প্রচেষ্টাকে অসহযোগিতা করেছে। অবশ্য অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। এই শতকের শেষ দশকে কিছু ভারতীয় উদ্যোক্তা চর্মশিল্প, ইস্পাত, জাহাজ নির্মণ, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলে। এই সময়কালে ব্রিটিশ শাসকরাও নিজেদের স্বার্থে চা, কফি ও নীল শিল্প গড়ে তোলে। ভারতে ইস্পাত শিল্পের পথিকৃৎ হিসাবে **জে. আর. ডি. টাটা** অধুনা ঝাড়খন্ডের জামসেদপুরে একটি ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলেন যা **টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি** (TISCO) নামে সমধিক পরিচিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছু মাড়ওয়ারি ও গুজরাটি উদ্যোক্তা উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসেন এবং এসময় অনেকগুলি চিনি ও সিমেন্ট কারখানা গড়ে ওঠে। একই সময়ে অন্যান্য কিছু ভারতীয় উদ্যোগীদের প্রচেষ্টায় কয়েকটি কাগজ ও তামাক জাতীয় পণ্যের শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠতে দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয়দের মধ্যে শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার স্পৃহাকে উৎসাহ দিয়েছিল। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে শিল্পভিত্তিক উদ্যোগ গড়ে তোলার জোয়ার দেখা যায়। ব্রিটিশ সরকারও যুদ্ধকালীন প্রয়োজন মেটানো স্বার্থে ভারতে শিল্প উদ্যোগ গড়ে তুলতে সহায়তা করতে শুরু করে। ভারতের প্রধান প্রধান শহর ও শহরতলিতে প্রচুর পরিমাণে ছোটো-বড়ো কারখানা গড়ে উঠতে দেখা যায়।

স্বাধীনোত্তর ভারতে রাশিয়ার অনুকরণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কৃষির উন্নয়ন যাতে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প বিকাশের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই পরিকল্পনাকালে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ছোটো শিল্পের বিকাশের উপরও জোর দেওয়া হয়েছিল। ভিলাই, রাউরকেল্লা ও দুর্গাপুরে লৌহ-ইস্পাতের তিনটি বৃহদায়তন কারখানা গড়ে তোলা হয়েছিল। এর সাথে সাথে সুষম শিল্পবিকাশের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পবিকাশ কেন্দ্র ও শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হয়। তবে কেবলমাত্র শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলাই নয়, উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানে ও প্রশিক্ষণের জন্য আমেদাবাদে 1983 সালে **এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট অব্ ইন্ডিয়া** স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্মিলিতভাবে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ওই বছরেই ভারত সরকারও ক্ষুদ্রায়তন কারবারি উদ্যোগ সমেত বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের জন্য দিল্লিতে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম হল **'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড স্মল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট'**। দেশের আর্থিক বিকাশের জন্য যে উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়ন অত্যাবশ্যক তা বিগত শতকের আশির দশকেই স্বীকৃত হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারও বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য 'START UP' প্রকল্প চালু করেছেন, যদিও এই প্রকল্পের অধীনে যেসব প্রকল্প গড়ে উঠেছে তার মূল্যায়ন এখনও হয়নি।

পরিশেষে বলা যায় যে ভারতবর্ষে যে মিশ্র অর্থনীতি অনুসৃত হত তার ফলস্বরূপ বেসরকারি উদ্যোগের উপস্থিতিই সর্বাধিক। সরকারি উদ্যোগ কেবলমাত্র কতকগুলি কোর সেক্টরেই সীমিত ছিল। বেসরকারি উদ্যোগক্ষেত্রে যেসব উদ্যোক্তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে রয়েছে জে. আর. ডি. টাটা, ধীরুভাই আম্বানি, ঘমশ্যামদাস বিড়লা, ডালমিয়া, বাজাজ, মিত্তাল ইত্যাদি। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগিতা করছে যাতে দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব হয়। বর্তমানে ভারতের জনগণের প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই ভারতীয় উদ্যোগ সরবরাহ করে।

1.9 উদ্যোগ কর্মজীবন হিসেবে

সাধারণভাবে উদ্যোগ বা উদ্যোগ গ্রহণ হল এক মানবিক প্রচেষ্টা যা লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সবধরনের মানবিক প্রচেষ্টাই কারবারি জগতে উদ্যোগ হিসাবে গণ্য হয় না। অর্থনীতিবিদ্‌রা উৎপাদনের উপাদান হিসাবে **মূলধন, কাঁচামাল** ও **শ্রমের** সাথে সাথে **উদ্যোগকেও** একটি উপাদান হিসাবে গণ্য করেন। কাজেই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উপাদান। বস্তুত উদ্যোগ হল এমন এক প্রচেষ্টা যা **ঝুঁকিবহুল, গতানুগতিক** কারবারি প্রচেষ্টা নয় এবং যার মধ্যে **সৃজনশীলতা** ও **উদ্ভাবন** থাকে। অর্থাৎ উদ্যোগের মধ্যে নতুনত্ব যেমন থাকে তেমনি উদ্যোক্তার মধ্যেও উদ্ভাবনী ক্ষমতা থাকতে হবে। সেকারণে 'উদ্যোগ' মানুষের চারিত্রিক গুণাবলি হিসাবেও গণ্য হয়। প্রচলিত প্রবচন হিসাবে প্রায়শই শোনা যায় যে, 'উদ্যোগী মানুষেরাই সাফল্য লাভ করে।' অর্থাৎ যাদের মধ্যে সাহস, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, প্রচেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তা থাকে তারাই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। অতীতের চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙ্গা নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যবসা করতে যাওয়ার কাহিনি বা সিন্দবাদের কাহিনি বা কলম্বাসের নৌ-অভিযান এগুলিও উদ্যোগ হিসাবে চিহ্নিত হয়। কারণ ওইসব কর্মপ্রচেষ্টা ছিল ঝুঁকিবহুল, ব্যতিক্রমী ও এতে উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায়। যদিও উদ্যোগ শব্দটি সামাজিক ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারবারি ক্ষেত্রে উদ্যোগ বলতে বোঝায় এক নতুন ধরনের কারবার বা কারবারি প্রক্রিয়া যা আগে পরীক্ষিত হয়নি এবং যা নতুন এক ব্যবসায়িক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ কোনো একটি বাজারে কাপড়ের অনেকগুলি দোকান থাকলেও কারবারি পরিভাষায় তাদেরকে উদ্যোগ বলা হয় না। আবার কেউ যদি একটি অনুরূপ কাপড়ের নতুন দোকান খোলেন তাহলেও তাকে উদ্যোগ বলা যায় না, কিন্তু যদি একটি বুটিকের দোকান ওখানে খোলা হয় তাহলে এই দোকানটিকে **উদ্যোগ** বলে গণ্য করা হয়। কারণ এটি হল সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের দোকান যা ওই বাজারে দেখা যায় না, আনুপাতিকভাবে **ঝুঁকিবহুল, সৃজনশীলতা** ও **উদ্ভাবনের** উপর নির্ভরশীল।

উদ্যোগের মাধ্যমে কারবারের বিকাশ ও অগ্রগতি ঘটে। এছাড়াও কোনো অঞ্চল বা সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোনো আকর্ষণীয় সুযোগকে সদ্ব্যবহার করে যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করেন তখনই উদ্যোগের সূচনা হয়। উদ্যোগজনিত সুযোগ বলতে সেই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বোঝায় যাতে নতুন পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হয় বা প্রক্রিয়া বা

সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় বা নতুন কোনো বাজারে উৎপাদন মূল্যের থেকে বেশি মূল্যে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং কোনো নতুন পণ্য বা সেবা বা নতুন উৎপাদন পদ্ধতি বা নতুন বাজার উদ্ভাবনও উদ্যোগ হিসাবে গণ্য হয়। সুতরাং উদ্যোগের মূল বিষয়টি হল প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে নতুন কোনো উদ্ভাবন যা নতুন পণ্য বা সেবা হতে পারে, নতুন কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে পারে বা নতুন বাজারে পণ্য বা সেবার উপস্থাপন হতে পারে। অর্থাৎ উদ্যোগের মধ্যে **নতুনত্ব** (newness) থাকতেই হবে। এই নতুনত্ব আবার সৃজনশীলতা ও সুযোগের উপর অনেকটাই নির্ভর করে। পরিবেশ-পরিস্থিতি সদা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতা যেমন অনেক পুরানো ধ্যান-ধারণা, পদ্ধতি-প্রকরণ, পণ্য বা সেবার ধ্বংস করে তেমনি সাথে সাথে নতুন নতুন সুযোগের সৃষ্টি করে। সেকারণেই অনেকে উদ্যোগকে **'ধ্বংসাত্মক সৃজনশীলতা'** বলে অভিহিত করেন। তবে পরিবর্তনশীল জগতে এই নতুন নতুন সুযোগ সকলের চোখে পড়ে না। যারা এর সন্ধান পায় তাদেরই উদ্যোক্তা বলা হয়। উদ্যোক্তারাই সুযোগ-সন্ধানী ও তারা নতুন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উদ্যোগ গড়ে তোলে ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাকে উন্নত করে। এর ফলেই সুযোগের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়, শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ ও সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

পরিশেষে উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রাথমিক আলোচনায় সংক্ষেপে বলা যায় যে উদ্যোগ হল কোনো নতুন সুযোগের সম্ভাবনার বাস্তবায়ন যা এক বা একাধিক ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে এবং যার ফলে নতুন কোনো পণ্য বা সেবার উদ্ভাবন ঘটে বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন কোনো পদ্ধতির প্রবর্তন হয় যার ফলে উৎপাদন মূল্য হ্রাস পায় বা নতুন কোনো ব্যবসায় সংগঠনের মাধ্যমে বা প্রচলিত ব্যবসায় সংগঠনের মাধ্যমে নতুন কোনো বাজারে পণ্য বা সেবার উপস্থাপনা করা হয়। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় যেমন ঝুঁকি থাকে তেমনি সম্ভাবনা ও সৃজনশীলতাও থাকে।

1.10 সারাংশ

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যে সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে তার মধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ অন্যতম। যে ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাঁকে উদ্যোক্তা বলে। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান তৈরি করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া থেকে শুরু করে, তার পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনশীল করে তোলার ক্ষেত্রে চালকের ভূমিকা পালন করেন। তাই উদ্যোগ গ্রহণকে কোনো কিছু সৃষ্টি ও গড়ে তোলার ক্ষমতা বলে।

উদ্যোগ গ্রহণের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, উদ্যোগ গ্রহণ হল একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে থাকে সৃজনশীলতা ও জ্ঞানের কিছু উদ্ভাবনের বীজ। উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক কাজ সম্পাদন সম্ভব হয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। তবে এর মধ্যে ঝুঁকিও আছে।

উদ্যোক্তা ছাড়া উদ্যোগ গ্রহণের কোনো অর্থ হয় না। উদ্যোক্তা হবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি যেমন ফল লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ সংগ্রহ ও তার ব্যবহার করবেন, তেমনি সামাজিক দায়িত্বও পালন করবেন। তিনি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যেমন, অর্থনৈতিক উন্নয়নকারীর ভূমিকা, নিয়োগকর্তা হিসাবে ভূমিকা, বাজার সৃষ্টিকারীর ভূমিকা ইত্যাদি। তাঁর পক্ষে এইসব ভূমিকা তখনই পালন করা সম্ভব যদি তাঁর মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলির সমাবেশ ঘটে যেমন, আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা, ঝুঁকিবহন করার ক্ষমতা, নেতৃত্বের গুণাবলি ইত্যাদি।

1.11 প্রশ্নাবলি

ক. এমসিকিউ প্রশ্নাবলি

1. অর্থনীতিবিদ্‌রা উৎপাদনের উপাদান হিসাবে নীচের কোন্‌টি উপাদান হিসাবে গণ্য করেন না?
   (ক) মূলধন (খ) কাঁচামাল
   (গ) উদ্যোগ (গ) বাজার
2. একটি উদ্যোগের মধ্যে নীচের কোন্‌ উপাদানটি উপস্থিত থাকে?
   (ক) সৃজনশীলতা (খ) উদ্ভাবন
   (গ) (ক) ও (খ) উভয়ই (ঘ) কোনোটিই নয়
3. কারবারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে নীচের কোন্‌ মন্তব্যটি অধিক উপযুক্ত?
   (ক) উদ্যোগ হল মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা (খ) এটি হল গতানুগতিক কারবারি প্রচেষ্টা
   (গ) উদ্যোগ হল ঝুঁকিবহুল কারবারি প্রচেষ্টা যার মধ্যে বন্ধুত্ব থাকে (ঘ) কোনোটিই নয়
4. অর্থনীতিবিদ্‌ শ্যুমপিটার (Schumpeter) উদ্যোগকে কী নামে অভিহিত করেছিলেন?
   (ক) সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের দিশারি (খ) ধ্বংসাত্মক সৃজনশীলতা
   (গ) ঝুঁকিবহুল কারবারি প্রচেষ্টা (ঘ) সৃষ্টিশীল কার্যকলাপ
5. 'ক্রমবর্ধমান সম্পদ সৃষ্টির সচল প্রক্রিয়াই হল উদ্যোগ'—মন্তব্যটি কে করেছিলেন?
   (ক) রবার্ট রনস্টাড (খ) জে. সি. বার্না
   (গ) পি. এফ. ড্রাকার (ঘ) জোসেফ শ্যুমপিটার
6. 'সম্পদকে প্রগতিশীল কাজের উদ্দেশ্যে পরিচালনা করাই হল উদ্যোগ গ্রহণ'—উদ্যোগ সংক্রান্ত এই সংজ্ঞাটি কে দিয়েছিলেন?
   (ক) রবার্ট রনস্টাড (খ) জে. সি. বার্না
   (গ) পি. এফ. ড্রাকার (ঘ) জোসেফ শ্যুমপিটার
7. Entrepreneur শব্দটি কোন্‌ বিদেশি শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে?
   (ক) গ্রিক শব্দ (খ) ফরাসি শব্দ
   (গ) হিব্রু শব্দ (ঘ) কোনোটিই সঠিক নয়
8. 'উৎপাদনে পরিবর্তন শুরু করাই হল উদ্যোগ'—সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?
   (ক) এম. সি. গুপ্তা (খ) পল. এইচ. উইলকেন
   (গ) পি. এফ. ড্রাকার (ঘ) কোনোটিই সঠিক নয়

9. 'Wealth of Nations' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

(ক) অ্যাডাম স্মিথ (খ) জোসেফ শুমপিটার

(গ) কার্ল মেনজার (ঘ) পল. এইচ. উইলকেন

10. 1755 সালে কোন্ অর্থনীতিবিদ্ উদ্যোগকে অর্থনীতির কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন?

(ক) অ্যাডাম স্মিথ (খ) কার্ল মেনজার

(গ) জোসেফ শুমপিটার (ঘ) অমর্ত্য সেন

11. ভারত সম্বন্ধে নীচের কোন্ মন্তব্যটি তুমি সঠিক বলে মনে করো?

(ক) ভারত একটি কৃষিভিত্তিক দেশ (খ) ভারত একটি উদ্যোগভিত্তিক দেশ

(গ) ভারত একটি শিল্পোজাত দেশ (ঘ) ভারত বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশ

12. 1983 সালে 'এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট অব্ ইন্ডিয়া' কোথায় স্থাপিত হয়?

(ক) নয়ডাতে (খ) আমেদাবাদ

(গ) মুম্বাইতে (ঘ) হায়দ্রাবাদ

13. 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব্ এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট' কত সালে এবং কোথায় গড়ে তোলা হয়?

(ক) 1983 সালে দিল্লিতে (খ) 1984 সালে আমেদাবাদ

(গ) 1900 সালে ভূপালে (ঘ) 1980 সালে কলকাতায়

14. উদ্যোগের উপাদান হিসাবে নীচের কোন্‌টি গণ্য হয়?

(ক) সৃজনশীল ধারণা (খ) অনুপ্রেরণা ও অঙ্গীকার

(গ) ক্ষমতা ও দক্ষতা (ঘ) সবগুলিই

15. উদ্যোগের উপাদান হিসাবে নীচের কোন্‌টি গণ্য হয় না?

(ক) মুনাফা (খ) সম্পদ

(গ) পরিকল্পনা ও সংগঠন (ঘ) কৌশল ও দূরদৃষ্টি

উত্তর: 1. (ঘ) 2. (গ) 3. (গ) 4. (খ) 5. (ক) 6. (গ)
7. (খ) 8. (খ) 9. (ক) 10. (খ) 11. (ক) 12. (খ)
13. (ক) 14. (ঘ) 15. (ক)

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. উদ্যোগ গ্রহণের সংজ্ঞা দিন।

2. উদ্যোগ গ্রহণের যে কোনো দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

3. উদ্যোক্তা কাকে বলে?
4. স্টার্ট-আপ কাকে বলে?
5. উদ্যোগ গ্রহণের যে কোনো দুটি প্রকৃতি উল্লেখ করুন।

গ. দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. উদ্যোগ গ্রহণের সংজ্ঞা দিন। উদ্যোগ গ্রহণের প্রকৃতি আলোচনা করুন।
2. উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
3. উদ্যোক্তার ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা উল্লেখ করুন।
4. নতুন উদ্যোগ (Startup)-এর মৌলিক সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন।
5. উদ্যোগের ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করুন।
6. নতুন উদ্যোগের সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।
7. 'উদ্যোগ কর্মজীবন হিসেবে' টীকা লিখুন।

একক-2 ❑ উদ্যোক্তার গুণাবলী (Traits of Entrepreneur)

গঠন

2.0 উদ্দেশ্য

2.1 প্রস্তাবনা

2.2 উদ্যোক্তার গুণাবলী

2.3 উদ্যোগজনিত আচরণ ও সৃজনশীলতা

2.4 উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

2.4.1 প্রশিক্ষণের সুবিধা

2.4.2 প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

2.5 সারাংশ

2.6 প্রশ্নাবলী

2.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন—

- উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী
- উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
- উদ্যোগজনিত আচরণ ও সৃজনশীলতা

2.1 প্রস্তাবনা

উদ্যোক্তা হলেন এমন এক ব্যক্তি যাকে তাঁর সংগঠনের স্বার্থে বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করতে হয় এবং যিনি সংগঠনের লাভ-লোকসানের জন্য দায়ী থাকেন। উদ্যোক্তা হলেন একজন উদ্ভাবনকারী প্রবর্তক। সৃজনমূলক চিন্তাশক্তি ও গঠনমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে জনজীবনের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা, প্রতিকূল পরিবেশে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং সকল নেতৃত্বদানের মাধ্যমে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হিসাবে স্বীকৃত। কাজেই উদ্যোক্তার কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী থাকা আবশ্যক। এই একক থেকে উদ্যোক্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

2.2 উদ্যোক্তার গুণাবলী

John A. Hornaday-র মতে একজন উদ্যোক্তার যে সকল গুণাবলী থাকা উচিত, সেগুলি হল—(i) আত্মবিশ্বাসী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী, (ii) পরিমিত ঝুঁকি গ্রহণে সক্ষমতা, (iii) চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সক্ষমতা, (iv) পরিবর্তনশীলতা ও গ্রহণযোগ্যতা, (v) বাজার সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, (vi) অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতা, (vii) স্বাধীনচেতা উন্মুক্ত মনের অধিকারী, (viii) বিভিন্ন বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান, (ix) উৎসাহী এবং কঠোর পরিশ্রমী, (x) গতিশীল নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, (xi) উদ্যমী ব্যক্তিত্ব, (xii) সৃজনশীলতা, (xiii) সুপরামর্শদাতা, (xiv) দূরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, (xv) সম্পদশীল ও সংরক্ষণশীল, (xvi) প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা ও সমালোচনার সদুত্তর দেবার সাহস ও ক্ষমতা।

Mark Cason একজন উদ্যোক্তার নিম্নলিখিত গুণাবলী চিহ্নিত করেছেন—

(i) বিচারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, (ii) দক্ষতার সঠিক প্রয়োগ ক্ষমতা, (iii) ব্যবস্থাপনার সকল স্তরের ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা।

Holt উদ্যোক্তার জ্ঞান বা ধারণাকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে কোনো উদ্যোগ কার্যকরভাবে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করতে গেলে উদ্যোক্তার সদিচ্ছা, ব্যক্তিগত ধারণা বা যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথপ্রদর্শক হিসাবে একজন উদ্যোক্তার যে সকল গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন তাহল—

(ক) আত্মবিশ্বাস : আত্মবিশ্বাস উদ্যোক্তার অন্যতম গুণ। যিনি ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উদ্যোগ নেন, তার আত্মবিশ্বাস থাকা আবশ্যকীয় উপাদান। তিনি মানসিক দিক থেকে সজাগ থাকবেন। আবেগে ধৈর্য্য রাখবেন, যথেষ্ট আত্মসচেতন এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি হবেন।

(খ) সৃজনশীলতা : সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা উদ্যোক্তার অন্যতম গুণ। বিশ্বায়নের যুগে নিত্য নতুন দ্রব্য উৎপাদন বা পুরানো দ্রব্যের উত্তোরণ না ঘটাতে পারলে টিকে থাকা মুশকিল। সুতরাং, সৃজনশীলতা উদ্যোক্তার অন্যতম গুণ হিসাবে স্বীকৃত। চিন্তা-ভাবনা ও কার্যকলাপে তাঁকে সর্বদাই সৃষ্টিশীল হতে হবে।

(গ) অধ্যবসায় : অধ্যবসায় উদ্যোক্তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণ। অধ্যবসায় না থাকলে উদ্যোক্তার পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা মুশকিল।

(ঘ) নেতৃত্বের গুণাবলি : উদ্যোক্তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি থাকা প্রয়োজন কারণ তিনিই প্রধান কান্ডারি, যাকে দেখে সমস্ত কর্মী উজ্জীবিত হবেন। তাই উদ্যোক্তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি থাকা অবশ্যই উচিত।

(ঙ) ঝুঁকিবহন করার ক্ষমতা : উদ্যোক্তাকে ঝুঁকিবহন করতে হয়। কারবারে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি থাকে যেমন, আর্থিক ঝুঁকি, ব্যবসায়িক ঝুঁকি ইত্যাদি। উদ্যোক্তা যদি ঝুঁকি গ্রহণে অসমর্থ হন তাঁর পক্ষে কারবার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই উদ্যোক্তাকে ঝুঁকিবহন করার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়।

(চ) **সমালোচনার স্বীকৃতি দান :** উদ্যোক্তাকে সব সময় **গঠনমূলক সমালোচনার** সম্মুখীন হতে হয় এবং উদ্যোক্তার এই সমালোচনা স্বীকার করার মতো মানসিকতা থাকা আবশ্যিক।

(ছ) **অনুসন্ধানের ক্ষমতা :** উদ্যোক্তাকে সব সময় অনুসন্ধিৎসু হতে হয়। নিত্য নতুন পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর উদ্যোক্তার অস্তিত্ব নির্ভর করে। উদ্যোক্তার যদি অনুসন্ধান করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে এই বাজারে কারবার পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব।

(জ) **সামগ্রিক জ্ঞান :** উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তাঁর উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি-সংক্রান্ত যথেষ্ট ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আইন, অর্থনীতি, বিপণন, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া হিসাবরক্ষণ, আয়কর, পণ্য ক্রয়, উৎপাদন, বিপণন, কর্মী সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে জ্ঞান অর্জন করতে হয়—

(ঝ) **প্রবল ব্যক্তিত্ব :** ব্যক্তিত্ব হল অত্যাবশ্যক এক মানবিক গুণ। বিভিন্ন গুণের সমন্বয়ে ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। উদোক্তাকে জীবনে সফল হতে হলে প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হতে হবে। মানুষকে কৌশলে পরিচালনা করার ক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ শক্তি, আবেগের স্থিরতা, ধৈর্য্য, দৃঢ় মনোভাব, সততা, ঐকন্তিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন গুণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিস্ফূট হয়। সাফল্য অর্জনের মনোভাব নিয়ে তাঁকে কাজ করতে হবে। মানসিক দৃঢ়তা এবং প্রয়োজনের সময় নমনীয় মনোভাব থাকা দরকার। এতে সকলের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করা যাবে।

(ঞ) **ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দক্ষতা :** একজন উদ্যোক্তার যথেষ্ট পরিমানে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দক্ষতা থাকা আবশ্যক। এখানে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দক্ষতার মধ্যে বিভিন্ন গুণ বা যোগ্যতা পরিস্ফূট হয়। যেমন বুদ্ধিমত্তা, ইচ্ছা ও সমর্থ, সংগঠনিক ক্ষমতা, নির্ভরযোগ্যতা, সপ্রতিভতা সততা, সামাজিকতা ইত্যাদি। ব্যবস্থাপক হিসেবে একজন উদ্যোক্তার এই সব গুণের সমাবেশ থাকা উচিত। এই সব গুণের ফলেই উদ্যোক্তাকে অন্যান্য বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। R. L. Katz ব্যবস্থাপকদের তিন ধরনের গুণের অধিকারী হওয়া উচিত বলে মনে করেন। তা হল—কারিগরি দক্ষতা, মানসিক দক্ষতা এবং ধারণাগত দক্ষতা। Koontz এবং O'Donnell ঐ তিনটি দক্ষতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা যুক্ত করেছেন।

উপরিউক্ত গুণাবলি ছাড়াও উদ্যোক্তার আরও যেসব গুণাবলি দরকার সেগুলি হল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনচেতা, মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ও সুন্দর ব্যবহার, নমনীয়তা, মূল্যায়নের ক্ষমতা, শান্ত মেজাজ, অনুপ্রাণিতকরণের ক্ষমতা ইত্যাদি।

2.3 উদ্যোগজনিত আচরণ ও সৃজনশীলতা

ডেভিড মেক্লিল্যান্ড (Devid C. Maclelland) তাঁর আচরণমূলক তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মানুষের চাহিদা পূরণের আকাঙ্ক্ষা উদ্যোগ গড়ে তুলতে প্রেরণা দেয়। তবে কেবলমাত্র এই আকাঙ্ক্ষা পূরণই উদ্যোক্তার প্রেরণা বা উদ্যোগীয় আচরণকে প্রভাবিত করে না। অন্যান্য মানবিক ইচ্ছা বা প্রেরণা

যেমন সৃজনশীলতা (creativity), কার্যক্ষমতা (efficacy), ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা (risk taking), নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র (locus of control), নেতৃত্বদান (leadership) এবং জ্ঞাতকরণ (communication) ইত্যাদিও ব্যক্তির উদ্যোগজনিত আচরণকে প্রভাবিত করে। তবে এদের মধ্যে সৃজনশীলতা তথা সৃষ্টিশীল আচরণ উদ্যোগ গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রেরণামূলক গুণাবলির মধ্যে সৃজনশীলতা সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হল।

সৃজনশীলতা (Creativity)

সৃজনশীলতা বলতে বোঝায় নতুন কিছু সৃষ্টি করার কাজ। এটি হল এমন এক ক্ষমতা যা নতুন ধারণার জন্ম দেয় এবং সুযোগ ও সমস্যাকে নতুনভাবে দেখার পথ আবিষ্কার করে। **জোসেফ শ্যুম্পিটার** (Joseph A. Schumpeter) একে 'উদ্ভাবন' (Innovation) নামে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়ন উদ্ভাবনের উপর নির্ভরশীল এবং উদ্ভাবন হল কোনো নতুন পণ্য বা সেবা বা কাঁচামালের নতুন উৎস বা উৎপাদন পদ্ধতি বা বাজার সংক্রান্ত হতে পারে। সৃজনশীলতা পণ্য বা সেবা বা উৎপাদন পদ্ধতির গুণমান বাড়িয়ে দেয় এবং এর লক্ষ্য হল মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন। সৃজনশীলতার উদ্ভব ঘটে কল্পনা বা কাল্পনিক ধারণা থেকে। এই কল্পনাই সৃজনশীলতায় রূপান্তরিত হয় যখন কল্পনাপ্রসূত নতুন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। তাই উদ্যোক্তারা মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কল্পনা করে যাতে নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায়। তবে তারা কল্পনাবিলাসী নয়, কারণ তাদের কল্পনার সীমা বাস্তবের চৌহদ্দির মধ্যে সীমিত রাখতে হয়। সৃজনশীলতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হল জেফ বেজোস (Jeff Bezos's)-এর কল্পনাপ্রসূত world wide web (www) যা ব্যবহার করে অ্যামাজন (Amazon.com) তার বিশ্বব্যাপী খুচরা ব্যবসায় চালায়।

তবে অনেক সময় সৃজনশীলতা আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সমার্থক শব্দ হিসাবে গণ্য হয় যদিও তারা সম্পূর্ণভাবে আলাদা অর্থ বহন করে। সৃজনশীলতা হল কোনো ব্যক্তির কল্পনাপ্রসূত চিন্তাধারার মাধ্যমে নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা। অন্যদিকে আবিষ্কার হল কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টার ফল বা নতুন কিছু সৃষ্টি করে যার অস্তিত্ব আগে ছিল না। আর উদ্ভাবন হল নতুন কিছু করার প্রক্রিয়া। একারণেই **থিওডর লেভিট** (Theodore Levitt) বলেছেন যে সৃজনশীলতা হল 'নতুন কিছু করার জন্য চিন্তা' ও উদ্ভাবন হল 'নতুন কিছু করা'। উদ্যোগের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন উভয়ই অপরিহার্য। তবে সৃজনশীলতা ছাড়া নতুন কিছু উদ্ভাবন করা যায় না। অর্থাৎ উদ্যোগে উদ্ভাবন সৃজনশীলতাকে অনুসরণ করে। একারণে সৃজনশীলতাকে উদ্যোগের বীজ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং উদ্ভাবনকে উদ্যোগ প্রক্রিয়া বলা হয়।

সৃজনশীল প্রক্রিয়া (The Creative process)

প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত জ্ঞানের নিরিখে মনে করা হত যে একজন ব্যক্তি সৃজনশীল অথবা সৃষ্টিশীল নয়। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যেকোনো ব্যক্তি পদ্ধতি ও ব্যবহারের মাধ্যমে সৃজনশীলতা শিখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নিউটন (Newton) গাছ থেকে আপেল পড়া দেখে

'অভিকর্ষ সূত্র' সৃষ্টি করেন। বিভিন্ন প্রবক্তা সৃজনশীল প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের উল্লেখ করলেও অধিকাংশই মনে করেন যে সৃজনশীল প্রক্রিয়া 5টি স্তরের মাধ্যমে সম্পূর্ণতা পায়। এগুলি নীচের রেখাচিত্রে দেখানো হল—

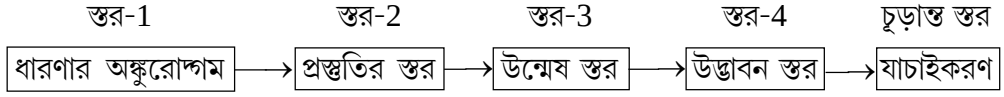

নীচে সৃজনশীল প্রক্রিয়ার পাঁচটি স্তর সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল।

1. **ধারণার অঙ্কুরোদ্গম (Idea generation) :** এই স্তরটি হল উদ্যোগ-এর প্রারম্ভিক স্তর এবং এই স্তরে উদ্যোগের বীজ বপন করা হয়। তবে এটি গাছের বীজ পোঁতার মতো সরল বিষয় নয়। এই স্তরে উদ্যোক্তা তার কল্পনাপ্রসূত চিন্তাধারার মাধ্যমে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হলে তবেই সেটি উদ্যোগের বীজ হিসাবে গণ্য হয়। বস্তুত সৃজনশীল ধারণা কীভাবে বা কোথা থেকে পাওয়া যায়, তার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। মানুষের জিগীষা, কৌতূহল, অন্তর্দৃষ্টি, কোনো সমস্যার নিগূঢ় পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি থেকে সৃজনশীল ধারণার জন্ম হয়।

2. **প্রস্তুতি পর্ব (Preparation stage) :** এটি হল সৃজনশীল প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় স্তর। কৌতূহলের বীজ বপন করা হলে একজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তি সেটি নিয়ে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করেন যাতে ধারণার উন্নয়ন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো বিপণনকারী বাজারে তার নতুন পণ্যটি উপস্থাপন করতে চাইলে তাকে বাজার সমীক্ষা ও বাজার গবেষণা চালাতে হয় যাতে ওই বাজারে অনুরূপ পণ্যের চাহিদার মাত্রা ও গভীরতা জানা সম্ভব হয়।

3. **উন্মেষ পর্ব (Incubation stage) :** অঙ্কুরিত ধারণা এই পর্বে চূড়ান্ত রূপ পায়। যদিও উদোক্তারা একটি মাত্র ধারণার উপর মনোনিবেশ করে থাকেন তবুও বিকল্প ধারণার বিষয়গুলিও তাদের গোচরে রাখতে হয়। তবে এই পর্বে তারা ধারণাকে নিজে থেকেই বাড়তে দেয় এবং এর পিছনে যে বিশ্বাস কাজ করে তা হল কিছু সৃষ্টিশীল ধারণা ও উদ্ভাবন মনের মধ্যে উপস্থিত হয়, যখন প্রকৃতপক্ষে ওই বিষয়ে কোনো চিন্তা করা না হয়। অন্যভাবে বলা যায় অবচেতন মনের চিন্তা থেকে এরূপ ধারণা ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ভালো ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও উন্মেষ পর্বের সময়কাল ব্যক্তি ভেদে বিভিন্ন হয়।

4. **উদ্ভাবন স্তর (Illumination stage) :** এই স্তরটি হল সৃজনশীলতার চূড়ান্ত স্তরের আগের স্তর। প্রস্তুতি ও উন্মেষ স্তর সঠিকভাবে পালিত হলে ধারণা এই স্তরে প্রবেশ করে। এই স্তরেই ব্যক্তি তার সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়। অর্থাৎ নতুন কিছু সৃষ্টি করার সন্ধান পায়। আর্কিমিডিস যেমন চৌবাচ্চার জল অপসারণ দেখে 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলেছিলেন এবং দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন, তেমনি এই স্তরে সাধারণত ব্যক্তির কল্পনাপ্রসূত চিন্তা নির্দিষ্ট গন্তব্য খুঁজে পায়। এই স্তরেই দিবাস্বপ্ন দেখা ব্যক্তি ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য পরিস্কার হয়ে যায়।

5. যাচাইকরণ (Verification) : এটিই সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার সর্বশেষ বা চূড়ান্ত স্তর। এই স্তরেই জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটে। একটি উদ্ভাসিত ধারণার কোনো অর্থ হয় না যদি তা ব্যবহারযোগ্য না হয়। অর্থাৎ উদ্ভাসিত ধারণা ব্যবহারযোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করাই হল যাচাইকরণ। অন্যভাবে বলা যায় নতুন ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নির্ধারণ করাই হল যাচাইকরণ। আবার অনেকে এই স্তরকে সংকটজনক স্তর আখ্যা দেন এবং তাঁরা বলেন যে ধারণার উপযোগিতা পরিমাপ করে তার বাণিজ্যিক সাফল্যের সম্ভাবনা নির্ধারণই হল এই স্তরের প্রধান কাজ।

2.4 উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা নির্ভর করে উদ্যোক্তার প্রশিক্ষণের ওপর। তাই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ দক্ষতা সৃজনের মধ্যে প্রশিক্ষণের কাজ অন্তর্ভূক্ত। আর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের প্রকৃতি ও নির্দেশের মধ্যে উন্নয়নের অর্থ নিহিত আছে। প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন—এই যুগ্ম শব্দটি ব্যাপক ব্যবহৃত, যদিও তারা প্রায় সমার্থক।

প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল উদ্যোক্তার এবং ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা অভিজ্ঞতা থেকে নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল ব্যবস্থাপক এবং উদ্যোক্তার দক্ষতা বৃদ্ধির সাহায্যে অধস্তন কর্মীদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে তাদের সহায়তা করতে পারে। McGregor প্রশিক্ষণের বিশেষ তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। যেমন—(১) বুদ্ধি-সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা, (২) দৈহিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করা, এবং (৩) সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করা। যে কোনো প্রতিষ্ঠানে তিন ধরনের প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত কার্যকলাপ দেখা যায়। যথা—(১) পদধিষ্টানের জন্য প্রশিক্ষণ, (২) আরও ভালো কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ, এবং (৩) উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ।

2.4.1 প্রশিক্ষণের সুবিধা

প্রশিক্ষণ সঠিকভাবে হলে প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েকটি সুবিধা ভোগ করতে পারে। যেমন—(১) যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবহার সম্পর্কে উন্নত শিক্ষালাভ ঘটে, (২) উৎপাদিত পণ্যের পরিমান ও গুণগত মান উন্নত হয়, (৩) কর্মীদের কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, (৪) উৎপাদনের পরিমান বেড়ে যাওয়ায় কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধি পায়, (৫) সমস্ত ধরনের অপচয় বন্ধ হয়, (৬) উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়, (৭) কর্মীদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বৃদ্ধি পায়, (৮) কর্মীদের কাজে সন্তুষ্টি দেখা যায়, (৯) প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়, (১০) অনুপস্থিতি ও কর্ম ত্যাগের হার কমে যায়, (১১) কর্মীদের পদোন্নতির পথ প্রস্তুত হয়, এবং (১২) ব্যবস্থাপকদের পক্ষে তদারকি ও নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা কমে।

2.4.2 প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

কাজের প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাদানের পদ্ধতি আলাদা হয়, তবে সাধারণত যে পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয় তাহল নিম্নরূপ—

(ক) **পরিচয়সূচক প্রশিক্ষণ :** এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিবেশের সঙ্গে উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের পরিচয় ঘটিয়ে তাদের কাজের প্রতি আগ্রহ তৈরি করা হয়। পরিচয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য, উৎপাদন প্রণালী, বিভিন্ন নীতি ও নিয়মকানুন সম্পর্কে সকলকে শিক্ষিত করে তোলা হয়।

(খ) **শিক্ষানবীশ হিসাবে প্রশিক্ষণ :** এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হবার পর কর্মীদের কিছু সময়ের জন্য শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করতে হয়। তত্ত্বগত শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে এই প্রশিক্ষণ গড়ে তোলা হয়। এই ধরনের প্রশিক্ষণ সাধারণত কারিগর ও কুশলী কর্মীদের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) **নির্দিষ্ট কাজে প্রশিক্ষণ :** যে কোনো ধরনের কর্মীর জন্য সে যে কাজে নিযুক্ত হয়েছে সেই নির্দিষ্ট কাজে প্রশিক্ষণ বিশেষ প্রয়োজন। কর্মরত অবস্থায় তারা এই প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন, কাজের কলাকৌশল এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষক শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

(ঘ) **উপপ্রকোষ্ঠে প্রশিক্ষণ :** এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি সহযোগে পৃথক একটি বাস্তবধর্মী শিক্ষাকেন্দ্র থাকে। একজন কর্ম প্রশিক্ষকের উপর এই শিক্ষা কেন্দ্রের ভার থাকে। পৃথক একটি প্রকোষ্ঠে প্রশিক্ষণ কার্য চলে বলে এতে অন্যের কোনো কাজে ব্যাঘাত ঘটে না। সময়ের অপচয়ও রোধ করা যায়।

(ঙ) **কর্মগত প্রশিক্ষণ :** এই পদ্ধতিতে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের কর্ম-সংক্রান্ত বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই সব শিক্ষার মধ্যে যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম ও কাঁচামালের ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া ও দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(চ) **বাহ্যিক প্রশিক্ষণ :** দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক কারিগরি ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। প্রযুক্তিগত এবং পেশাগত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয়েছে। বাহ্যিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি থেকে কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণদানের পর তাদের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

(ছ) **পদোন্নতির প্রশিক্ষণ :** কর্মীদের কাজে উৎসাহ দেবার জন্য এবং তাদের মনোবল অটুট রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের মধ্য থেকে পদোন্নতির নীতি গৃহীত হয়। বেতন, পদমর্যাদা কাজের দায়িত্ব বৃদ্ধিকে সাধারণত পদোন্নতি বলে। পদোন্নতির পরে আরও উচ্চপদের দায়িত্ব সম্পর্কে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন দেখা দেয়। এতে তাদের দায়িত্ব ও অধিকার বৃদ্ধি পায়।

2.5 সারাংশ

এই এককটি পড়ে যে সমস্ত বিষয় জানতে পারলেন সেগুলি হল—

- উদ্যোক্তার গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য
- উদ্যোগজনিত আচরণ এবং সৃজনশীলতা
- উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

2.6 প্রশ্নাবলি

ক. এমসিকিউ প্রশ্নাবলি

1. Mark Cason এর মতে উদ্যোক্তার গুণাবলি হল
   (ক) বিচারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা
   (খ) দক্ষতার সঠিক প্রয়োগ ক্ষমতা
   (গ) ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা
   (গ) উপরের সবকটি
2. জেফ বেজোস (Jeff Bezos's)-এর কল্পনাপ্রসূত আবিষ্কার হল—
   (ক) World Wide Web (www) (খ) Global Wide Web (gww)
   (গ) International Wide Web (iww) (ঘ) উপরের কোনটি নয়
3. McGregor-এর মতে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল—
   (ক) বুদ্ধি সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা (খ) দৈহিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করা
   (গ) সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করা (ঘ) উপরের সবকটি
4. সৃজনশীলতা হল 'নতুন কিছু করার চিন্তা' ও উদ্ভাবন হল 'নতুন কিছু করা'—কে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন সম্পর্কে এই উক্তিটি করেছিলেন?
   (ক) থিয়োডর লেভিট (খ) জোসেফ শ্যুমপিটার
   (গ) পি. এফ. ড্রাকার (ঘ) ম্যাক্লিল্যান্ড
5. সৃজনশীল প্রক্রিয়া কয়টি স্তরের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ যায়?
   (ক) ৪টি স্তর (খ) ৫টি স্তর
   (গ) ৬টি স্তর (ঘ) ৭টি স্তর

উত্তর: 1. (ঘ) 2. (ক) 3. (ঘ) 4. (ক) 5. (খ)

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. John A. Hornaday উদ্যোক্তার যে গুণাবলি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে যে কোনো দুটির নাম লিখুন।
2. Mark Cason-এর মতে উদ্যোক্তার গুণাবলি কি কি?
3. Holt-এর মতে উদ্যোক্তার বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?

4. প্রশিক্ষণের যে কোনো দুটি সুবিধা উল্লেখ করুন।

5. যে কোনো একটি প্রশিক্ষণের পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

গ. দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. উদ্যোক্তার গুণাবলি আলোচনা করুন।

2. উদ্যোক্তার আচরণ ও সৃজনশীলতা ব্যাখ্যা করুন।

3. প্রশিক্ষণের সুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।

4. প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি আলোচনা করুন।

5. সৃজনশীল প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরগুলি আলোচনা করুন।

একক-3 ❑ উদ্যোগের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning for Entrepreneurship)

গঠন

3.0 উদ্দেশ্য

3.1 প্রস্তাবনা

3.2 পরিকল্পনা প্রণয়ন—মূল ধারণা

3.2.1 পরিকল্পনা বনাম পরিকল্পনা প্রণয়ন

3.2.2 পরিকল্পনার উপাদান

3.2.3 পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

3.3 কার্যসম্পাদন পরিকল্পনা

3.3.1 কার্য সম্পাদন পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ

3.3.2 পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ

3.4 মানব সম্পদ এবং বিপণন পরিকল্পনা

3.5 সারাংশ

3.6 প্রশ্নাবলী

3.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল ধারণা
- কার্যসম্পাদন পরিকল্পনা
- মানব সম্পদ এবং বিপণন পরিকল্পনা

3.1 প্রস্তাবনা

ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজগুলির মধ্যে প্রাথমিক কাজ হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। ভবিষ্যতে কোনো কাজ সংক্রান্ত আগাম কার্যসূচি রচনা করাই হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনা হল আকাঙ্খিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টায় কর্মপন্থার নির্বাচন একাধিক কর্মপদ্ধতির মধ্যে উপযুক্ত ও যথাযথ কর্মপন্থা বেছে নেওয়াই হল পরিকল্পনার মূল কথা। পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কারবারই সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে না। এই একক থেকে উদ্যোগের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন কতটা প্রয়োজন সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

3.2 পরিকল্পনা প্রণয়ন—মূল ধারণা

ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজগুলি মধ্যে **প্রাথমিক কাজ** হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনা প্রণয়ন বলতে বোঝায় ভবিষ্যতে যে কাজ করা হবে বলে মনস্থ করা হয় তার একটি পরিকল্পনা রচনা করা। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো কাজ সংক্রান্ত আগাম কার্যসূচি রচনা করাই হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনা থেকে কোনো কাজ সংক্রান্ত যে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় সেগুলি হল : (i) কি (What) করা হবে? (ii) কখন (When) করা হবে? (iii) কীভাবে (How) করা হবে? (iv) কোথায় (When) করা হবে? এবং (v) কে (Who) কাজটি করবে?

সুতরাং পরিকল্পনা প্রণয়ন হল আগাম সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিকভাবে কোনো কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে কোনো কাজের পূর্বনির্ধারিত রূপরেখা ঠিক করাই হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। আর পরিকল্পনা হল ভবিষ্যতে কোনো কাজ কীভাবে করা হবে তার রূপরেখা। কোনো কাজ সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে সম্পন্ন করার আগাম চিন্তাভাবনার প্রকাশ হল পরিকল্পনা প্রণয়ন।

বস্তুত পরিকল্পনা প্রণয়ন হল একটি **মানসিক** বা **চিন্তামূলক** কাজ যার অন্তর্নিহিত উপাদানগুলি হল **কল্পনা** (imagination), দূরদৃষ্টি (foresight), পূর্বানুমান (forecast) ও **সঠিক বিচারক্ষমতা** (sound judgement)। এটি হল কাজ করার আগের চিন্তা-ভাবনা আর পরিকল্পনা হল এই চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন। পরিকল্পনা প্রণয়নে ও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করা হয় এবং কীভাবে কাজ করা হবে তা ঠিক করা হয়। তাই পরিকল্পনা প্রণয়ন হল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রাথমিক কাজ আর ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ একে অনুসরণ করে।

3.2.1 পরিকল্পনা বনাম পরিকল্পনা প্রণয়ন

1. পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা না হলেও এ দুটি শব্দ এক নয়। **পরিকল্পনা প্রণয়ন** (Plan) হল একটি ব্যবস্থাপনামূলক কাজ ও ব্যবস্থাপনার অগ্রগণ্য কাজ। এটি হল একটি প্রক্রিয়া যার থেকে **পরিকল্পনার** (Plan) উদ্ভব হয়। অর্থাৎ পরিকল্পনা হল ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের রূপরেখা আর এই রূপরেখা তৈরি করার প্রক্রিয়াই হল পরিকল্পনা প্রণয়ন।
2. ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিকরা বলেন পরিকল্পনা (Plan) হল উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে **সময়** এবং **ধারাবাহিকতা** অনুসারে কীভাবে কাজ করা হবে তার একটি বিবরণী মাত্র। অন্যদিকে পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি প্রক্রিয়া যার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল—
   (i) লক্ষ্য স্থিরীকরণ,
   (ii) লক্ষ্য পূরণের জন্য সঠিক কৌশল ও কর্মসূচি স্থির করা,
   (iii) প্রয়োজনীয় সম্পদ ও বণ্টন করা এবং
   (iv) পরিকল্পনা রূপায়ণের সাথে জড়িত সকলকে অবহিত করা।

3. প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনা (Plan) হল ভবিষ্যতের কর্মসূচি। অন্যদিকে পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনার বাস্তব প্রয়োগ প্রক্রিয়া অর্থাৎ পরিকল্পনার মধ্যে 'তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি' (Theoretical approach) ও পরিকল্পনা প্রণয়নের মধ্যে 'বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির' (Practical approach) অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।
4. পরিকল্পনার বিপরীত অবস্থা হল গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা। অনুরূপভাবে পরিকল্পনা প্রণয়নের বিপরীত অবস্থা হল অবিন্যস্ত আচরণ।

3.2.2 পরিকল্পনার উপাদান

সার্থক পরিকল্পনার নির্দিষ্ট কতকগুলি উপাদান থাকে।

পরিকল্পনার উপাদান :

1. উদ্দেশ্য
2. নীতি
3. কর্মপদ্ধতি
4. কার্যক্রম
5. নিয়ম
6. বাজেট
7. কৌশল
8. পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়
9. সময়সূচি নির্ধারণ
10. উদ্ভাবন
11. বিকল্প পন্থা নির্বাচন

নীচে এগুলি আলোচিত হল—

1. উদ্দেশ্য (Objective) : উদ্দেশ্য বলতে লক্ষ্য বোঝায় যা বাস্তবায়িত করার জন্য ব্যবস্থাপনার কাজগুলিকে নির্দিষ্ট দিকে চালনা করা হয়। বর্তমানে ব্যবস্থাপনাকে 'উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা' (Management by objectives) হিসাবে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে বাস্তবরূপ দেবার প্রয়োগ কৌশল হিসাবে গ্রহণ করা হয়। উদ্দেশ্যের বাস্তবরূপ দেওয়া তখনই সম্ভব যখন সঠিক পরিকল্পনা গড়ে তোলা সম্ভব হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, পরিকল্পনার তখনই সার্থক হয় যখন তা উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারে। তবে অনেক সময় উদ্দেশ্যের বাস্তবরূপ দেবার ক্ষেত্রে দ্বন্দ থাকতে পারে—যেমন লাভ অর্জন বেশি গুরুত্বপূর্ণ না সামাজিক দায়িত্ব পালন সর্বাগ্রগণ্য। দ্বন্দ থাকা সত্ত্বেও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, যে পরিকল্পনার অন্যতম উপাদান হল উদ্দেশ্য স্থির করা।

2. নীতি (Policy) : নীতি বলতে লিখিত বিবরণী বা মৌখিক বোঝাপড়া (written statement or verbal understanding) বোঝায় যার মাধ্যমে চিন্তা ও কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে নীতি নির্ধারণ করা হয় এবং সেই সব স্তরের ব্যবস্থাপক গুরুত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতি প্রয়োগ করেন। প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য কী পদ্ধতি গ্রহণ ও প্রয়োগ করা

উচিত তা নীতি নির্ধারণ ও নীতির বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব হয়। তাই নীতি সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যাপক, নমনীয়, গতিশীল পথনির্দেশক হিসাবে কাজ করে। **টেরীর** (Terry) মতে, 'Policies are broad, comprehensie, elastic, dynamic guides"।

3. **কর্মপদ্ধতি (Procedures) :** প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার জন্য সময়মতো ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য যে বিবরণী গ্রহণ করা হয় তাকে কর্মপদ্ধতি বলে। কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট হতে হবে (Procedures must be definite) এবং নীতির মতো নমনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। **টেরীর** (Terry) মতে, "A procedure is a series of related tasks that make up the chronological sequence and the established way of performing the work to be accomplished"। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য সফল করতে হবে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজগুলিকে পরপর সাজিয়ে সার্থকভাবে কার্য সম্পাদনের বিবরণী হল কর্মপদ্ধতি। পরিকল্পনার অন্যতম উপাদান হল সঠিক কর্মপদ্ধতি রচনা করা।

4. **কার্যক্রম (Programme) :** নীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করার পর সেগুলিকে যুক্তি সহকারে একত্রীকরণ করাকে কার্যক্রম বলে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি রূপায়ণ হল কার্যক্রম। কার্যক্রম ঠিক করা অর্থ হল কোন্ ব্যক্তি কী কাজ করবেন এবং সেই কাজ সম্পাদনের জন্য কী কী উপকরণ ব্যবহৃত হবে সেগুলি নির্ধারণ করা। অনেকে আবার কার্যক্রম ও পরিকল্পনাকে এক করে থাকেন এবং পরিকল্পনার বিভিন্ন নামকরণ করেন। যেমন—যে কাজ পুনঃপুন সংগঠিত হয় তার জন্য যে কার্যক্রম নেওয়া হয় তাকে রুটিন পরিকল্পনা (Routine Planning) বলে এবং যা পুনঃপুন সংগঠিত হয় না অথচ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন, তাকে সৃজনী পরিকল্পনা (Creative Planning) বলে। যাইহোক, সফল কার্যক্রম উদ্দেশ্য, নীতি, কর্মপদ্ধতি এবং প্রণালী নিয়ে গড়ে উঠে। সেজন্য **টেরী** (Terry) বলেছেন যে, "The make up of programmes consist of objectives, policies, procedures and methods"।

5. **নিয়ম (Rules) :** নিয়ম বলতে কোনো কাজ করার সুনির্দিষ্ট নির্দেশবলিকে বোঝায়। সংগঠনের বিভিন্ন কাজ করার জন্য যে কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা নির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে নিয়ম চালু করা সম্ভব হয়, যা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করে।

6. **বাজেট (Budget) :** কোনো কার্যক্রমের আর্থিক বা পরিমাণগত বিবরণী হল বাজেট। অর্থাৎ বাজেট আর্থিক বিবরণীও হতে পারে এবং পরিমাণগত বিবরণীও হতে পারে। **কুন্‌জ** এবং**ও'ডোনেল** (Koontz and O'Donnell)-এর মতে, "It may be entirely expressed in financial terms"; অর্থাৎ বাজেট পুরোটাই আর্থিক রাশি দ্বারা প্রকাশ করা যায়। প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের জন্য বাজেট করতে হয়—যেমন উৎপাদন বিভাগের জন্য উৎপাদন বাজেট, অর্থ বিভাগের জন্য আর্থিক বাজেট ইত্যাদি। এই বাজেট দ্বারা কত পরিমাণ অর্থ লাগবে বা

কত পরিমাণ উৎপাদন হবে তা স্থির করা হয়, যার সাহায্যে প্রতিষ্ঠান তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সমর্থ হয়।

7. **কৌশল (Strategy) :** কৌশল বলতে বিশেষ ধরনের পরিকল্পনা বোঝায়। বর্তমান বিশ্বে কারবারি জগতে তীব্র প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে বিশেষ ধরনের পরিকল্পনা দরকার, যার সাহায্যে একটি প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে এগিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও কোনো সমস্যা দেখা দিলে সেই সমস্যা কৌশল অবলম্বন করে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। তাই কৌশল হল অনিশ্চিত ঘটনা মোকাবিলার এক বিশেষ পরিকল্পনা।

8. **পরিকল্পনার অনুমিত বিষয় (Planning Premises) :** পরিকল্পনা রচনা করার সময় চতুষ্পার্শ্বস্থ বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যিনি পরিকল্পনা করেন তাঁর পক্ষে ভবিষ্যৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, স্পর্শনীয় ও অস্পর্শনীয়, নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত ইত্যাদি বিষয় থাকে যা পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। **ম্যাসির** (Massie) মতে, "The process of planning may being with a vague hunch or an element of instutition"। অর্থাৎ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া শুরু হয় অস্পষ্ট অনুমান বা অনুভূতির মাধ্যমে। যেহেতু পরিকল্পনা মূলত অনুমান নির্ভর, তাই যে সব বিষয় অনুমান করে পরিকল্পনা করা হয়, সেগুলিকে পরিকল্পনার অনুমিত বিষয় বলে।

9. **সময়সূচি নির্ধারণ (Scheduling) :** পরিকল্পনার উপাদানের মধ্যে সময়সূচি নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে প্রতিটি কাজের শুরু ও শেষ নির্দেশ করা থাকে। এই সময় নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়। তাই সময়সূচি নির্ধারণ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

10. **উদ্ভাবন (Innovation) :** পরিকল্পনার মধ্যেই থাকে উদ্ভাবনের বীজমন্ত্র। পরিবর্তনশীল কারবারি জগতে নিত্য নতুন বিষয় উপস্থিত হয় যা কারবারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সেজন্য পরিকল্পনা উদ্ভাবন বা নতুনত্ব থাকা আবশ্যিক যার সাহায্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

11. **বিকল্প পন্থা নির্বাচন (Selection of alternatives) :** যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বিকল্প পর্যালোচনা করতে হয়। পরিকল্পনার অর্থই হল বিভিন্ন বিকল্প থেকে সর্বাধিক উপযোগী বিকল্পটি নির্বাচন করা। তাই বিকল্প পন্থা নির্বাচন পরিকল্পনার অন্যতম উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়।

3.2.3 পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি ধারাবাহিক ও সার্বিক প্রক্রিয়া। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি বুঝতে হলে এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়গুলি জানা দরকার। কারণ এই ধাপগুলি অতিক্রম করেই পরিকল্পনা

প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায়। যদিও পরিকল্পনার প্রকৃতি অনুসারে এই ধাপগুলি কম-বেশি হয়, তবুও একটি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে সাধারণত যে সব ধাপ অতিক্রম করতে হয় সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল :

প্রথম ধাপ : পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন উপলব্ধি করা।

দ্বিতীয় ধাপ : পরিকল্পনার উদ্দেশ্য স্থির করা।

তৃতীয় ধাপ : পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়গুলি স্থির করা।

চতুর্থ ধাপ : বিকল্প পথের সন্ধান।

পঞ্চম ধাপ : বিকল্প পথগুলির মূল্যায়ন ও সর্বোত্তম পথটি বেছে নেওয়া।

ষষ্ঠ ধাপ : সহায়ক পরিকল্পনা তৈরি করা।

সপ্তম ধাপ : সময়সূচি ও কার্যসূচি তৈরি করা।

অষ্টম ধাপ : রূপায়ণ ও অনুবর্তন।

প্রথম ধাপ : পরিকল্পনার প্রয়োজন উপলব্ধি (Awareness of need for planning) : পরিকল্পনার প্রয়োজন উপলব্ধি হওয়ার সাথে সাথে পরিকল্পনা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। বস্তুত উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের সামনে কী সুযোগ, সম্ভাবনা, আশঙ্কা রয়েছে তা উপলব্ধি করেই পরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ধাপে প্রতিষ্ঠান 'SWOT বিশ্লেষণের' মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বাস্তব অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলে। SWOT Analysis-এর প্রতিটি অক্ষ এক একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এগুলি হল 'S' (Strength) অর্থাৎ শক্তি, 'W' (Weakness) অর্থাৎ দুর্বলতা, 'O' (Opportunity) অর্থাৎ সুযোগ বা সম্ভাবনা এবং 'T' (Threat) অর্থাৎ আশঙ্কা। এই পর্যায়কে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি পর্ব বলা হয়।

দ্বিতীয় ধাপ : পরিকল্পনার উদ্দেশ্য স্থির করা (Determination of Objective) : পরিকল্পনা সব সময় উদ্দেশ্যমুখী। অর্থাৎ এক বা একাধিক উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার প্রথম ধাপ শুরু হয় উদ্দেশ্য স্থিরীকরণের মধ্য দিয়ে। যাই হোক, এই ধাপে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য স্থির করার কাজ সম্পন্ন হয়। যেমন, কোনো সমস্যার সমাধান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হতে পারে বা কোনো সুযোগের সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যেও পরিকল্পনা তৈরি হতে পারে। সুতরাং পরিকল্পনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী তা প্রথমেই স্থির করতে হয়। কারণ এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন সহায়ক পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। যেমন কোনো কোম্পানির কোনো বছরে 20 শতাংশ মুনাফা বৃদ্ধি যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে উৎপাদন ও বিক্রয় সংক্রান্ত পরিকল্পনাও সেভাবে তৈরি করতে হবে।

তৃতীয় ধাপ : পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়গুলি স্থির করা (Determining the Planning premises) : পরিকল্পনার উদ্দেশ্য একবার স্থির হয়ে গেলে পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়গুলি স্থির করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। কারণ এই বিষয়গুলিই পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। **পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়গুলি হল ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ধারণাসমূহ**। এগুলি পরিকল্পনার পরিবেশ বা চতুঃসীমা ঠিক করে দেয় যার মধ্যে পরিকল্পনার প্রয়োগ ঘটে। পূর্বানুমানের সাহায্যে পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়গুলি চূড়ান্ত করা হয়। বর্তমান ঝোঁক বা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই বিষয়গুলি স্থির করা হয়। উদাহরণস্বরূপ,

আর্থিক উদারীকরণের পর অনেক বহুজাতিক সংস্থা ভারতে তাদের ব্যবসা শুরু করেছে। এর ফলে ভারতীয় কোম্পানিগুলিও আন্তর্জাতিক মানের শংসাপত্র (ISO-9000) পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ বর্তমান কোম্পানিগুলি মনে করে যে এর ফলে বহুজাতিক সংস্থাগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে সাহায্য করবে।

চতুর্থ ধাপ : বিকল্প পথের সন্ধান (Searching for alternatives) : পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও অনুমিত বিষয়গুলি চূড়ান্ত হয়ে গেলে পরিকল্পনাকারীরা উদ্দেশ্যসাধনের বিভিন্ন পথগুলির অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়। সমস্ত সম্ভাব্য বিকল্প পথগুলি চিহ্নিত করার জন্য এ সংক্রান্ত তথ্যগুলি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হয়। এভাবে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তগুলি থেকে বিভিন্ন বিকল্প পথের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

পঞ্চম ধাপ : বিকল্প পথগুলির মূল্যায়ন ও সর্বোত্তম পথটির নির্বাচন (Evaluation of alternatives and selection of the best one) : উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের সামনে একাধিক পথ থাকে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র সেই পথটিই গ্রহণ করে যেটি উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক বলে গণ্য হয়। এজন্য প্রতিটি বিকল্প পথ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তগুলি বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক বিকল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার করা হয়। তবে বিভিন্ন বিকল্পের মূল্যায়নে পরিকল্পনাকারীরা দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিকল্পগুলির মধ্যে তুলনা করেন ও সর্বোত্তম বিকল্পটি বেছে নেন। এই দুটি বিষয় হল **প্রত্যাশিত ব্যয়** (Expected cost) ও **প্রত্যাশিত সুবিধা** (Expected benefits)। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয় যেমন ঝুঁকি (Risk), প্রত্যাশিত আয় (Expected return), অনুমিত বিষয়সমূহ (Planning premises) ইত্যাদির ভিত্তিতেও বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে তুলনা করা হয়। যাইহোক, এই পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিভিন্ন বিকল্পের মূল্যায়ন করা হয় এবং সর্বোত্তম বিকল্পটি নির্বাচন করা হয় এবং মূল পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়।

ষষ্ঠ ধাপ : সহায়ক পরিকল্পনা তৈরি করা (Formulation of derivative plans) : মূল পরিকল্পনা তৈরি হলে পরিকল্পনাকারীরা পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেন। অর্থাৎ মূল পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলির পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এগুলিকে মূল পরিকল্পনার সহযোগী বা সহায়ক পরিকল্পনা বলে। এরূপ পরিকল্পনা নীতি বা কৌশল বা পদ্ধতি বা কার্যসূচি বা সময়সূচি বা বাজেট সংক্রান্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনো কোম্পানি একটি নতুন পণ্য বাজারে চালু করতে চায় তখন তাকে পণ্যের নক্শা, আকার বা আকৃতি, ওজন, রঙ ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। এছাড়াও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা, কাঁচামাল ক্রয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, পণ্যের জন্য বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। আর এই পরিকল্পনাগুলি হল মূল পরিকল্পনার সহযোগী পরিকল্পনা।

সপ্তম ধাপ : পরিকল্পনার সময়সূচি ও কার্যসূচি চূড়ান্ত করা (Finalisation of schedule and programme of plan) : পরিকল্পনা প্রণয়নের এই ধাপে প্রতিটি পরিকল্পনাকে সময়সূচি ও কার্যসূচি দ্বারা আবদ্ধ করা হয়। এর ফলে পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যপূরণ করতে সমর্থ হয়। আর কার্যসূচি বিভিন্ন কাজের ক্রমপর্যায় স্থির করে দেয়। এর ফলে পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে অর্থ ও শ্রমের সাশ্রয় ঘটে। এই পর্যায়ে পরিকল্পনার সমস্ত দিক চূড়ান্ত করা হলে কর্মীদের জানানোর ব্যবস্থা করা হয় যাতে পরিকল্পনা রূপায়ণে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়।

শেষ ধাপ : পরিকল্পনা রূপায়ণ ও অনুবর্তন (Implementation and follow up) : পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অন্তিম ধাপ বা পর্যায়টি হল পরিকল্পনার রূপায়ণ ও অনুবর্তন। অর্থাৎ পরিকল্পনার রূপায়ণ না ঘটলে সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি বিফল হয়ে পড়ে। অনুবর্তনের ফলে পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলি সহজেই চিহ্নিত করা যায় ও ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অনুবর্তনের ফলেই কাজের রূপায়ণের ক্ষেত্রে কোনো বিচ্যুতি ঘটলে তা ঠিক করা যায় অর্থাৎ কাজগুলি যাতে পরিকল্পিত পথেই সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়াও বাহ্যিক পরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনার মধ্যে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলে তাও করা সম্ভব হয়। এজন্য এই পর্যায়ে পরিকল্পনার রূপায়ণের সাথে সাথে অনুবর্তনও চালানো হয়। এর ফলে পরিকল্পনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও উদ্দেশ্যসাধন সহজ হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়নের উপরের ধাপগুলি একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরলে নীচের রেখাচিত্রটি পাওয়া যায় :

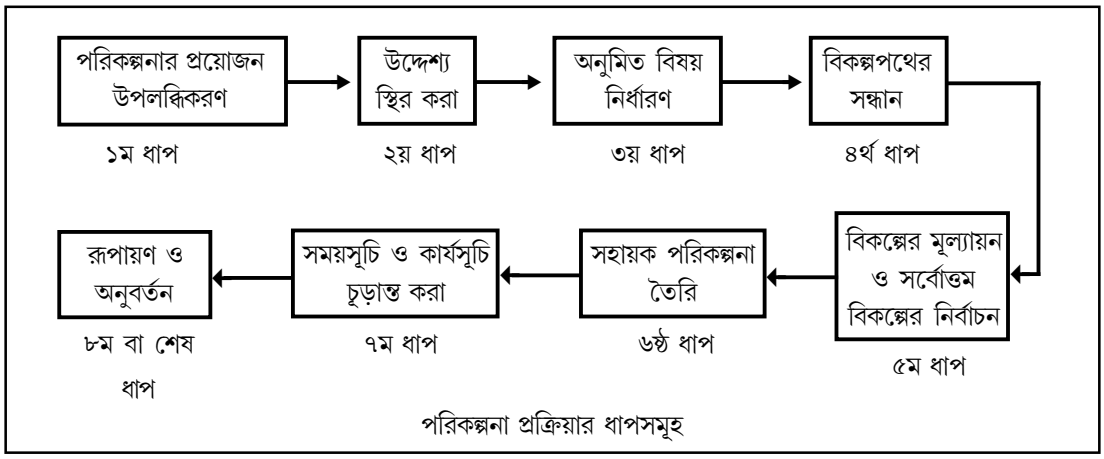

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

3.3 কার্য সম্পাদন পরিকল্পনা

কোনো নতুন কারবার বা উদ্যোগের কার্যসম্পাদন পরিকল্পনা বলতে বোঝায় যে পরিকল্পনা কোম্পানির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মপ্রণালী, সময়সূচি ইত্যাদি সঠিকভাবে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে এবং কর্মসম্পাদনে কর্মীরা যাতে যত্নবান হয় ও সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন করে সেই সংক্রান্ত গাইডলাইন। কারবারের যেসব বিষয় পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) কারবারের উদ্দেশ্য পরিস্কারভাবে উল্লেখ করতে হয়।

(ii) কী কী কাজ সম্পন্ন করা হবে তার বিশদ বিবরণ।

(iii) কাজের গুণগত মান সম্বন্ধে নির্দেশিকা।

(iv) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা।

(v) কাজ সম্পাদনের জন্য কর্মী ও অন্যান্য যেসব সম্পদের প্রয়োজন হয় এবং বাজেট।

(vi) কাজ রূপায়ণ বা সম্পাদনের সময়সূচি।

(vii) কাজের অগ্রগতি জানার ব্যবস্থা।

কাজেই একটি কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা হল উদ্যোগ বা কারবারের কৌশলগত পরিকল্পনার অংশবিশেষ। এটি হল একটি বিশদ পরিকল্পনা যা থেকে বোঝা যায় যে একটি কর্মীদল বা বিভাগীয় কর্মী কীভাবে কারবারের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কাজ করবে। এই পরিকল্পনায় কারবারের দৈনন্দিন কাজে উল্লেখ থাকে এবং কীভাবে কে বা কারা সেই কাজটি কখন সম্পন্ন করবে সে ব্যাপারে আগাম ধারণা দেয়। বস্তুত একটি কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা হল কারবারের কৌশলগত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কৌশলের রূপায়ণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা।

3.3.1 কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ

কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রধান সুবিধা হল যে কারবার বা উদ্যোগ বুঝতে পারে যে মুনাফার উপর কার্য সম্পাদনের প্রভাব কতখানি। এ ধরনের পরিকল্পনা কারবারের আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে, দুর্বলতাগুলি সনাক্ত করে এবং মুনাফা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় তার উপায় খুঁজে বের করে। এর অন্যান্য সুবিধাগুলি নীচে তুলে ধরা হল—

(i) এই পরিকল্পনা উদ্যোগ বা কারবারের পণ্য ও সেবার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় এবং বাজার অংশ সর্বাধিক করার পরিকল্পনা করে।

(ii) পরিকল্পনা একটি সম্ভাব্য আর্থিক চিত্র প্রকাশ করে।

(iii) কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা উৎপাদন, মেশিনপত্র, কর্মী, কাঁচামাল এবং কারবারি প্রক্রিয়ার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় এবং সবগুলির সঠিক ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা করে।

(iv) কারবারের মুনাফাযোগ্যতা নির্ধারণেও এই পরিকল্পনা সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, কোন্ উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলি মুনাফা বৃদ্ধি করবে তা চিহ্নিত করার জন্য পরিকল্পনায় প্রতিদান অনুপাত (contribution ratio) ব্যবহার করা হয়।

(v) কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পাদন প্রক্রিয়ার কোথায় কোথায় ত্রুটি আছে সেগুলি চিহ্নিত করা যায় এবং পরবর্তীকালে ত্রুটিগুলি সংশোধন করার ববস্থা করা হয়।

(vi) এ ধরনের পরিকল্পনার প্রধান সুবিধাটি হল যে এর মাধ্যমে কারবারের মুনাফার উপর বিভিন্ন কাজের প্রভাব বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

3.3.2 পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ। কারণ কারবারে দৈনন্দিন যেসব কাজ করতে হয় সেগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব থাকে, কারণ প্রতিটি কাজই কম-বেশি মুনাফাকে প্রভাবিত করে। এজন্যই প্রতিটি কাজের জন্য যেমন পরিকল্পনা করা দরকার, তেমনি সাথে সাথে

তাদের নিয়ন্ত্রণ করারও আবশ্যক হয়। পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ পরস্পরের পরিপূরক যদিও প্রথমটি ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত বিভ্রান্ত পূরণের সাথে যুক্ত এবং নিয়ন্ত্রণ অতীতের কাজের নিরিখে কাজের প্রমাণ মান নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া। কাজেই কারবারের কাজগুলি যাতে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ, উভয়েরই প্রয়োজন হয়। কারণ সঠিক পরিকল্পনা ও সঠিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ কারবারের কাজ যাতে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং ক্রেতাদের চাহিদা ভালোভাবে পূরণ হয় তার ব্যবস্থা করে। পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ দুটি পৃথক শব্দ, পৃথক ধারণা ও পৃথক কাজ করে। তবে একজায়গায় এদের মধ্যে মিল হল যে এই দুটি বিষয়ই কারবার ব্যবস্থাপনার দুই স্তম্ভ হিসাবে গণ্য হয় এবং অপর দুটি স্তম্ভ হল সংগঠন গড়ে তোলা (Organising) ও সমন্বয়সাধন (Co-ordinating)।

3.4 মানব সম্পদ এবং বিপণন পরিকল্পনা

মানব সম্পদ পরিকল্পনা : উৎপাদনের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কতজন কর্মী এবং কি ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন—এরই ভিত্তিতে মানবিক সম্পদের প্রয়োজন সম্পর্কে হিসাব করতে হয়। আবার কোন প্রকল্পের কাজ সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে হলে এক সুনির্দিষ্ট মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এই মানব সম্পদ পরিকল্পনার অন্তর্গত অন্যতম বিষয়গুলি হল প্রয়োজনীয় মানব শক্তির পরিমান, প্রত্যেক কর্মীর কর্তৃত্ব, দায়িত্ব ও কর্তব্য সাংগঠনিক কাঠামোর কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন কর্মীর ওপর দায়িত্ব ও কর্তব্য কিভাবে অর্পণ করা হবে তার রূপরেখা ও আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিত্তিতে কাজগুলি কিভাবে সম্পাদিত হবে, তার ব্যাখ্যা এমনকি কর্মী সংগ্রহের উৎসসমূহ, কর্মী সংগ্রহের ব্যয়, প্রশিক্ষণের প্রয়োজন কিনা এবং তার জন্য আনুমানিক ব্যয় পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখ করতে হয়।

বিপণন পরিকল্পনা : বাজার গবেষণার এবং উদ্যোক্তর সাফল্যের শর্তের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে বাজার এবং বিপণন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে উদ্যোক্তা একটি সুনির্দিষ্ট কৌশল নির্ধারণ করেন। এই পরিকল্পনা আলোকপাত করে বিশেষ ধরনের বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলীর ওপর। যেমন—

(i) **দাম (Price) :** পণ্য বা সেবার সুনির্দিষ্ট দাম নির্ধারণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। উদ্যোগের দাম নির্ধারণের নীতি স্বচ্ছভাবে চিহ্নিত করতে হবে। পাইকারি দাম, খুচরা দাম, বিশাল পরিমানের দ্রব্যের দাম, বিক্রয়ের শর্ত, মূল্য তালিকা তৈরি করতে ব্যবহৃত পদ্ধতি-সংক্রান্ত নীতি বিশেষভাবে বর্ণনা করতে হবে।

(ii) **প্রসার (Promotion) :** সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যক্তিগত বিক্রয়, বিজ্ঞাপন, জনসম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রসার সংক্রান্ত কৌশল নির্বাচন করতে হবে।

(iii) **সেবা ও নিশ্চয়তার শর্ত (Service and Warranty Condition) :** বিক্রয়োত্তর সেবা, খরিদ্দার সমর্থন ও বিরোধীপক্ষের আলোচনারূপে বিপণন প্রচেষ্টার সমর্থনকারী কোন অস্বাভাবিক নিশ্চয়তার শর্ত চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

(iv) **বণ্টন প্রণালী (Distribution Channel) :** বাজার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বণ্টন প্রণালীগুলি গ্রহণ করতে হবে। যেমন—পাইকারি, খুচরা, ডাকযোগে কারবার, মধ্যস্থ কারবারী মাধ্যমে কারবার ইত্যাদি।

(v) **বিপণন নেতৃত্ব (Marketing Leadership) :** বাজার পরিকল্পনার মাধ্যমে ঠিক করা হয় সংগঠনের সদস্যগণ উদ্যোগের বিপণন সংক্রান্ত প্রচেষ্টায় কিভাবে নিজেদের যুক্ত করবেন। বিনিয়োগকারীরা প্রকৃত বিপণন সংক্রান্ত কাজের জন্য দায়ী ব্যক্তির সম্পর্কে অধিক উৎসাহ থাকে।

3.5 সারাংশ

এই এককটি পড়ে আপনারা যে সমস্ত বিষয় জানতে পারলেন তা হল—

- পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে ধারণা
- কার্যসম্পাদন পরিকল্পনা
- মানবসম্পদ এবং বিপণন পরিকল্পনা

3.6 প্রশ্নাবলি

ক. এমসিকিউ প্রশ্নাবলি

1. নীচে উল্লিখিত উপাদানগুলি মধ্যে কোনটি কার্যসম্পাদনের (operations) উপাদান হিসাবে গণ্য হয়?

   (ক) অবস্থান (খ) যন্ত্রপাতি

   (গ) প্রক্রিয়া (ঘ) সবগুলিই

2. নিচের কোনটি পরিকল্পনার উপাদান হিসাবে গণ্য হয় না?

   (ক) দূরদৃষ্টি (খ) মূল্যায়ন

   (গ) পূর্বামান (ঘ) কল্পনা

3. নীচের কোনটি পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে গণ্য হয়?

   (ক) তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (খ) নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

   (গ) বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি (ঘ) কোনোটিই নয়

4. নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নীচের কোন বক্তব্যটি তুমি সঠিক বলে মনে করো?

   (ক) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজকে নির্দেশ দেয়

   (খ) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার কাজগুলিকে নেতৃত্ব দেয়

(গ) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজকে অনুসরণ করে

(ঘ) কোনোটিই নয়

5. পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে নীচের কোন বক্তব্যটি সঠিক বলে তুমি মনে করো?

(ক) পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ পরস্পরের পরিপূরক

(খ) নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে

(গ) উভয়ই ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি দেয়

(ঘ) সবগুলিই

6. নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপের কাজ হল———। শূন্যস্থানটি পূরণ করো।

(ক) কৃত কাজের পরিমাপ (খ) প্রমাণ মান নির্ধারণ

(গ) বিচ্যুতির কারণ সনাক্ত করা (ঘ) কোনোটিই নয়

7. নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার শেষ ধাপের কাজ বলে নীচের কোনটিকে তুমি সঠিক মনে করো?

(ক) কাজের প্রমাণ মান নির্ধারণ (খ) প্রকৃত কাজের সাথে তুলনা

(গ) বিচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করা (ঘ) সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

8. একটি উদ্যোগের শক্তি (Strenght), সুযোগ (Opportunity), দুর্বলতা (Weakness) ও আশঙ্কা (Threat), চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াটিকে কী বলা হয়?

(ক) TWOS বিশ্লেষণ (খ) SWOT বিশ্লেষণ

(গ) WOST বিশ্লেষণ (ঘ) কোনোটিই নয়

9. নীচের কোনটি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ধাপ বলে গণ্য হয়?

(ক) উদ্দেশ্য স্থির করা (খ) বিকল্প পথের সন্ধান

(গ) সহায়ক পরিকল্পনা তৈরি (ঘ) সবগুলিই

10. পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ কোনটি?

(ক) অনুমিত বিষয় নির্ধারণ (খ) সময়সূচি ও কার্যসূচি চূড়ান্ত করা

(গ) রূপায়ণ ও অনুবর্তন (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: 1. (ঘ) 2. (খ) 3. (ক) 4. (গ) 5. (ঘ) 6. (খ)
7. (ঘ) 8. (খ) 9. (ঘ) 10. (গ)

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. পরিকল্পনা প্রণয়ন কাকে বলে?

2. পরিকল্পনার যেকোন দুটি উপাদান উল্লেখ করুন—

3. কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার যেকোন দুটি সুবিধা উল্লেখ করুন।
4. কার্যসম্পাদন পরিকল্পনায় কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে?
5. পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপটি উল্লেখ করুন?

গ. দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. পরিকল্পনার উপাদানগুলি আলোচনা করুন।
2. কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ উল্লেখ করুন।
3. পরিকল্পনা বনাম পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যাখ্যা করুন।
4. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যা করুন।
5. পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপগুলি আলোচনা করুন।
6. মানব সম্পদ এবং বিপণন পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করুন।

একক-4 ❑ কারবারি ধারণার উৎসসমূহ এবং সম্ভাব্যতা পরীক্ষা (Sources of Business ideas and tests of Feasibility)

গঠন

4.0 উদ্দেশ্য

4.1 প্রস্তাবনা

4.2 কারবারি ধারণার উৎসসমূহ

4.3 সম্ভাব্যতা পরীক্ষা

4.4 কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব

4.4.1 কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাবের তাৎপর্য

4.4.2 কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

4.5 কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা প্রণয়ন

4.6 নতুন উদ্যোগ বা কারবারের অবস্থান

4.6.1 উদ্যোগের অবস্থান নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

4.7 নতুন উদ্যোগের সজ্জা

4.7.1 উদ্যোগের অভ্যন্তরীণ সজ্জার ধরন

4.8 নতুন উদ্যোগের কার্যসম্পাদন

4.9 নিয়ন্ত্রণ

4.9.1 নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য

4.9.2 নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

4.9.3 পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সম্পর্ক

4.9.4 কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ

4.9.5 পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকলাপ

4.10 পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রণয়ন

4.11 সারাংশ

4.12 প্রশ্নাবলী

4.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- কারবারি ধারণার উৎসসমূহ
- কারবারি পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব
- সম্ভাব্যতা পরীক্ষা
- কারবারের কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা প্রণয়ন
- নতুন উদ্যোগ বা কারবারের অবস্থান
- নতুন উদ্যোগের সজ্জা
- নিয়ন্ত্রণ
- পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রণয়ন

4.1 প্রস্তাবনা

কারবারি উদ্যোগ গড়ে ওঠে একটি ধারণার উপর যার মধ্যে সৃজনশীলতা, নতুনত্ব এবং উদ্ভাবন থাকে। ধারণা বলতে বোঝায় নতুন কোনো সুযোগ যা কাজে লাগিয়ে একটি উদ্যোগ গড়ে ওঠে। তাই যে কোনো উদ্যোগের পূর্বশর্তই হল ধারণার সনাক্তকরণ ও যে ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে তাকে চিহ্নিতকরণ। ধারণার উপর ভিত্তি করেই একটি কারবারি উদ্যোগ গড়ে ওঠে। কারবারি ধারণা বিভিন্ন উৎস থেকে উপলব্ধ হতে পারে। এই একক থেকে কারবারি ধারণার বিভিন্ন উৎসসমূহ এবং সম্ভাব্যতা পরীক্ষা সম্পর্কে আপনারা জানতে পারবেন।

4.2 কারবারি ধারণার উৎসসমূহ

কারবারি উদ্যোগ গড়ে ওঠে একটি ধারণার উপর যার মধ্যে সৃজনশীলতা, নতুনত্ব এবং উদ্ভাবন থাকে। ধারণা বলতে বোঝায় নতুন কোনো সুযোগ যা কাজে লাগিয়ে একটি উদ্যোগ গড়ে ওঠে। তাই যে কোনো উদ্যোগের পূর্বশর্তই হল ধারণার সনাক্তকরণ ও যে ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে। ধারণার উপর ভিত্তি করেই একটি কারবারি উদ্যোগ বা সংস্থা গড়ে ওঠে। কারবারি ধারণা বিভিন্ন উৎস থেকে উপলব্ধ হতে পারে এবং এই উৎস দু-ধরনের—**অভ্যন্তরীণ উৎস** ও **বাহ্যিক উৎস**।

নীচে ধারণার বিভিন্ন উৎসগুলি তুলে ধরা হল :

(i) ক্রেতাদের সম্ভাব্য চাহিদা বা প্রয়োজন সংক্রান্ত জ্ঞান;

(ii) বাজারে কতকগুলি পণ্যের চাহিদার ক্রমাগত বৃদ্ধি লাভ করা;

(iii) বিকল্প কোনো পণ্য উৎপাদনের সুযোগ;

(iv) কোনো পরিচিত উদ্যোক্তা বা বন্ধু বা আত্মীয়-এর কারবারি সাফল্যের বিবরণ;

(v) যেসব বাণিজ্যিক মেলা বা প্রদর্শনীতে নতুন পণ্য প্রদর্শন করা হয় সেখানে পরিদর্শন করা;

(vi) সরকারি প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা;

(vii) কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত কোনো ধারণা;

(viii) সরকারি নীতি, ছাড়, উৎসাহ দান ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্ঞান এবং যে সব পণ্য কেবলমাত্র ক্ষুদ্রায়তন কারবারি ক্ষেত্রেই উৎপাদিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকে;

(ix) প্রতিযোগী উৎপাদক যখন কোনো নতুন পণ্য বাজারে নিয়ে আসে;

(x) উদ্যোক্তা নিজস্ব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোনো ধারণার সন্ধান পেলে।

সংক্ষেপে একজন ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তা তার কারবার গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ধারণা বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করতে পারে। কারণ উদ্যোগ গঠনের প্রথম কাজটি শুরু হয় ধারণার উন্মেষ বা সনাক্তকরণের মধ্য দিয়ে। এই ধারণার উৎসগুলিকে অন্যভাবে বলতে গেলে, তারা হল **ক্রেতা বা ভোক্তা, বর্তমান পণ্য বা সেবা যেগুলি বাজারে পাওয়া যায়, পণ্য-বণ্টন প্রণালী, সরকারি আধিকারিক এবং গবেষণা ও উন্নয়ন**। এদের সম্বন্ধে নীচে সংক্ষেপে ধারণা দেওয়া হল।

(i) ক্রেতা বা ভোক্তা (Consumers) : ক্রেতা বা ভোক্তা ছাড়া কোনো কারবারের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। ক্রেতারাই তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য পণ্য বা সেবা ক্রয় করে। আর ক্রেতাদের মানসিকতা হল যে তাদের রুচি, পছন্দ, আকাঙ্ক্ষা সদা পরিবর্তনশীল। সে কারণেই একজন উদ্যোক্তা জানতে চায় যে ক্রেতারা প্রকৃতই কোন্ ধরনের পণ্য বা সেবা পেতে চায় যাতে উদ্যোক্তা ঠিক তাদের পছন্দমতো পণ্য বা সেবা তৈরি করতে ও যোগান দিতে পারে।

(ii) বর্তমান পণ্য ও সেবা (Existing Product and Service) : বাজারে প্রচলিত অর্থাৎ বর্তমান পণ্য ও সেবার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তাদের অন্তর্নিহিত অসুবিধা বা ঘাটতি অনুধাবনের মাধ্যমেও নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ প্রচলিত পণ্য বা সেবার ঘাটতিগুলি দূর করে আরো ভালোভাবে ক্রেতাদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য পণ্য বা সেবার উন্নয়ন করাও একটি কারবারি ধারণা এবং এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। এভাবেই প্রচলিত পণ্য বা সেবাও বাণিজ্যিক ধারণার উৎস হতে পারে।

(iii) পণ্য বা সেবার বণ্টন প্রণালী (Distribution Channel) : পণ্য বা সেবার বণ্টন প্রণালীকে মধ্যস্থ কারবারি হিসাবে গণ্য করা হয়। এসব মধ্য কারবারিরা উদ্যোক্তাদের কাছে নতুন ধারণার উৎস হিসাবে গণ্য হয়। এর কারণ হল যে তারা চূড়ান্ত ভোগকারীদের সাথে যুক্ত এবং এর ফলে তাদের চাহিদা, পছন্দ, অপছন্দ, প্রয়োজন ইত্যাদি অনেক ভালোভাবে জানতে পারে। এ কারণেই পাইকার ও খুচরা কারবারিরা পণ্য বা সেবার কাম্য উন্নয়ন ও পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারে। এর উপর ভিত্তি করে কারবারি তার পণ্য বা সেবার উন্নয়ন ও পরিবর্তন ঘটায়।

(iv) সরকার (Government) : সরকারও নতুন পণ্য বা সেবা সংক্রান্ত ধারণার উৎস হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন সময়ে সরকার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেষ ঘোষণা করে যার ফলে অনেক পণ্য

অপ্রচলিত বা বাতিল হয়ে পড়ে। এরূপক্ষেত্রে একজন উদ্যোক্তা বিকল্প পণ্য উৎপাদনের দিকে ঝোঁকে। উদাহরণস্বরূপ, সরকার পলিথিন ব্যাগ তৈরির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে পাটজাত ব্যাগের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও অনেক সময় সরকার পেটেন্ট বিক্রয় করে পেটেন্ট অনুসারে পণ্য উৎপাদন করার অনুমতি দেয়। এগুলিও নতুন ধারণার উৎস হিসাবে গণ্য হয়। এগুলি ছাড়াও কিছু সরকারি সংস্থা রয়েছে যারা উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে, যেগুলি বাণিজ্যিক ধারণা হিসাবেও গণ্য হয়।

(v) গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and development) : গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপও কারবারি ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কিছু আধুনিক শিল্প যেমন ঔষধ, পেট্রো-রসায়ন, সফটওয়্যার ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যকলাপ ধারাবাহিকভাবে চালানো হয়। এর ফলে যে নতুন আবিষ্কার বা উদ্ভাবন ঘটে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসাবে গণ্য হয়। গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যকলাপের মাধ্যমে ক্রেতাদের পছন্দসই ও প্রয়োজন উপযোগী পণ্য বা সেবার উৎপাদন ও যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে প্রচুর নতুন কারবারি সংস্থা গড়ে উঠেছে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যকলাপের প্রাপ্ত ফলাফলের উপর। বস্তুত পণ্য ও সেবার বিভিন্ন ধারণা গবেষণা ও উন্নয়নের সামগ্রিক ফল হিসাবেই গণ্য হয়।

ধারণার উপরোক্ত উৎসগুলি থেকে যে ধারণা পাওয়া যায় তার যদি বাণিজ্যিক সম্ভাবনা না থাকে তাহলে ধারণা নিরর্থক হয়ে পড়ে। উৎস যাই হোক না কেন ধারণার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা থাকা একান্তভাবে আবশ্যক।

4.3 সম্ভাব্যতা পরীক্ষা

সব ধারণারই সমানভাবে বাণিজ্যিক উপযোগিতা থাকে না। ধারণা ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যা কল্পনা বা পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ভূত হয়। তবে কোনো ধারণা যদি আকাশ-কুসুম কল্পনা থেকে উদ্ভূত হয় এবং বাস্তবে যা কার্যকর করা সম্ভব নয় সেসব ধারণা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। আবার এমন কিছু ধারণা থাকে যেগুলির বাস্তব যোগ রয়েছে এবং বাণিজ্যিক সাফল্য পাওয়া কঠিন সেগুলিও এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কারবারি ধারণার অবশ্যই বাণিজ্যিক গুরুত্ব ও মুনাফাযোগ্যতা থাকতে হবে। কাজেই এরূপ ধারণার উপরই একটি নতুন উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে এবং যার মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিহিত থাকে। সে কারণেই উদ্যোক্তা যখন কোনো ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি নতুন সংস্থা গড়ে তুলতে চান বা নতুন কোনো পণ্য বা সেবা বাজারে আনতে চান তখন ধারণার কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো আবশ্যক হয় অর্থাৎ নতুন ধারণার সম্ভাবনা কতটা সে সংক্রান্ত পরীক্ষাকেই ধারণার **সম্ভাব্যতা পরীক্ষা** বলা হয়। বস্তুত কোনো ধারণার সম্ভাব্যতা পরীক্ষার ফল ধনাত্মক হলে ধারণাটি গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তী কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল ঋণাত্মক হলে ধারণাকে বর্জন করা হয় ও নতুন ধারণার সন্ধান করা হয়।

বস্তুত ধারণার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা বলতে বোঝায় ধারণার চুলচেরা বিশ্লেষণ ও তার কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা কতখানি তা নির্ধারণ করা। একে সম্পাদনযোগ্যতা যাচাইকরণ প্রক্রিয়া হিসাবেও গণ্য করা হয়। যেহেতু একটি ধারণার উপর নির্ভর করে অনেক সময়, অর্থ ও প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করা হয় তাই তার সাফল্যের সম্ভাবনা আগাম জানা থাকা আবশ্যক। এরূপ পরীক্ষার মাধ্যমেই একটি ধারণার সাফল্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে বাজার সমীক্ষা ও বাণিজ্যিক সাফল্যের বিষয়গুলি সম্পর্কেও জানা যায়। সম্ভাব্যতা পরীক্ষা মূলত তিন ধরনের। এগুলি নীচে তুলে ধরা হল।

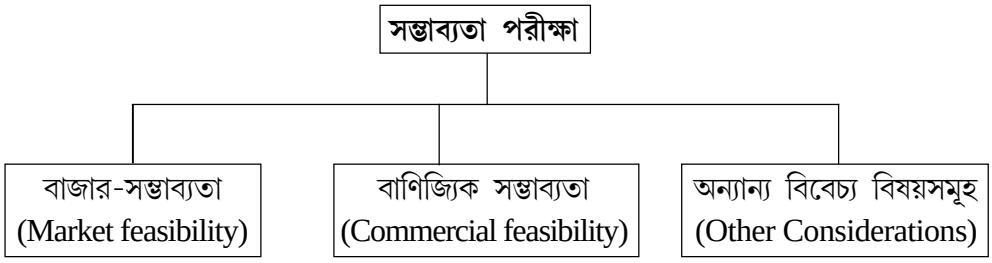

নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল—

1. **বাজার-সম্ভাব্যতা (Market Feasibility) :** উদ্যোক্তা যে বাজারে তার উৎপাদিত পণ্য বা সেবা ভবিষ্যতে বিক্রয় করবে সে সম্বন্ধে তার সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা দরকার। সংক্ষেপে বাজার সমীক্ষার মাধ্যমে বাজারের চরিত্র, গভীরতা, চাহিদা ও যোগানের ধরন, ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা, ব্যাপকতা, প্রতিযোগিতার ধরন ও প্রতিযোগীদের সংখ্যা ইত্যাদি অনুধাবন করা হয়। কাজেই বাজার-সম্ভাব্যতা পরীক্ষার মাধ্যমে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়।
   (i) বাজারে সম্ভাব্য পণ্য বা সেবার চাহিদার পরিমাণ কত?
   (ii) কোন ধরনের ক্রেতারা উৎপাদিত পণ্য বা সেবা ক্রয়ে আগ্রহী?
   (iii) সম্ভাব্য ক্রেতাদের সংখ্যা, তাদের বিবরণ ও তাদের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য।
   (iv) কীভাবে পণ্য বা সেবা বাজারে বিক্রয় করা হবে?
   (v) বাজারে সম্ভাব্য প্রতিযোগী কারা এবং তাদের সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা।
   (vi) সম্ভাব্য পণ্য ও সেবা কি ক্রেতাদের কোনো অপূরণীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম?
   (vii) প্রতিযোগীদের পণ্য ও সেবার তুলনায় সম্ভাব্য সেবা ও পণ্যের দাম ও গুণগত মান কীরূপ?
   (viii) বাজারে যে সব প্রতিযোগী রয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান প্রতিযোগীর শক্তি ও দুর্বলতার জায়গাগুলি কী কী?
   (ix) বাজারে পণ্য বা সেবা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা আছে কিনা?
2. **বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা (Commercial Feasibility) :** ধারণাটি প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হলে এবং সম্ভাব্য পণ্যের বাজার থাকলেও ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা বিচার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। একটি ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে নীচের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(i) উদ্যোক্তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চালানোর জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন যা সে কারবার থেকে উপার্জন করতে চায়?

(ii) উদ্যোগের উৎপাদিত পণ্য বা সেবা কতদিন পর বিক্রয়যোগ্য হবে?

(iii) কারবার শুরু করার জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে?

(iv) ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে?

(v) কারবারের স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের আনুমানিক পরিমাণ।

(vi) উৎপাদিত পণ্য বা সেবার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতারা কী দাম দেবে বলে মনে করা হয়?

(vii) কারবারের বিক্রয় পূর্বানুমান কী পরিমাণের?

(viii) কারবারে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার সমভঙ্গ বিন্দু (BEP) কত?

(ix) সমভঙ্গ বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য কত পরিমাণ বিক্রয় করতে হবে?

(x) কারবারের উৎপাদন মসৃণভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কত পরিমাণ কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন হবে?

(xi) লগ্নির উপর প্রত্যাশিত আয়ের হার (Rate of return) কত?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর সদর্থক হলে বলা যায় যে ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে এবং সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

3. **অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Other Considerations) :** ধারণার সম্ভাব্যতা পরীক্ষায় বাজার-সম্ভাব্যতা ও বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা পরীক্ষার পরও অন্যান্য কতকগুলি বিষয় পরীক্ষা করা হয়। নীচে এগুলি তুলে ধরা হল—

(i) কারবার শুরু করার জন্য কি কোনো আইনগত বিধিনিষেধ মেনে চলা আবশ্যক?

(ii) কারবার শুরুর জন্য যদি লাইসেন্স বা অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হয় তাহলে সেগুলি সংগ্রহ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?

(iii) কারবার শুরু করতে দেরি হওয়ার পিছনে কোনো কারণ রয়েছে কিনা?

(iv) সম্ভাব্য পণ্য বা সেবার বাজারজাতকরণের জন্য উদ্যোক্তার প্রয়োজনীয় দক্ষতা রয়েছে কিনা?

4.4 কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব

অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and Definition) : সাধারণ কথায় কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব হল কারবারের উদ্যোক্তা কী করতে চায় সে সংক্রান্ত একটি লিখিত প্রতিবেদন। একটি নতুন উদ্যোগ বা সংস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কারবার পরিকল্পনা ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে গণ্য হয়। কারবার পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রস্তাব সমার্থক অর্থাৎ একই। সে কারণে উদ্যোগ উন্নয়নের প্রমাণ্য গ্রন্থে কারবার পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রস্তাব উভয়ই একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ একের বদলে অন্যটির ব্যবহার দেখা যায়।

কারবার পরিকল্পনা হল কারবারের পথ প্রদর্শক বা যা করা হবে তার তালিকা। এতে কারবারের উদ্যোক্তা কী করতে চায় এবং কীভাবে করতে চায় তার বিবরণ উল্লেখ থাকে। অন্যভাবে বলা যায় উদ্যোক্তা তার লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যে পথ ধরে চলতে চায় এটি তার সারণি। এই প্রতিবেদনে যেমন লক্ষ্য স্থির করা হয় তেমনি লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী কী কাজ করতে হবে, কখন করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে সে ব্যাপারে আগাম কার্যসূচি লিপিবদ্ধ থাকে।

ওয়েবস্টার অভিধান (Websters Dictionary) প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে 'একটি প্রকল্প হল একটি কর্মসূচি, নক্শা ও কোনো কিছু করতে চাওয়ার প্রস্তাব'।

মার্ক জে. ডোলিঙ্গার (Marc J. Dollinger) কারবার পরিকল্পনার সংজ্ঞায় বলেছেন যে কারবার পরিকল্পনা হল উদ্যোক্তার লক্ষ্যপূরণের বিধিসম্মত লিখিত বক্তব্য যাতে প্রস্তাবিত উদ্যোগের কৌশল ও কাজের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

জ্যাক. এম. কাপলান (Jack. M. Kaplan) কারবার পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে 'কারবার বা উদ্যোগ পরিকল্পনা বলতে বোঝায় একটি লিখিত দলিলের উন্নয়ন যা উদ্যোগের চলার পথের দিশা দেখায়, যা থেকে বোঝা যায় যে কারবার এখন কোথায় আছে, কোথায় যেতে চায় এবং কীভাবে যেতে চায় এবং কীভাবে যেতে চায়'।

কাজেই ব্যবসার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, এটি হল প্রস্তাবিত উদ্যোগের কর্মসূচি যা অনেক চিন্তা-ভাবনার পর স্থির করা হয় এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কাজেই কারবার পরিকল্পনা হল একটি কার্যনির্বাহী দলিল।

4.4.1 কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাবের তাৎপর্য

গবেষণার মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে অনেক নতুন কারবারিই কোনো কারবার পরিকল্পনা ছাড়াই কারবার শুরু করে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে তারা তাদের কারবারি ধারণার রূপায়ণ কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই শুরু করে। কিন্তু কালক্রমে এই উদ্যোক্তারা বুঝতে পারে যে কারবারি পরিবেশ ও পথ অত্যন্ত বন্ধুর। তাই তারা অনুধাবন করে যে তাদের শুরু নতুন করে পুনর্গঠন করা দরকার এবং একটি পথ নির্দেশিকা বা রোড ম্যাপ থাকা দরকার। কাজেই প্রথমে না হলেও পরবর্তীকালে তারা একটি কারবার পরিকল্পনা তৈরি করে। আর এখানেই কারবার পরিকল্পনা তথা প্রকল্প প্রস্তাবের তাৎপর্য বোঝা যায়।

লিখিত আকারে কারবার পরিকল্পনা তৈরির পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এর বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হল যে এতে কারবারের ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে। কারণ কারবার তৈরি করার জন্য বাইরের পরামর্শদাতা বা হিসাবরক্ষক বা উকিল ভাড়া করতে হয় এবং তাদের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে ব্যবসায় পরিকল্পনা তৈরি না হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ হল যে কারবার গড়ে ওঠার আগেই সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তবে লিখিত কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করার পিছনে প্রধান যুক্তি হল যে এটি উদ্যোক্তাদের উদ্বেগ ও মানসিক চাপ কমাতে ও কারবার গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এছাড়া এ ধরনের পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে গণ্য হয় এবং যে সব উদ্যোক্তা বাহ্যিক উৎস যেমন

ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে কারবার চালাতে চায় তাদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা কারবার পরিকল্পনা থেকে কারবারের ভবিষ্যৎ সাফল্যের ধারণা পায় ও সন্তুষ্ট হলে উদ্যোগে ঋণ দিতে সম্মত হয়। অন্যথায় ঋণ পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। একথা ঠিক যে কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করার জন্য কিছু অর্থ ব্যয় হয় কিন্তু এর থেকে যে সুবিধা পাওয়া যায় তার নিরিখে ব্যয় অকিঞ্চিৎকর।

কারবারের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে এবং লক্ষ্য ছাড়া কারবার গঠন করতে যাওয়া দিবা স্বপ্নের নামান্তর। যদি কাগজে এই লক্ষ্য ও লক্ষ্যপথ লিপিবদ্ধ করা না হয় তাহলে তা অনেকাংশে মাটি ছাড়া বীজ বা কেবলমাত্র ইচ্ছার সাথে তুলনা করা যায়, যা রূপায়ণযোগ্য নয় এবং রূপায়ণ ছাড়া কোনো ফলেরও আশা করা যায় না। সে কারণেই কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব উদ্যোক্তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি কারবার পরিকল্পনা দু-ধরনের অপরিহার্য কাজ করে থাকে। **প্রথমত** এবং যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল এটি কারবারের পথপ্রদর্শকের কাজ করে। এর থেকে যে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় সেগুলি হল কোন দিকে বা দিশায় কারবারি সংস্থাটি অগ্রসর হচ্ছে, এর লক্ষ্য কী এবং কোথায় যেতে চায় এবং কীভাবে গেলে লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হবে। এছাড়াও এর মাধ্যমেই উদ্যোক্ত জানতে পারে যে সে সঠিক দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞের মত হল যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া উদ্যোক্তা কারবারে অগ্রসর হলে দেখা যায় যে তাদের পথ অত্যন্ত কঠিন ও দুর্গম হয়ে পড়েছে।

কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রতিবেদনের **দ্বিতীয়** কাজটি হল যে বিনিয়োগকারী ও ঋণদাতাদের আকর্ষণ করা। যদিও এটি তৈরি করা ছোটো কারবারের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয় তবুও এর ব্যবহারিক কার্যকারিতা ও অন্যান্য সুবিধার জন্য এটি তৈরি করা প্রয়োজনীয়। বিশেষত যে সব ক্ষুদ্র কারবারি সংস্থা ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে এটি তৈরি করা বাধ্যতামূলক। কারণ এই প্রতিবেদন বা পরিকল্পনার দলিল বিশ্লেষণ করেই এইসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ-দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অর্থাৎ এই দলিলের উপর ভিত্তি করেই কারবারি সংস্থার ঋণযোগ্যতা নির্ধারিত হয়। এছাড়াও যারা নতুন উদ্যোগে বীজ মূলধন সরবরাহ করে, কাজের জায়গা দেয় বা কাঁচামাল সরবরাহ করে তারাও জানতে চায় যে কারবারের ভবিষ্যৎ কীরূপ। কাজেই ঋণ সংগ্রহ করতে বা বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করতে কারবার পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই।

পরিশেষে কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরা যায়। এই বক্তব্যে বলা হয়েছে যে ''যদি একজন উদ্যোক্তা তার কারবার পরিকল্পনা লিখিত আকারে তৈরি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে তার কারবারের ব্যর্থতার পরিকল্পনা করে" (*"If an entrepreneur fails to write business plan, he plans to fail in his/her business"*)।

4.4.2 কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

নতুন উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রতিবেদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর কোনো বিকল্প হয় না। আবার একটি ভালোভাবে কারবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কোনো সরল ও সহজ রাস্তা নেই। একটি সুন্দর ও সম্পূর্ণ কারবার পরিকল্পনা বাইরের বিভিন্ন পক্ষের আস্থা অর্জনের সহায়ক হয়

এবং কারবার চালাতে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা সহজেই পাওয়া যায়। সেকারণেই একটি কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রতিবেদন যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার সাথে এবং সবদিক বিবেচনা করে প্রস্তুত করতে হয়। সাধারণত একটি ভালো প্রকল্প প্রস্তাব বা কারবার পরিকল্পনার মধ্যে নীচের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(i) সাধারণ জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ (General Information) : সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি হল পণ্য তালিকা ও পণ্যের বিশদ বিবরণ। অর্থাৎ যেসব পণ্য উৎপাদন করা হবে তাদের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ।

(ii) প্রবর্তক বা উদ্যোক্তা (Promoter) : কারবারি সংস্থা গঠনে কারা মুখ্য ভূমিকা পালন করে ও প্রধান মালিকানা থাকে তাদের নাম শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা, প্রকল্প সংক্রান্ত জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি উল্লেখ করতে হয়।

(iii) স্থান (Location) : প্রকল্প বা উদ্যোগে সঠিক অবস্থান, ঠিকানা, লীজে নেওয়া কিনা, অবস্থানগত সুবিধা ইত্যাদি বিষয়গুলিও পরিকল্পনায় স্থান পায়।

(iv) জমি ও বাড়ি (Land and Building) : সংস্থাটি যে জমিতে অবস্থিত তার আয়তন, কত পরিমাণ জমিতে নির্মাণ কাজ হয়েছে বা হবে, নির্মাণ কাজের ধরন, নির্মাণ কাজের জন্য যে পরিমাণ ব্যয় হয়েছে বা অনুমিত ব্যয়, কারখানার নক্শা এবং মোট প্রত্যাশিত ব্যয় ইত্যাদি কারবার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

(v) মেশিনপত্র (Plant and Machineries) : যে সব মেশিনপত্রের প্রয়োজন হবে তাদের বিশদ বিবরণ, কর্মক্ষমতা, সরবরাহকারী সংস্থা সংক্রান্ত তথ্য, দাম, বিকল্প মেশিনপত্রের মূল্য এবং বিবিধ সম্পত্তির মূল্যও এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

(vi) উৎপাদন প্রক্রিয়া (Production Process) : উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিবরণ, প্রক্রিয়া তালিকা প্রযুক্তিগত কৃৎ-কৌশল, বিকল্প প্রযুক্তির সহজলভ্যতা ও উৎপাদন কার্যসূচি উল্লেখ করতে হয়।

(vii) সহায়ক বিষয়সমূহ (Utilities) : কারবারের উৎপাদন প্রক্রিয়া চালানোর জন্য বা অন্যান্য কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের যেমন, জল, শক্তি, বাষ্প, চাপের মাধ্যমে সঙ্কুচিত বাতাসের প্রয়োজনীয়তা, আনুমানিক ব্যয় ও সরবরাহের উৎস ইত্যাদি কারবার পরিকল্পনায় স্থান পায়।

(viii) পরিবহন ও যোগাযোগ (Transport and Communication) : কারবারের স্থানটি কী ধরনের পরিবহন মাধ্যম দ্বারা যুক্ত, পরিবহন যান পাওয়ার সম্ভাবনা ও ব্যয় ইত্যাদিও প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

(ix) কাঁচামাল (Raw Materials) : কারবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের একটি তালিকা যুক্ত করতে হয় ও সাথে সাথে তাদের গুণমান ও পরিমাণও উল্লেখ করতে হয়। এছাড়াও প্রস্তাবিত কাঁচামালের উৎসসমূহ অর্থাৎ যেখান থেকে সেগুলি সংগ্রহ করা হবে সে সংক্রান্ত তথ্যও দিতে হয়। যদি কাঁচামাল সরবরাহ করার জন্য কোনো সরবরাহকারীর সাথে চুক্তি

হয়ে থাকে তাহলে তার বিবরণ এবং আনুমানিক ব্যয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। এছাড়াও যদি নির্দিষ্ট কাঁচামালটি না পাওয়া যায় তাহলে বিকল্প ব্যবস্থার বিষয়টিও প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়।

(x) মনুষ্যশক্তি (Manpower) : কারবার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীর সংখ্যা, গুণগতমান অর্থাৎ কতজন দক্ষ, কতজন আধা-দক্ষ ও কতজন অদক্ষ কর্মীর প্রয়োজন তা উল্লেখ করা, কর্মী সংগ্রহের উৎসসমূহ, কর্মী সংগ্রহের ব্যয়, প্রশিক্ষণের প্রয়োজন কিনা এবং তার জন্য আনুমানিক ব্যয় পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখ করতে হয়।

(xi) পণ্যসমূহ (Products) : পণ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য একটি কারবার পরিকল্পনায় সম্বলিত থাকে। এর অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলি হল পণ্য মিশ্রণ, সম্ভাব্য বিক্রয় বণ্টন প্রণালী, প্রতিযোগিতার তীব্রতা, পণ্য-মান, ইনপুট-আউটপুট অনুপাত, বিকল্প পণ্য ইত্যাদি।

(xii) বাজার (Market) : ভোক্তা সংক্রান্ত তথ্য, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের চাহিদা, ব্যবসায় প্রথাসমূহ, বিক্রয় সম্প্রসারণের কৌশলসমূহ এবং বাজার গবেষণা ইত্যাদি বিষয়সমূহও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়।

(xiii) কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা (Requirement of Working Capital) : প্রয়োজনীয় কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ, তাদের উৎসসমূহ, ঋণের মাধ্যমে কার্যকরী মূলধন সংগ্রহের প্রকৃতি ও পরিমাণ ইত্যাদিও প্রকল্প প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকে।

(xiv) তহবিলের প্রয়োজনীয়তা (Requirement of Fund) : এই শিরোনামে যে সব তথ্য পরিকল্পনায় স্থান পায় সেগুলি হল বিভিন্ন খাতে মোট প্রকল্প ব্যয় ও তাদের বিভাজন যেমন, জমির মূল্য বাড়ির জন্য ব্যয়, যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মূল্য, বিবিধ সম্পত্তির জন্য ব্যয়, প্রাথমিক ব্যয়, কার্যকরী মূলধনের পরিমান এবং বিবিধ খুচরো ব্যয়।

(xv) মুনাফাযোগ্যতা (Profitability) : প্রকল্পের প্রথম 10 বছরের উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফাযোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যও পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পায়।

(xvi) সমভঙ্গ বিশ্লেষণ (Brak even Analysis) : উৎপাদনী সংস্থার স্থির ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয় ও বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে সমভঙ্গ বিন্দু স্থির করা হয়। এই বিন্দুতে প্রকল্পের কোনো ক্ষতি বা লাভ হয় না। এর উপরে পণ্য বিক্রয় করতে পারলে লাভ হয়। সুতরাং কত পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করলে লাভ বা ক্ষতি হয় না এবং কাম্য মুনাফা অর্জন করতে হলে কী পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করতে হবে সে সংক্রান্ত তথ্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

(xvii) রূপায়ণ (Implementation) : প্রকল্প রূপায়ণ বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হতে পারে। তাই সঠিক সময়ে যাতে প্রকল্প রূপায়িত হতে পারে সেজন্য একটি সময়সারণি তৈরি করতে হয় এবং এই তথ্য দিয়েই প্রকল্প প্রতিবেদন বা কারবার পরিকল্পনা সম্পূর্ণতা অর্জন করে।

4.5 কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা প্রণয়ন

কারবার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার কাজ সম্পন্ন করে। যখন কোনো কাজ একাধিক ধাপে সম্পন্ন হয় তখন প্রতিটি ধাপ একটি নির্দিষ্ট ক্রমে করতে হয়। কারণ প্রতিটি ধাপই পূর্বোক্ত ও পরবর্তী ধাপের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং কোনো ধাপকে বাদ দিলে বা অতিক্রম করে গেলে কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না। একেই প্রক্রিয়া বলে। অর্থাৎ প্রক্রিয়া হল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সব কাজ সম্পাদন করতে হয় এবং যে ক্রমান্বয়ে সম্পাদন করতে হয় তার সামগ্রিক রূপ। উদাহরণস্বরূপ চা তৈরি করার জন্য প্রথমে একটি চা তৈরির পাত্র নিতে হয়, তাতে যত কাপ চা তৈরি হবে সেইমতো জল দিতে হয়, পরবর্তী ধাপে আগুনের সাহায্যে জলকে ফোটাতে হয়, জল ফুটলে তাতে চা পাতা দিয়ে ঢাকা দিতে হয় এবং আগুন থেকে নামিয়ে নিতে হয়। এরপর কাপে প্রয়োজনমতো চিনি দিয়ে চা-এর লিকার ছাঁকনির সাহায্যে কাপে ঢালতে হয় এবং প্রয়োজন মতো গরম দুধ মেশাতে হয় ও সবশেষে চামচ দিয়ে নেড়ে পরিবেশন করতে হয়। সুতরাং সামগ্রিকভাবে চা তৈরি হল একটি প্রক্রিয়া এবং চা তৈরির প্রতিটি ধাপ পূর্ববর্তী ধাপের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই ধাপগুলির অদল-বদল করলে সঠিকভাবে চা তৈরি হবে না। অনুরূপভাবে কারবারি কার্যকলাপ সামগ্রিকভাবে একটি প্রক্রিয়া এবং কারবারি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণ করতে কোন্ কাজটি কোন্ কাজের পরে করা হবে তা আগাম স্থির করাই হল কারবারের কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা প্রণয়ন। বস্তুত এটি হল একটি কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা। ব্যবসায়ের কাজ যাতে ধারাবাহিক ও মসৃনভাবে চলতে পারে এবং কাজের ক্ষেত্রে কোনো বিঘ্ন না হয় এবং কাজের বিভিন্ন ধাপগুলি যে ক্রমে সম্পাদন করতে হবে তার নক্শা বা খসড়াই হল কারবার প্রক্রিয়ার রূররেখা প্রণয়ন।

প্রামাণ্য পাঠপুস্তকে কারবার প্রক্রিয়ার যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তা হল—এটি হল কারবারের লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ পৌনঃপুনিক পদক্ষেপ গ্রহণের একটি শ্রেণী (It's a series of repeatable steps that are critical for achieving some sort of a business goal)। এই সংজ্ঞায় পৌনঃপুনিক শব্দটি হল তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ কারবারে যে সব কাজ নিয়মিতভাবে ও বারে বারে করতে হয় তাই হল প্রক্রিয়া। কারবারের কাজ চালু রাখতে গেলে এগুলি বারে বারে করতে হয় এবং এগুলি অপৌনঃপুনিক প্রকৃতির নয় অর্থাৎ একবার সম্পাদন করলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। একটি কারবার প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপই হল সংগঠিত এবং যেগুলির পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ কারবারে বারে বারে ঘটতে থাকে। যেমন কারবারের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কতজন কর্মী নিয়োগ করা হবে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কীভাবে কর্মী নিয়োগ করা হবে সেটি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একই পদ্ধতি বারবার অনুসৃত হয় তা একজন বা বেশিজন কর্মী নিয়োগ যাই হোক না কেন। সুতরাং কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ার কোনো একটি ধাপ অনুসৃত না হলে কর্মী নিয়োগ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে। বস্তুত কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া কারবারের বিভিন্ন কাজকে মসৃণ করে তোলে এবং বাধাগুলিকে অপসারিত করে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কারবার প্রক্রিয়ার রূপরেখা (BPD) তৈরি করা হয় যখন কোনো কারবার শুরু করা হয়। এমতাবস্থায় কারবারের কোন্ কাজগুলি করা হবে এবং কীভাবে বা কোন্ পদ্ধতিতে করা হবে তা স্থির করা হয়। এভাবে কাজগুলিকে সংগঠিত করা হয়, কাজের রূপরেখা তৈরি করা হয় যার ফলস্বরূপ কাজের ক্ষেত্রে সর্বাধিক দক্ষতা অর্জন করা যায়। কারবার প্রক্রিয়ার রূপরেখা কর্মীদের পথ প্রদর্শকের কাজ

করে এবং এই রূপরেখা থেকে তারা কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন্ পদক্ষেপ কোন্ অনুক্রমে অনুসরণ করবে তা জানতে পারে। এর ফলে কাজের ক্ষেত্রে কোনো ব্যাঘাত হয় না এবং সহজেই কাজটি সম্পন্ন হয়। কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হল ক্রেতা বা ভোক্তাদের গুণগত মানের পণ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা দান তা কর্মী বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে যেভাবেই হোক না কেন। একটি ভালো কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা একটি কারবারের সাফল্য ও মুনাফাযোগ্যতাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। এই রূপরেখা যত ভালো হবে কারবারের ফলাফলও তত ভালো হবে।

সুবিধাসমূহ (Benefits) : একটি ভালো কারবার প্রক্রিয়ার রূপরেখা কারবারের লক্ষ্যপূরণের সহায়ক। এর অন্যান্য সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) কারবারের কর্মসম্পাদনে উন্নয়ন ঘটায় (Facilitates the business Operation) : একটি ভালো কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থার মধ্য থেকে সরল ও সহজ পন্থাটি বেছে নেয়। এর ফলে যারা কর্মপ্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকে তারা প্রক্রিয়াটি সহজেই বুঝতে পারে ও মনে রাখতে পারে। এর ফলে কর্মসম্পাদনে কর্মীরা দক্ষ হয়ে ওঠে এবং কারবারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

(ii) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (Increase Productivity) : যেহেতু কর্মীরা সম্পূর্ণ কর্ম প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকে তাই ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনাও হ্রাস পায়। কর্মীদের কর্ম প্রক্রিয়ার মধ্যে গতিশীলতার সঞ্চার হয় ও ফলস্বরূপ কারবারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

(iii) উচ্চমানের পণ্য ও সেবা (High Quality Products and Services) : একটি ভালো কর্ম প্রক্রিয়ার রূপরেখা কর্মীদের কাজ বুঝতে ও কাজ করতে সাহায্য করে। বারে বারে একই পদ্ধতিতে কাজ করার ফলে তাদের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ভুল-ভ্রান্তি হ্রাস পায়। এর সামগ্রিক ফল হল উচ্চমানের পণ্য বা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি।

(iv) ব্যয় হ্রাস (Reduces Cost) : একটি কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা কর্মীদের কম সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করে, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে ও ভুল-ভ্রান্তি কমায়। এর ফলে যেমন সম্পদের অপচয় হয় না, সাথে সাথে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এর সামগ্রিক ফল হল কারবারের ব্যয় হ্রাস।

কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া প্রণয়নের নীতিসমূহ (Principles for designing business processes) : একটি উদ্যোগ বা কারবার গড়ে ওঠে মুনাফার উদ্দেশ্যে। মুনাফা অর্জন করার জন্য কারবারকে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে হয়। এই কাজের ফলেই উদ্যোগ পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হয় এবং পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের ফলে মুনাফার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ যদি পণ্য বা সেবা উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে বেশিদামে বিক্রয় হয়। বর্তমানে বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যায় ফলে পণ্য বিক্রয় সহজ হয় না। কারণ প্রত্যেক প্রতিযোগীই তাদের পণ্য নিয়ে বাজারে উপস্থিত হয় এবং তাদের পণ্য বিক্রয় করতে চায়। এমতাবস্থায় সেই উৎপাদকের পণ্য বা সেবা বিক্রয় হয় যাদের দাম কম এবং গুণগত মান ভালো। একেই প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বলে। তাই কোনো কারবারকে এই সুবিধা পেতে হলে তাকে অবশ্যই কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা

বা খসড়া তৈরি করে সেই অনুযায়ী উৎপাদন প্রক্রিয়া চালাতে হবে। অন্যথায় এই সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়। সে কারণে বর্তমানে যে কোনো সংগঠিত কারবারই কর্ম প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে অনেক বিচার-বিবেচনা করে যাতে উৎপাদন ব্যয় ন্যূনতম করা সম্ভব হয়। একটি ভালো কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা তৈরির জন্য কতকগুলি নীতি মেনে চলতে হয়। নীচে এদের একটি তালিকা তুলে ধরা হল—

কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা প্রণয়নের নীতিসমূহ

(i) উদ্দেশ্যের নীতি (Principle of purpose)

(ii) সারল্যের নীতি (Principle of Simplicity)

(iii) যৌথ বোঝাপড়ার নীতি (Principle of joint understanding)

(iv) ধারাবাহিকতার নীতি (Principle of continuity)

(v) সম্পাদনযোগ্যতার নীতি (Principle of enablement)

(vi) যোগদানের নীতি (Principle of involvement)

(vii) নমনীয়তা নীতি (Principle of flexibility)

নীচে এগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(i) উদ্দেশ্যের নীতি (Principle of Purpose) : একটি নতুন স্থাপিত উদ্যোগ বা কারবার স্থাপনের পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য হল ক্রেতাদের ন্যায্য মূল্যে উৎকৃষ্ট পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা। আর এর জন্য প্রয়োজন উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করা। আর তাই নতুন উদ্যোগের কর্ম প্রক্রিয়া নক্‌শা বা রূপরেখা তৈরি করার প্রয়োজন হয়। কারণ পূর্ব পরিকল্পিত কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়া কেবলমাত্র উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে না, সাথে সাথে অপচয় রোধ করে ও ব্যয় হ্রাস করে। সুতরাং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা যা কর্ম সম্পদন প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য তা অর্জন করা সম্ভব হয়। উদ্দেশ্যের নীতি অনুসারে কারবারের কর্ম প্রক্রিয়া এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে কারবারের উদ্দেশ্যসাধন সহজ হয়।

(ii) সারল্যের নীতি (Principle of Simplicity) : কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া যেন সহজবোধ্য, সরল ও দক্ষ হয়। কারণ জটিল কর্ম প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় এবং কারবারের উদ্দেশ্যপূরণ সহজ হয় না। অন্যদিকে একটি সরল কর্ম প্রক্রিয়া সাধারণ মানের কর্মীরাও সহজে বুঝতে পারে, তাদের করণীয় কাজ সহজেই সম্পাদন করতে পারে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সারল্যের নীতি এও দাবি করে যে কারবারে কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া যেন কাজের স্বাভাবিক প্রবাহকে (work flow) কোনোভাবেই বিঘ্নিত না করে।

(iii) যৌথ বোঝাপড়ার নীতি (Principle of Joint understanding) : উদ্যোগ বা কারবারের কর্ম প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধাপে সম্পন্ন হয়। আবার বিভিন্ন ধাপে কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন কর্মীর উপর বর্তায়। কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়া যত দীর্ঘ হয় কর্মীর সংখ্যাও তত বেশি হয়। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন

ধাপের কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় অর্থাৎ যৌথ বোঝাপড়া আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে। অন্যথায় এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে কর্মীদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবে কাজ পন্ড হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কাজেই প্রতিটি কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ায় যৌথ বোঝাপড়ার নীতি থাকা আবশ্যক। এই নীতি কর্ম প্রক্রিয়ায় কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

(iv) ধারাবাহিকতার নীতি (Principle of Continuity) : এই নীতি অনুযায়ী উদ্যোগ বা কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া যেন ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হয়। বস্তুত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাজটি সম্পাদনের জন্য একাধিক ধাপ অতিক্রম করতে হয় ও বারে বারে এই পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার নীতি অনুযায়ী পণ্য বা সেবার উৎপাদন পদ্ধতি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ধারাবাহিকতার নীতি প্রক্রিয়ার মধ্যে না থাকলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং কারবার বা উদ্যোগের উদ্দেশ্য সফল হয় না। কাজেই প্রক্রিয়ার মধ্যে ধারাবাহিকতার নীতি অবশ্য থাকা দরকার।

(v) সম্পাদনযোগ্যতার নীতি (Principle of Enablement) : ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি নীতি সর্বজনীনভাবে অনুসৃত হয় এবং সেটি হল সঠিক কাজের জন্য সঠিক কর্মীকে সঠিক সময়ে দায়িত্ব দিতে হয়। সম্পাদনযোগ্যতার নীতি অনুসারে কারবার বা উদ্যোগের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া এমন হবে যাতে কর্মসম্পাদনে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। যে কর্মীর উপর প্রক্রিয়ার কোনো ধাপের কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয় সে যেন কাজটি বুঝতে পারে এবং তার কাজটি করার যোগ্যতা থাকে। এককথায় কর্মী যেন কাজের উপযুক্ত হয় এবং কাজ সম্পাদনের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি দরকার সেগুলি যেন সরবরাহ করা হয়। একজন চিকিৎসক সার্জন বা শল্য বিশারদ না হলে যেমন জটিল অপারেশন করতে পারেন না, তেমনি কর্মদক্ষতা না থাকলে কাজ সম্পাদন করাও সম্ভব হয় না।

(vi) যোগদানের নীতি (Principle of Involvement) : কর্মীরা মানবিকভাবে কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হতে না পারলে বা স্বেচ্ছায় কাজে ব্রতী না হলে সঠিকভাবে কাজ সম্পাদিত হয় না। যোগদানের নীতি কর্মীর সাথে কাজের অভিযোজনের কথা বলে। উদ্যোগের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কর্মীদের অংশগ্রহণের নীতিই হল যোগদানের নীতি।

(vii) নমনীয়তার নীতি (Principle of Flexibility) : কারবার বা উদ্যোগের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। এবং প্রক্রিয়ার এই ধাপগুলি পৌনঃপুনিক অর্থাৎ বারে বারে অনুসৃত হয়। উদ্যোগ বা কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া একবার চূড়ান্ত হয়ে গেলে তা সাধারণত স্থির থাকে। কেবলমাত্র বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তন হলে কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার মধ্যেও কাজে পরিবর্তন আনতে হয়। যেমন, প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে যদি উন্নত মানের মেশিনপত্রের উদ্ভাবন হয় তাহলে কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটাতে হয় যাতে উন্নত প্রযুক্তির মেশিনপত্র ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এর ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, অপচয়

কম হয়, ব্যয় হ্রাস পায় ও মুনাফাযোগতা বৃদ্ধি পায়। একেই নমনীয়তার নীতি বলে। অর্থাৎ কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার আরও উন্নয়নের স্বার্থে প্রক্রিয়ার পরিবর্তন করাই বাস্তবোচিত।

উপরোক্ত নীতিগুলি মেনে চললে কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া উন্নত, দক্ষ ও উদ্দেশ্য সহায়ক হয়ে ওঠে। এর ফলে কারবারি বা উদ্যোক্তার প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং কৌশলগত ব্যবসায়িক প্রয়োজন পূরণও বাস্তব হয়।

4.6 নতুন উদ্যোগ বা কারবারের অবস্থান

উদ্যোক্তার কারবারি ধারণা সম্ভাবনাময় হলে পরবর্তী ধাপে তাকে কারবার গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত জায়গা চিহ্নিত করতে হয়। উদ্যোগের আকৃতি, প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ সম্প্রসারনের বিষয়গুলি বিবেচনা করে কারবারের সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কারণ উৎপাদনী সংস্থার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ জায়গা প্রয়োজন হয় একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে আনুপাতিক কম জায়গা লাগে। আবার কারবারের অবস্থান যে বাড়িতে হবে সেটি তৈরি করা হবে নাকি ভাড়ায় নেওয়া হবে সে-ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এছাড়াও কারবারের প্রকৃতি অনুযায়ী কারবারটি কোনো বাজার এলাকায় অবস্থিত হবে নাকি দূরবর্তী এলাকায় অবস্থিত হবে তাও আগাম স্থির করতে হয়।

নতুন উদ্যোগটি উৎপাদনী শিল্প সংস্থা হিসাবে গড়ে উঠলে **ওয়েবারের** শিল্পস্থানিকতার তত্ত্বে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই উদ্যোগটির অবস্থান ঠিক করা বাঞ্ছনীয়। এই তত্ত্ব অনুসারে নতুন শিল্পসংস্থাটি কাঁচামালের উৎসের কাছাকাছি হতে পারে বা বাজার এলাকায় অবস্থিত বা এদের মধ্যবর্তী কোনে জায়গায় অবস্থিত হতে পারে। ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণত কারখানা বা উৎপাদনস্থল কাঁচামালের কাছাকাছি অবস্থিত হলে পরিবহন ব্যয় কম হয় এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। অন্যদিকে তুলোর মতো হাল্কা কাঁচামালের উপর উৎপাদন নির্ভরশীল উদ্যোগটি বাজারের কাছেও গড়ে উঠতে পারে কারণ এক্ষেত্রে পরিবহন ব্যয় বেশি পড়ে না। কিন্তু কাঁচামাল ছাড়াও অন্যান্য কিছু বিষয়ও যেমন শক্তির উৎস, জল, নিরাপত্তাজনিত আইন-শৃঙ্খলা, শ্রমিক ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়ও উদ্যোগের অবস্থানকে প্রভাবিত করে। এরূপ ক্ষেত্রে মাঝামাঝি কোনো জায়গাও নির্বাচন করা যায় যদি অন্যান্য বিষয়গুলি সহজলভ্য হয়। আবার সেবা উদ্যোগের ক্ষেত্রে এমন জায়গায় উদ্যোগ স্থাপন হওয়া উচিত যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা উচ্চমানের এবং ক্রেতা সহজেই উদ্যোগে আসা-যাওয়া করতে পারে। এছাড়াও উদ্যোগের অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, ইন্টারনেট পরিষেবা ইত্যাদির সুবিধা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং নতুন সেবা উদ্যোগ এসব জায়গার কাছাকাছি স্থাপিত হলে সুবিধা হয়।

বস্তুত উদ্যোগ বা কারবারের অবস্থানও পণ্য, কর্মী ও সেবা বিপণনের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারবারের সাফল্য অনেকাংশই কারবারের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। মূল বিষয় হল যে উদ্যোগের

অবস্থান এমন হবে যাতে প্রয়োজনীয় সুবিধা সহজেই পাওয়া যায় এবং ক্রেতা, কর্মী ও অন্যান্যরা সহজেই উদ্যোগের জায়গায় পৌঁছাতে পারে। এছাড়াও উদ্যোগের অবস্থানটি বড়ো রাস্তার কাছাকাছি হলে এবং রাস্তা থেকে যদি দেখা যায় তাহলে ভালো হয় কারণ এর মাধ্যমে উদ্যোগের পরিচিতি বাড়ে এবং বিজ্ঞাপনের সুবিধা পাওয়া যায়। তবে এরূপ জায়গা নির্বাচন করার সময় আর্থিক দিকটিও লক্ষ করতে হয়। তবে নতুন উদ্যোগের শোরুম থাকলে অবশ্যই তা প্রধান রাস্তা অথবা খুব সহজে পৌঁছানো যাবে এমন কোনো রাস্তার উপর হলে ভালো হয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে নতুন কারবার বা উদ্যোগের অবস্থান কারবারের সাফল্যকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ কারবারের সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় যদি কারবারটি একটি ভালো জায়গায় অবস্থিত হয়। অন্যদিকে কারবারটি যদি এমন জায়গায় অবস্থিত হয় যা কারবারের পক্ষে অনুপযোগী তাহলে কারবারের সাফল্যের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। সেজন্যই বলা হয় কারবারের সাফল্য যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কারবারের অবস্থান। কারবারের অবস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল যে কারবারটি এমন জায়গায় অবস্থিত হবে যাতে সর্বাধিক ক্রেতার সমাগম ঘটে। কারবারের অবস্থানের তাৎপর্য হল যাতে কারবারের জায়গা আবেদনমূলক (appealing) হয় এবং সবধরনের যানবাহন সহজেই ওই জায়গায় পৌঁছাতে পারে। অর্থাৎ জায়গাটির অবস্থানগত সুবিধা যেন পাওয়া যায়।

উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও কারবারের অবস্থানকে অনেকক্ষেত্রেই প্রভাবিত করে কর-সুবিধা। উদাহরণস্বরূপ কোনো নতুন উপাদান উদ্যোগ যদি কোনো **বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে** (SEZ) বা প্রযুক্তি উন্নয়ন পার্ক (TDP) বা অফশোর এলাকায় (Offshore Site) অবস্থিত হয় এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (Export process Zone), উৎপাদন করে তাহলে তারা বিশেষ কর-ছাড় ও অন্যান্য সরকারি সুবিধা পায়। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য নতুন উদ্যোগ এসব জায়গায় স্থাপিত হয়। কর-ছাড়, ভর্তুকি, উৎসাহ ভাতা ইত্যাদি ফলে নতুন উদ্যোগের আর্থিক সুবিধা হয় এবং তার আর্থিক প্রবাহের উপর ধনাত্মক প্রভাব পড়ে।

4.6.1 উদ্যোগের অবস্থান নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে উদ্যোগটি কোথায় গড়ে উঠবে। কারণ সঠিক জায়গায় উদ্যোগটি গড়ে না উঠলে তার সাফল্য পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অবশ্য অনেক উদ্যোক্তাই এই মত পোষণ করেন যে উদ্যোগের উৎপাদিত পণ্য বা সেবা সঠিক মানের হলে উদ্যোগের অবস্থান বিশেষ প্রভাব ফেলে না। আবার অনেক নতুন উদ্যোক্তা তাদের ব্যবসা শুরু করার সময় ব্যয় সংকোচ করার জন্য সস্তা জায়গায় কারবার স্থাপন করেন। কারবারের জন্য একটি ভালো জায়গা পাওয়া এবং ভালো জায়গায় কারবারের অবস্থান কারবারের সাফল্যের পিছনে কতটা অবদান রাখে তার মূল্যায়ন করা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু একটি ভালো জায়গায় কারবার অবস্থিত হলে কারবারের সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা

বৃদ্ধি পায়। একটি নতুন কারবারি সংস্থার অবস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক বলে গণ্য হয় সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল।

নতুন কারবারের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

(i) কাঁচামালের প্রাপ্যতা
(ii) বাজারের নৈকট্য
(iii) শ্রমিকের লভ্যতা
(iv) পরিকাঠামোগত সুবিধা
(v) সরকারি নীতি
(vi) স্থানীয় কর, আইন ও বিধিনিয়ম
(vii) বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ
(viii) জলবায়ুর অবস্থা
(ix) রাজনৈতিক অবস্থা

নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল—

(i) কাঁচামালের প্রাপ্যতা বা সহজলভ্যতা (Availability of raw Materials) : নতুন নতুন শিল্প সংস্থার অবস্থান নির্ধারণে কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও প্রাপ্যতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ শিল্প সংস্থার উৎপাদন কাঁচামাল নির্ভর। কাঁচামালের উৎস থেকে কারবারের জায়গা দূরে হলে পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফা প্রভাবিত হয়। সুতরাং কারবারের স্থান কাঁচামালের উৎসের কাছাকাছি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(ii) বাজারের নৈকট্য (Nearness to Market) : নতুন কারবারের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হল বাজারের নৈকট্য। কারণ উৎপাদিত পণ্য বা সেবার ক্রেতারাই বাজার গড়ে তোলে। অন্যভাবে বলা যায় কারবারের ক্রেতাদের কাছাকাছি জায়গায় কারবারটি স্থাপিত হলে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় কারণ ক্রেতারা পণ্যের কাছে পৌঁছাতে পারে। অর্থাৎ তাদের পণ্য পাওয়া সহজ হয়, যা বিক্রয়কে প্রভাবিত করে।

(iii) শ্রমিকদের লভ্যতা (Availability of Labour) : একটি উৎপাদনী সংস্থার উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে চালানোর জন্য দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। যে জায়গায় কারবার স্থাপিত হয়, স্থানীয় ভিত্তিতে যদি দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায় তাহলে উৎপাদন ব্যাহত হয় না এবং শ্রম-ব্যয়ও বেশি হয় না। কাজেই শ্রমনিবিড় উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে শ্রমিক বা কর্মী লভ্যতাও স্থান নির্বাচনকে প্রভাবিত করে।

(iv) পরিকাঠামোগত সুবিধা (Infrastructural Facilities) : যদিও কারবার থেকে কারবারে পরিকাঠামোগত সুবিধার প্রয়োজন সমান নয় তথাপি এটি বাস্তব যে পরিকাঠামোগত সুবিধার উপস্থিতি একটি কারবারের স্থান নির্বাচনের সিদ্ধান্তকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। এই পরিকাঠামোগত সুবিধার মধ্যে পড়ে বিদ্যুৎ বা শক্তি, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, জল, ব্যাংকিং ও আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা ইত্যাদি।

(v) সরকারি নীতি (Government Policy) : অনেক সময়ই সরকার আঞ্চলিক উন্নয়নে ভারসাম্য আনার জন্য পশ্চাৎপদ এলাকায় নতুন উদ্যোগ স্থাপনকে উৎসাহ দেয়। এসব এলাকায় উদ্যোগ স্থাপন করলে সরকার বিভিন্ন উৎসাহমূলক ব্যবস্থা যেমন কর ছুট, ছাড়, কম দামে বিদ্যুৎ, কারবারের শেড তৈরিতে ভর্তুকি ইত্যাদি দিয়ে থাকে যাতে উদ্যোক্তারা আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সরকারের উদ্দেশ্য হল এসব পশ্চাৎপদ এলাকায় উদ্যোগ স্থাপনের মাধ্যমে এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো। কাজেই সরকারি নীতিও নতুন উদ্যোগের স্থান নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(vi) স্থানীয় কর, আইন ও নিয়মকানুন (Local Tax, Laws and Regulations) : দেশের আইনও অনেক সময় নতুন কারবার স্থাপনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, পরিবেশ দূষণ করে এধরনের কারবার সর্বত্র স্থাপন করা যায় না, বিশেষত যেসব জায়গায় দূষণের মাত্রা অনেক বেশি—বায়ু দূষণ (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন 1981 হল এ-ধরনের একটি আইন। এই আইন অনুসারে খুব বেশি জনঘনত্ব সম্পন্ন এলাকায় দূষণ ছড়ায় এ ধরনের কারবার স্থাপন করা যায় না। অনুরূপভাবে আয়কর আইন অনুসারে কতকগুলি বিশেষ অঞ্চলে উদ্যোগ স্থাপন করলে কর-ছুট পাওয়া যায়। অন্যদিকে অন্যত্র কারবার স্থাপন করলে উচ্চ-হারে কর দিতে হয় কাজেই উদ্যোগের স্থান নির্বাচন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

(vii) বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ (Ecology and Environment) : কিছু শিল্পোদ্যোগের অবস্থানের জায়গা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশের বিষয়গুলিও বিবেচনা করতে হয়। কারণ সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোগের ফলে যদি ওই এলাকার বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হয় বা বায়ু দূষণ, জল দূষণ-এর মাত্রা বৃদ্ধি পায় তাহলে আইনগত বাধা যেমন থাকতে পারে তেমনি বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশনের জন্যও উৎপাদন ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। কাজেই প্রস্তাবিত উদ্যোগটি ওই এলাকায় অবস্থিত হতে পারে না।

(viii) জলবায়ুর অবস্থা (Climatic Condition) : দেশের বিভিন্ন জায়গায় জলবায়ুর তারতম্য একটি স্বাভাবিক ঘটনা। মহাদেশীয় অবস্থানের ক্ষেত্রে একটি দেশের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন হয়। আবার মরু অঞ্চলে উষ্ণতা চরম হয়, অন্যদিকে মরু অঞ্চলে শীতল জলবায়ু দেখা যায়। উদ্যোগের অবস্থাগত জলবায়ুও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে এবং যেকোনো জলবায়ুতে যেকোনো শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। যেমন তুলো থেকে সুতো তৈরির কারখানা সেই জায়গাতেই স্থাপিত হতে পারে যেখানে জলবায়ু আর্দ্রতাযুক্ত। আবার জলবায়ু মানুষের কর্মক্ষমতার উপরও প্রভাব বিস্তার করে। ঠান্ডা জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলের মানুষের কর্মক্ষমতা বেশি কাজেই উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে পাট শিল্পের ক্ষেত্রেও বায়ুমন্ডলের আর্দ্রতা অনেক বেশি থাকা দরকার। অন্যদিকে ঘড়ি তৈরির কারখানা ঠান্ডা জায়গায় অবস্থিত হলে ভালো হয়। একারণেই এ ধরনের উদ্যোগ জম্মু-কাশ্মীর ও হিমাচলপ্রদেশে স্থাপিত হলে সুবিধা হয়। কাজেই নতুন উদ্যোগ স্থাপনের জায়গা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওই এলাকার জলবায়ুর বিষয়টিও বিবেচনা করতে হয়।

(ix) রাজনৈতিক অবস্থা (Political Condition) : দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিরতা থাকা দরকার। রাজনৈতিক অস্থিরতা শিল্পোন্নয়নের উদ্যোগ স্থাপনের অন্তরায় হিসাবে গণ্য হয়। রাজনৈতিক অবস্থা সুস্থিত হলে উদ্যোগ গ্রহণে অনেকেই এগিয়ে আসে এবং উদ্যোক্তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা তাদের আত্মবিশ্বাস ও আস্থা কমিয়ে দেয়। অনেক সময় দেখা যায় নতুন উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে ভূমিপুত্রের (Son of the Soil) স্বার্থরক্ষার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এর ফলে উদ্যোগ গ্রহণ বিঘ্নিত হয়। এছাড়াও কোনো জায়গায় রাজনৈতিক অবস্থার উপর সেই জায়গার শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা নির্ভর করে। কাজেই কোনো এলাকা শান্তি ও উদ্যোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা বা পরিকাঠামো না থাকলে সেই জায়গায় উদ্যোগ স্থাপন করা যায় না। কাজেই দেশের বা এলাকার রাজনৈতিক অবস্থাও একটি নতুন উদ্যোগের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

1910 সালে খঙ্কা (Khanka) একটি সমীক্ষায় একটি নতুন উদ্যোগ বা কারবার স্থাপনের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলি একটি তালিকা করেছিলেন। নীচে এই তালিকাটি তুলে ধরা হল—

উদ্যোগের অবস্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

1. গুণগত বিষয়সমূহ (Qualitative Factors)			**33.69%**
(i)	কম শ্রম ব্যয়	—	10.32%
(ii)	দক্ষ শ্রমিকের উপস্থিতি	—	28.67%
(iii)	কম দামে জমির লভ্যতা	—	21.%
(iv)	মৌলিক পরিকাঠামোগত সুবিধার উপস্থিতি	—	55.38%
(v)	কাঁচামালের সহজলভ্যতা	—	40.62%
(vi)	আর্থিক সেবা পাওয়ার সম্ভাবনা	—	31.93%
(vii)	জলবায়ু ও পরিবেশের অবস্থা	—	18.56%
(viii)	অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা	—	32.76%
(ix)	উচ্চ জন ঘনত্বসম্পন্ন এলাকায় নৈকট্য	—	38.39%
(x)	এলাকা ক্রেতা/ভোক্তার আধিক্য	—	63.43%
(xi)	এলাকার প্রতিযোগীদের সংখ্যা	—	29.56%
2. মনোগত বিষয়সমূহ (Subjective Factors)			**65.60%**
(xii)	উদ্যোক্তার বাসস্থান থেকে দূরত্ব	—	69.62%
(xiii)	উদ্যোক্তার বাসস্থান সন্নিহিত এলাকা	—	61.58%
3. নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়সমূহ (Regulative Factors)			**12.30%**
(xiv)	উৎসাহ, ছাড় ও অনুদানের সুযোগ	—	9.38%
(xv)	কর-ছাড় ও অন্যান্য উৎসাহ ভাতা	—	8.94%
(xvi)	শ্রম ও শিল্প আইন	—	11.23%
(xvii)	প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি	—	19.68%

4.7 নতুন উদ্যোগের সজ্জা

নতুন উদ্যোগের সজ্জা বলতে বোঝায় নতুন উদ্যোগ বা কারবার যতটা জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠে তার উদ্দেশ্যমূলক বিভাজন বা সাজানো। একটি শিল্পোদ্যোগের কারখানার সজ্জা বলতে বোঝায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কাজের জায়গা ও মজুতাগার ইত্যাদির অবস্থানজনিত বিষয়। এর উদ্দেশ্য হল কাজের প্রবাহ বা উৎপাদন প্রবাহ যাতে বিনাবাধায় চলতে পারে। নতুন উদ্যোগের সজ্জার পিছনে প্রধান কারণ হল যে প্রয়োজনীয় মালপত্র যাতে সহজেই পাওয়া যায় এবং কর্মীদের বেশি হাঁটাহাটি করতে না হয়। একটি প্রক্রিয়াকরণ সংস্থায় প্রয়োজনীয় মেশিনপত্র পরপর এমনভাবে সাজানো হয় যাতে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। অর্থাৎ এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল কর্মপ্রবাহ সচল রাখা ও কোনো বাধার সৃষ্টি যাতে না হয় এবং সময়ের অপচয় না হয়। নতুন উদ্যোগ ঠিকমতো সাজানো হলে উৎপাদন প্রক্রিয়া অনেক সাবলীল ও গতিশীল হয় এবং উৎপাদন ব্যয় সঠিক মাত্রায় থাকে। বস্তুত নতুন উদ্যোগের সাজসজ্জা বলতে বোঝায় উদ্যোগের কাজকর্ম যদি সঠিকভাবে সম্পাদিত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও উপকরণগুলিকে সঠিকভাবে স্থাপন করা যাতে সেগুলি সংগ্রহ করার জন্য অহেতুক চলাফেরা করতে না হয়, সময় সংক্ষেপ হয় এবং কাজের প্রবাহ যাতে কোনোভাবেই শ্লথ না হয়ে পড়ে। উৎপাদনী সংস্থার ক্ষেত্রে একে কারখানার সাজ-সজ্জা বলা হয়।

উদ্দেশ্য বা সুবিধাসমূহ (Objective/Advantages) : একটি নতুন উদ্যোগ বা শিল্প উদ্যোগের ক্ষেত্রে কারখানার সাজসজ্জার উদ্দেশ্য বা সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) সমগ্র কারখানার কর্মপ্রবাহের মধ্যে সংহতি সাধন করা সম্ভব হয়।

(ii) মালপত্র তোলা-নামানোর ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রচেষ্টার প্রয়োগ ঘটে।

(iii) উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়।

(iv) বিভিন্ন ব্যবস্থার এবং সাথে সাথে কার্যকলাপের নমনীয়তা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

(v) সংস্থার কর্মীদের, আসবাবপত্রের, যন্ত্রপাতির এবং স্থানের কার্যকর ব্যবহার সম্ভব হয়।

(vi) কাঁচামালের ব্যবহারের ক্ষেত্রে উচ্চ টার্নওভার অর্জন করা সম্ভব হয়।

(vii) এরফলে কর্মচারীদের মনোবল বৃদ্ধি পায়।

(viii) কর্মীদের স্বাস্থের উপর অনিষ্ট করে এরূপ উপাদান হ্রাস পায়।

(ix) বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমাণ কম রাখা সম্ভব হয়।

নীতিসমূহ (Principles of Layout) : উদ্যোগ বা কারবারের অভ্যন্তরীণ সজ্জা কীভাবে করলে উদ্যোগের উদ্দেশ্যপূরণ সহজ হয় সে সংক্রান্ত নীতিসমূহ হল নিম্নরূপ :

(i) ন্যূনতম চলাচলের নীতি (Principles of minimum movement) : কাঁচামাল ও শ্রমিকদের চলাচল স্বল্প দূরত্বের মধ্যে যাতে হয় সেভাবেই উৎপাদনের উপাদানগুলিকে সাজাতে হবে। এর ফলে পরিবহন ব্যয় ও কাঁচামাল তোলা-নামার ব্যয় হ্রাস পায়।

(ii) স্থান ব্যবহারের নীতি (Principle of space utilization) : উদ্যোগ যে জায়গায় অবস্থিত হয় তার সম্পূর্ণ অংশই কার্যকরভাবে উল্লম্ব ও সমান্তরালভাবে ব্যবহার করতে হবে। অব্যবহৃত স্থান যাতে না থাকে তা দেখতে হবে।

(iii) নমনীয়তার নীতি (Principle of flexibility) : স্থানের বণ্টন বা সাজ নমনীয় হতে হবে যাতে ভবিষ্যতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলে যেন করা যায়।

(iv) পারস্পরিক নির্ভরতার নীতি (Principle of interdependance) : যে সব কাজ বা কর্মপ্রক্রিয়া পরস্পরের উপর নির্ভরশীল সেগুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি রাখতে হবে। এর ফলে পণ্য স্তরের হ্রাস ঘটে।

(v) সার্বিক সংহতির নীতি (Principle of over all integration) : কারখানার সমস্ত সুবিধা ও সেবাগুলি একটি কার্যনির্বাহী বিভাগের মধ্যে রাখতে হবে যাতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

(vi) নিরাপত্তার নীতি (Principle of Safety) : লে-আউট নক্শার মধ্যে কর্মীদের আরাম (comfort) ও নিরাপত্তা বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে।

(vii) সাবলীল প্রবাহের নীতি (Principle of smooth flow) : এই নীতি অনুযায়ী উদ্যোগের অভ্যন্তরীণ সজ্জা যেন এমন হয় যাতে কর্মপ্রবাহ কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং কর্মপ্রবাহ সাবলীলভাবে চলতে পারে।

(viii) ব্যয় সংকোচের নীতি (Principle of economy) : অভ্যন্তরীণ সজ্জার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল যাতে স্থায়ী সম্পদে লগ্নির ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাস ঘটে।

(ix) সন্তুষ্টির নীতি (Principle of satisfaction) : উদ্যোগের অভ্যন্তরীণ সজ্জা এমন হওয়া উচিত যাতে তা কর্মীদের পছন্দ হয় ও তারা সন্তুষ্ট হয়। এর ফলে কর্মী মনোবল বৃদ্ধি পায়।

(x) পরিদর্শনের নীতি (Principle of supervision) : এই নীতি অনুসারে উদ্যোগের অভ্যন্তরীণ সাজ এরূপ হবে যাতে পরিদর্শকরা কাজ পরিদর্শনের সময় অসুবিধার মধ্যে না পড়ে। অর্থাৎ একটি আদর্শ অভ্যন্তরীণ সজ্জা কর্ম পরিদর্শনকে সহজ করে।

4.7.1 উদ্যোগের অভ্যন্তরীণ সজ্জার ধরন

উৎপাদনী সংস্থার দুটি মৌলিক অভ্যন্তরীণ সজ্জা হল—**পণ্য সজ্জা** ও **প্রক্রিয়া সজ্জা**। আবার অনেক সংস্থায় এই দুই ধরনের সজ্জাকে সংযুক্ত করে সমবায় সজ্জা ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও উৎপাদনী সংস্থায় **স্থির অবস্থা সজ্জা** (fixed position layout) দেখতে পাওয়া যায়। নীচের রেখাচিত্রে উদ্যোগের অভ্যন্তরীণ সজ্জার ধারণাগুলি তুলে ধরা হল।

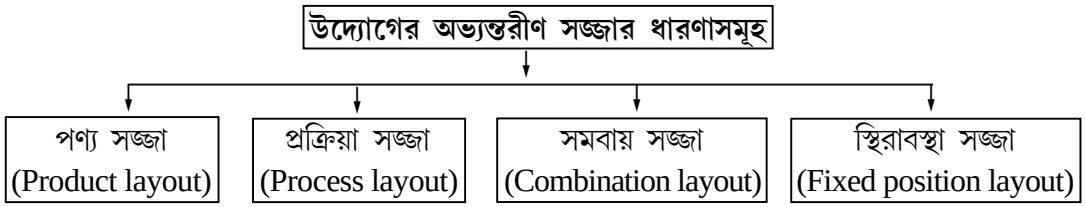

নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল—

1. পণ্য সজ্জা (Product layout) : এ ধরনের অভ্যন্তরীণ সজ্জায় পণ্য উৎপাদনের যে সব মেশিনপত্রের দরকার তাদের ব্যবহারের ক্রমানুসারে স্থাপন বা সাজানো হয়। এটিকে **রৈখিক সজ্জাও** (Line layout) বলা হয়, কারণ মেশিনগুলিকে একটি সরলরেখায় স্থাপন করা হয়। প্রথম মেশিনে কাঁচামালের যোগান দেওয়া হয় এবং উৎপাদিত পণ্য শেষ মেশিন থেকে বেরিয়ে আসে। এ ধরনের লে-আউট বা সজ্জার ধরনটি হল নিম্নরূপ—

কাঁচামাল→ টার্নিং অপারেশন→ মিলিং অপারেশন→ ড্রিলিং অপারেশন→ অ্যাসেম্বলি→ পণ্য

পণ্য সজ্জা যে সব ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী বলে গণ্য হয় সেগুলি হল—

(i) যেক্ষেত্রে এক বা একাধিক সমমানের পণ্য উৎপাদিত হয়।

(ii) যেক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বেশি পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হয়।

(iii) যেক্ষেত্রে কাজের সময় ও গতি সমীক্ষা করা হয় যাতে কাজের মজুরির হার নির্ধারণ করা যায়।

(iv) যেক্ষেত্রে শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির মধ্যে ভারসাম্য থাকে।

(v) যেক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়া চলাকালীন ন্যূনতম পরিদর্শন চালালেই কাজ হয়ে যায়।

2. প্রক্রিয়া সজ্জা (Process layout) : এধরনের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে **কার্যভিত্তিক সজ্জা** (Functional layout) নামেও অভিহিত করা হয়। প্রক্রিয়া নির্ভর এরূপ অভ্যন্তরীণ সজ্জার ক্ষেত্রে একই ধরনের মেশিনগুলি একটি জায়গায় সন্নিবেশিত করা হয়। যেমন সমস্ত লেদ মেশিন এক জায়গায় ও মিলিং মেশিনগুলি অন্য এক জায়গায় স্থাপন করা হয়। নীচের এ ধরনের অভ্যন্তরীণ সজ্জার একটি চিত্র তুলে ধরা হল।

<table>
<tr><td rowspan="2">লেদ মেশিনসমূহ</td><td rowspan="2">মিলিং মেশিনসমূহ</td><td colspan="2">একত্রীকরণ (Assembly)</td></tr>
<tr><td>গ্রহণ ও বাহির
↑ ↓</td><td>পেন্টিং</td></tr>
</table>

যে সব ক্ষেত্রে এ ধরনের অভ্যন্তরীণ সজ্জা উপযোগী হিসাবে গণ্য হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ—

(i) যেক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যগুলি সমমানের নয়। অর্থাৎ ক্রেতাদের বিশেষ ফরমাশ অনুসারে পণ্য উৎপাদিত হয়।

(ii) যেক্ষেত্রে শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির মধ্যে ভালো ভারসাম্য বজায় রাখা যায় না।

(iii) যে সব সংস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ খুব বেশি নয়।

(iv) যে সব সংস্থার ক্ষেত্রে সময় ও গতি সমীক্ষা চালানো অসুবিধাজনক।

(v) যেক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শনের জন্য অনেক বেশি পরিদর্শকের প্রয়োজন হয়।

3. সমবায় সজ্জা (Combination layout) : কার্যক্ষেত্রে উৎপাদনী সংস্থার অভ্যন্তরীণ সজ্জার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পণ্য সজ্জা বা প্রক্রিয়া সজ্জা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। বাস্তব হল যে বেশিরভাগ সংস্থার ক্ষেত্রে এই দুই অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে মিলিয়ে একটি যৌথ বা সংযুক্ত বা সমবায় সজ্জা

অনুসৃত হয়। এর উদ্দেশ্য হল যাতে উভয় ধরনের সজ্জার সুবিধাগুলি পাওয়া সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, রেফ্রিজারেটর উৎপাদনী সংস্থার অভ্যন্তরীণ সজ্জা হল সমবায় সজ্জা।

প্রক্রিয়া সজ্জা সাধারণত ব্যবহৃত হয় যখন বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন হয় এবং সবশেষে একত্রীকরণ বিভাগে (Assembly) এসে চূড়ান্ত পণ্যে পরিণত হয়। এই একত্রীকরণের ক্ষেত্রে যে অভ্যন্তরীণ সজ্জা অনুসৃত হয় সেটি হল পণ্য সজ্জা। কাজেই যে সব পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং সর্বশেষে একত্রীকরণের মাধ্যমে পণ্য চূড়ান্ত রূপ পায় সেখানে সমবায় সজ্জা অনুসৃত হয়।

4. স্থির অবস্থামূলক সজ্জা (Fixed position layout) : এই ধরনের অভ্যন্তরীণ সজ্জা অনুসৃত হয় যেখানে উৎপাদিত পণ্যটি বিশাল আকৃতির হয়। সাধারণত জাহাজ তৈরি, রেলওয়ের ওয়াগান তৈরি, এরোপ্লেন তৈরির ক্ষেত্রে সমস্ত কাঁচামাল, মেশিনপত্র ইত্যাদি পণ্যের কাছে নিয়ে আসা হয়, কারণ পণ্যটিকে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর করা যায় না। এছাড়াও বড়ো বড়ো বিল্ডিং প্রজেক্ট, সেতু, নদীবাঁধ তৈরিতেও স্থির অবস্থানমূলক অভ্যন্তরীণ সজ্জা দেখতে পাওয়া যায়।

4.8 নতুন উদ্যোগের কার্যসম্পাদন

সংজ্ঞা (Definition) : একটি কারবারের মধ্যে যা কিছু ঘটে এবং যার দ্বারা কারবার সচল থাকে ও অর্থ উপার্জন করে এগুলিকেই সম্মিলিতভাবে কারবারি কার্যকলাপ বলে। কারবার পরিকল্পনায় একটি অংশ থাকে যাতে উদ্যোক্তারা কারবারের কর্মপদ্ধতি, যন্ত্রপাতি, কর্মী এবং প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে পারে যাতে কারবার তার কাজকর্ম সম্পন্ন করতে পারে।

কার্যকলাপ ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় একটি কারবারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং যে পদ্ধতিতে সে কাজ করে যাতে সর্বোচ্চ দক্ষতার স্তরে পৌঁছানো যায়। এর প্রধান কাজ হল কাঁচামাল ও শ্রমকে যতটা সম্ভব দক্ষতার সাথে পণ্য বা সেবায় রূপান্তর করা যাতে কারবারের মুনাফার সর্বাধিকীকরণ সম্ভব হয়। কারবারি কার্যসম্পাদন বলতে বোঝায় যে সব প্রক্রিয়ায় এবং যে সব সম্পদের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সর্বোত্তম গুণমানসম্পন্ন পণ্য বা সেবা কতটা সম্ভব দক্ষতার সাথে উৎপাদন করা যায়।

উপাদান (Elements) : কারবারি কার্য সম্পাদনের প্রধান উপাদান হল চারটি। এগুলি হল—

(i) অবস্থান (Location) : যেখান থেকে কারবারি কার্যকলাপ সম্পন্ন হয় তাকেই কারবারের বা উদ্যোগের অবস্থান বলা হয়। এটি কোনো ভৌত অবস্থান হতে পারে বা অনলাইনও হতে পারে।

(ii) যন্ত্রপাতি (Equipment) : কাজ সম্পাদনের পূর্বশর্তই হল প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেন সহজলভ্য হয়। কারণ এসবের সাহায্যেই কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

(iii) প্রক্রিয়া (Process) : প্রক্রিয়াকে কার্য সম্পাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয় কারণ প্রক্রিয়া উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। কারবারের কার্য

সম্পাদন প্রক্রিয়ার বিভাগীয় রিপোর্ট তৈরি করা বাঞ্ছনীয় যাতে ভবিষ্যতে কর্ম সম্পাদনে উন্নতি করা সম্ভব হয়।

(iv) কর্মী (Staffing) : একটি নতুন উদ্যোগ বা কারবারে কতজন কর্মীর প্রয়োজন তা সাধারণত কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাওয়া যায়। অথাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট কোনো কাজ কোন কর্মী করবে এবং এজন্য কতজন কর্মী লাগবে তা নির্ধারণ করা হয়। একটি ছোটো কারবারে কম সংখ্যক এবং সাধারণ মানের কর্মীর প্রয়োজন হলেও একটি বড়ো প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হয়।

4.9 নিয়ন্ত্রণ

একটি প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গড়ে ওঠে। আর ওই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাকে কিছু কাজ সম্পাদন করতে হয়। যেহেতু প্রতিষ্ঠান নিজে কাজগুলি সম্পাদন করতে পারে না, তাই তাকে কর্মী নিয়োগ করতে হয়। এই কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে।

এখন এই কাজ সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক ব্যয়ে সম্পাদন করতে হলে প্রতিটি কাজের পরিকল্পনা রচনা করতে হয় এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সংগঠন গড়ে তুলতে হয়। প্রতিষ্ঠানের সাংগঠিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের ভারাপর্ণ ঘটে। প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মী তার নিজ নিজ দায়িত্ব অনুযায়ী পরিকল্পনা অনুসারে সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সঠিক ব্যয়ে তার কাজ সম্পন্ন করবে—প্রতিষ্ঠান কর্মীর কাছে এই প্রত্যাশাই করে থাকে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই 'প্রত্যাশা' ও 'বাস্তব অবস্থার' মধ্যে ফারাক দেখা যায়। এই ফারাক যত বেশি হয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন ততই কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুত নিয়ন্ত্রণ হল পরিকল্পনা ও তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে যাতে কোনো বিচ্যুতি বা ফাঁক না থাকে তারই এক সুসংহত প্রচেষ্টা অর্থাৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পাদিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করার কাজই হল নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে 'প্রত্যাশিত ফল' ও 'প্রকৃত ফলের' তুলনা করা হয় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সনাক্ত করা হয়। এর সাথে ভবিষ্যতে যাতে ঐ ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার ব্যবস্থা করা হয়। আর এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াকেই বলে **নিয়ন্ত্রণ**।

সুতরাং নিয়ন্ত্রণ হল একটি মৌলিক ব্যবস্থাপনামূলক কাজ যা সাধারণ ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজকে অনুসরণ করে। পরিকল্পনা বা নির্দেশনার মতো নিয়ন্ত্রণও ব্যবস্থাপনার একটি ধারাবাহিক কাজ। এর উদ্দেশ্য হল পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলি যাতে সম্পাদিত হয় সে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের সবক্ষেত্রেই অর্থাৎ বস্তু, ব্যক্তি, কাজ, অর্থ, সময় ইত্যাদি সর্বত্রই প্রযোজ্য হয়।

নীতি ও পদ্ধতি হিসাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার একেবারে শুরু থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত হয়ে আসছে। কারণ ব্যবস্থাপকরা বরাবরই তাদের আদেশ ও পরিকল্পনার ফল জানতে বিশেষভাবে আগ্রহী হন। একটি বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা যায়। 'ভারতীয় রেলপথ' পরিবহনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে যুক্ত অসংখ্য রেলগাড়ি একই লাইনে কিন্তু

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাতায়াত করছে। এই রেলগাড়ির চালকদের গতিশক্তির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং তারা যেভাবে খুশি রেলগাড়ি চালাতে পারে। কিন্তু যদি তারা নিজের ইচ্ছামতো সেগুলিকে চালায় তাহলে রেল চলাচলে বিশৃঙ্খলা ঘটবে এবং দুর্ঘটনা ঘটাও কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয়। তাই তারা নিজের খেয়াল খুশিমতো রেলগাড়িটি চালাতে পারে না। বাস্তবে চালকদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় সিগন্যাল, গার্ড ও স্টেশন মাস্টার দ্বারা। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ হল সেই প্রক্রিয়া যা রেল চলাচলকে নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী ও ন্যূনতম বিচ্যুতির মাধ্যমে গতিশীল রাখে। একই ঘটনা একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল রাখতে এবং বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে বিচ্যুতি ন্যূনতম করাই হল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য।

4.9.1 নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ

ছোটো, বড়ো ও মাঝারি সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই কম বেশি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। প্রতিষ্ঠানে একটি সুষম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে না তুলতে পারলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন দুরূহ হয়ে পড়ে। একটি প্রতিষ্ঠানে যে সব উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ :

নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য

(i) কর্মসম্পাদনের ভুল-ত্রুটিগুলি সনাক্ত করা।

(ii) ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করা ও প্রতিরোধ করা।

(iii) পূর্ব নির্ধারিত মান অনুসারে কর্মসম্পাদনের জন্য নির্দেশদান

(iv) সঠিক সময়ে কার্য সম্পাদন

(v) সঠিক ব্যয়ে কার্য সম্পাদন

(vi) প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন

(i) কার্য সম্পাদনের ভুল-ত্রুটিগুলি সনাক্ত করা (To detect errors and defects in performance) : নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোনো কাজ পূর্বনিধারিত পরিকল্পনা অনুসারে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয় এবং যদি না হয়ে থাকে তাহলে কী কারণে হয়নি তা অনুসন্ধান করে সনাক্ত করা হয়। এর ফলে ভুল-ত্রুটির পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে না এবং কর্মসম্পাদনে দক্ষতা আসে।

(ii) ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করা ও প্রতিরোধ করা (To rectify and prevent the errors and defects) : নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উদ্দেশ্য হল কাজের ক্ষেত্রে দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করা এবং যে সব ভুল-ত্রুটি ঘটে সেগুলি সংশোধন করা, এছাড়াও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হল ভবিষ্যতে যাতে ভুল-ত্রুটির পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(iii) পূর্ব নির্ধারিত মান অনুসারে কর্মসম্পাদনের জন্য নির্দেশদান (To provide direction in conformity with the predetermined standard) : প্রতিষ্ঠানের কোনো কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে একটি পরিকল্পনা রচনা করা যায়। এই পরিকল্পনা কাজ সম্পাদন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশা। পরিকল্পনা কতকগুলি প্রমাণ মানের উপর গড়ে ওঠে। যেমন—কাজটি করতে কত সময় লাগবে, কত ব্যয় হবে, কী পরিমাণ উপাদানের প্রয়োজন হবে ইত্যাদি। যদি কোনো কাজ পূর্বনির্ধারিত মান অনুসারে সম্পাদিত না হয় তাহলে ব্যবস্থাপকরা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন যাতে পরিকল্পিত পথে কাজটির রূপায়ণ ঘটে।

(iv) সঠিক সময়ে কার্যসম্পাদন (Performance at right time) : ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক ব্যয়ে সম্পাদনের ব্যবস্থা করা। ব্যবস্থাপনার এই দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় বলে এটিও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়।

(v) সঠিক ব্যয়ে কার্যসম্পাদন (Performance of work at right time) : কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিষ্ঠান আশা করে ন্যূনতম প্রচেষ্টার দ্বারা ও ন্যূনতম ব্যয়ে কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থা করা। নিয়ন্ত্রণ এই উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে কাজ করে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় হ্রাসের বিষয়টিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

(vi) প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন (Attainment of organisational objectives) : নিয়ন্ত্রণ হল একটি ব্যবস্থাপনামূলক ধারাবাহিক কাজ। একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের কাজগুলির যথাযথ সম্পাদনের উপর। আর কাজগুলির যথাযথ সম্পাদন নির্ভর করে ব্যবস্থাপনার কর্ম-দক্ষতার উপর। পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় বা সংযোজন যেমন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় বলে গণ্য হয়, তেমনি নিয়ন্ত্রণও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বলা হয় যে নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন।

4.9.2 নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজগুলির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হল শেষ পর্যায়ের কাজ। নিয়ন্ত্রণ হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার শুরু হয় কোনো কাজের ক্ষেত্রে প্রমাণ মান স্থাপনের মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয় সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রে উদঘাটিত ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধনের মধ্য দিয়ে। নীচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত ধাপসমূহ তুলে ধরা হল :

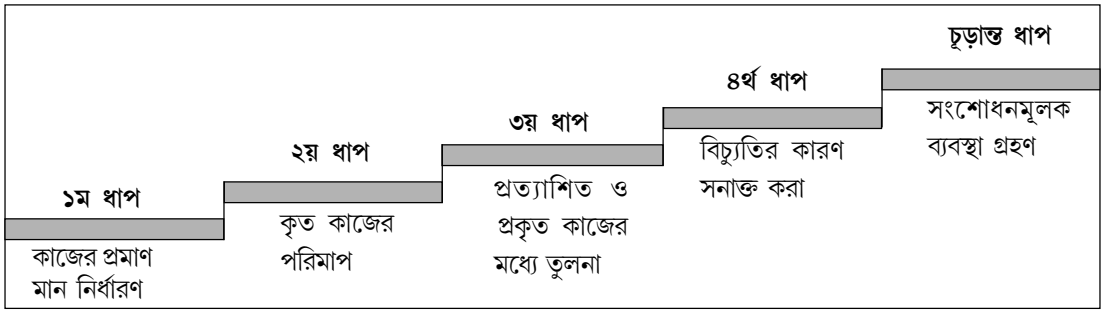

1. **কাজের প্রমাণ মান প্রতিষ্ঠা (Establishment of Standards) :** নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হল কাজের প্রমাণ মান নির্ধারণ যার সাথে তুলনা করে কত কাজের মূল্যায়ন করা হয়। এই মান বিভিন্ন কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে। এই মান আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন উৎপদানের পরিমাণ, শ্রম-ঘণ্টা ইত্যাদি হল ভৌতমান (Physical standard) আবার বিক্রয়, আয়, ব্যয় ইত্যাদি হল আর্থিক মান (Financial standard) ইত্যাদি। এই মানগুলি স্পর্শনীয়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সুনাম সংক্রান্ত প্রমাণ মান হল অস্পর্শনীয়।

   কোনো কাজের প্রমাণ মান ওই কাজের সম্পাদনজনিত প্রত্যাশাকে সূচিত করে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সংহতি রেখে ব্যবস্থাপকরা এই মান নির্ধারণ করেন এবং এই মান-ই নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। সেজন্য অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে এই মান নির্ধারণ করতে হয়। সাধারণত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রমাণ মানের আবশ্যিক শর্তগুলি হল নিম্নরূপ :

   (i) প্রমাণ মান অবশ্যই সরল ও সহজে বোধগম্য হবে।

   (ii) প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ মান যেন সঙ্গত পরিমাণ প্রচেষ্টা ও সময়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়।

   (iii) প্রমাণ মান অবশ্যই নমনীয় হবে অর্থাৎ প্রয়োজন পড়লে সেগুলি যাতে পরিবর্তিত করা যায়।

   (iv) বিজ্ঞানসম্মতভাবে গতি সমীক্ষা ও সময় সমীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ মান স্থির করতে হবে।

   (v) পরিমাপের সুবিধার জন্য প্রমাণ মান যতটা সম্ভব পরিমাণগতভাবে প্রকাশ করতে হবে।

   (vi) কর্মীদের সাথে যথাসম্ভব আলোচনার ভিত্তিতে এই মান নির্ধারণ করতে হবে।

2. **সম্পাদিত কাজের পরিমাপ (Measurement of performance) :** প্রত্যাশিত কাজের মান একবার স্থির হয়ে গেলে পরের ধাপটি হল **প্রকৃত কাজের পরিমাপ**। ধরা যাক একটি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় স্থির করা হয়েছে 50,000 ইউনিট। সুতরাং প্রকৃত বিক্রয় 50,000 ইউনিটের কম না বেশি তা দেখতে হয়। কাজ চলাকালীনও কাজের পরিমাপ করা হয়। এর ফলে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ থাকে।

3. **প্রত্যাশিত ও সম্পাদিত কাজের কথা তুলনা (Comparison between the actual performance and standard performance) :** কাজের প্রমাণ মান হল প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত প্রত্যাশা। অন্যদিকে সম্পাদিত কাজ হল বাস্তব ঘটনা। প্রত্যাশার সাথে বাস্তবের তুলনা করে কর্মসম্পাদনে প্রতিষ্ঠানের শক্তি (Strength) বা দুর্বলতা (Weakness) পরিমাপ করা যায়। যদি সম্পাদিত কাজ প্রমাণ মানের সাথে মিলে যায় তাহলে ধরে নেওয়া হয় সে সবকিছু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যদি বিচ্যুতি দেখা যায় তাহলে বিচ্যুতির কারণগুলি চিহ্নিত করে তাদের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে ছোটোখাটো বিচ্যুতি অগ্রাহ্য করা হয়। যেমন, বিচ্যুতি যদি প্রমাণ মানের 'কম বেশি 5%' হয় তাহলে ব্যবস্থাপকরা তা অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু এর বেশি হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। বস্তুত **সঙ্কটজনক**

বা **ব্যতিক্রমী বিচ্যুতির** (Critical or exceptional deviation) উপর গুরুত্ব আরোপ '**ব্যতিক্রমী নিয়ন্ত্রণ**' (Control by exception) নামে পরিচিত।

4. **বিচ্যুতির কারণ চিহ্নিত বা সনাক্তকরণ (Indentifying cause of deviation) :** তৃতীয় ধাপে কাজের প্রমাণ মান ও সম্পাদনার মধ্যে তুলনা করে যে বিচ্যুতি দেখা যায় তা তাৎপর্যপূর্ণ হলে এর কারণ অনুসন্ধান করা হয়। এজন্য কাজ সম্পাদন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিচ্যুতির কারণটি চিহ্নিত করা হয়। সাধারণত বিচ্যুতির পিছনে যেসব কারণ বর্তমানে থাকে সেগুলি হল পরিকল্পনায় ভুল-ত্রুটি, সম্পাদনের ক্ষেত্রে অমনোযোগিতা অথবা পরিকল্পনার দুর্বল রূপায়ণ।

5. **সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ (Taking corrective actions) :** বিচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করে সেগুলি সংশোধনের ব্যবস্থা না করলে নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হয় না। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি অনুসন্ধানেই নিবদ্ধ থাকে না, সেগুলি যাতে সংশোধন করা যায় ও ভবিষ্যতে যাতে তাদের পুনরাবৃত্তি না ঘটে তারও ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া শেষ হয় কাজ সম্পাদনে উদ্‌ঘাটিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে। অবশ্য যেখানে বিচ্যুতি ঘটে না বা অত্যন্ত কম বিচ্যুতি ঘটে সেক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, কাজের প্রকৃত সম্পাদন প্রমাণ মানের চেয়ে খারাপ হওয়ার পিছনে কারণ হল কর্মীদের প্রশিক্ষণের অভাব, পুরানো ও অকেজো যন্ত্রপাতি, লোডশেডিং, খারাপ মানের কাঁচামাল, কর্মীদের মধ্যে প্রণোদনার অভাব ইত্যাদি। সুতরাং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, উন্নতমানের যন্ত্রপাতি স্থাপন, ভালো মানের কাঁচামালের ব্যবস্থা, কাজের পরিবেশের উন্নয়ন, পরিদর্শন ইত্যাদি গ্রহণ করলে কর্মসম্পাদন উন্নত হয়। তবে যেক্ষেত্রে কোনোভাবেই কর্মসম্পাদন প্রমাণ মানের স্তরে উন্নীত করা যায় না, সেক্ষেত্রে প্রমাণ মানকেই সংশোধন করতে হয় ও কমাতে হয়। এরূপ ঘটনাও দেখা যায় যখন বিচ্যুতির কারণ ব্যবস্থাপকদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে না।

নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপগুলি অন্য একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ করা যায় :

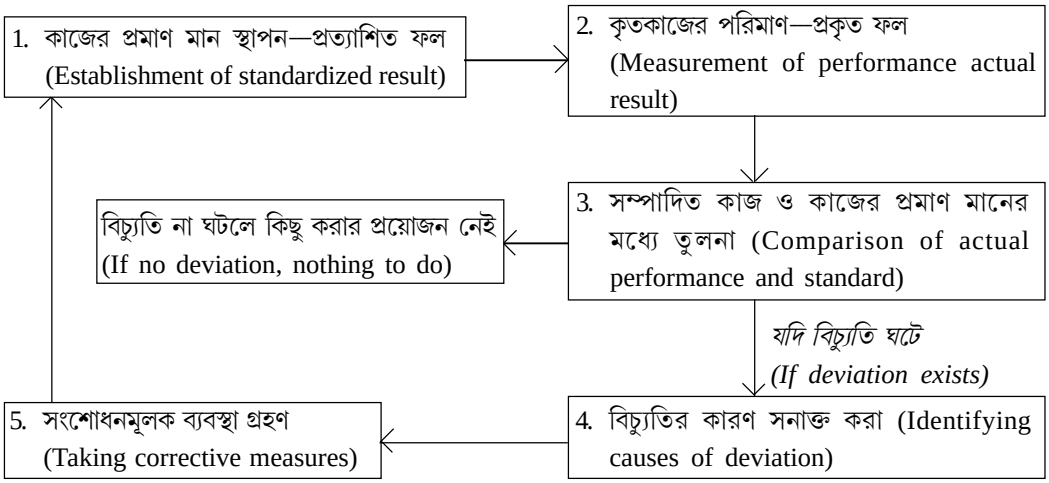

4.9.3 পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সম্পর্ক

পরিকল্পনা হল ব্যবস্থাপনার **প্রাথমিক কাজ**। **হেইম্যান** (T. Haimann) বলেছেন—'কী করতে হবে আগে থেকে ঠিক করে নেওয়ার নামই পরিকল্পনা'। অর্থাৎ পরিকল্পনা হল প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপযুক্ত পথের নির্বাচন। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণ হল ব্যবস্থাপনার **প্রান্তিক কাজ** বা **শেষ পর্যায়ের কাজ**। নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় 'পরিকল্পনায় গৃহীত মানের সাথে কাজ সম্পাদনের পার্থক্য নির্ধারণ, কারণ অনুসন্ধান ও সংশোধন'। বস্তুত ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হয় পরিকল্পনা তৈরির মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। যদিও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার অবস্থানগত দিক দিয়ে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তবুও তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। এদের মধ্যে যেসব সম্পর্কগুলি বিদ্যমান সেগুলি নীচে আলোচনা করা হল।

1. **পরস্পরের পরিপূরক (Complimentary each other) :** পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। পরিকল্পনা ছাড়া নিয়ন্ত্রণ অর্থহীন। অর্থাৎ পরিকল্পনা হল নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি। কারণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে প্রমাণ মানের (Standard) প্রয়োজন হয় তা পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই পূর্বনির্ধারিত মান বা পরিকল্পনা অনুসারে কাজ সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা দেখাই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পরিকল্পিত পথ ধরেই যাতে কাজ সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করাই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য। অন্যভাবে বলা যায় পরিকল্পনাই নিয়ন্ত্রণের কাজের ধারা ও পরিধি ঠিক করে দেয়। পরিকল্পনা ছাড়া নিয়ন্ত্রণ অন্ধ। তাই বলা হয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা পরস্পরের পরিপূরক, একটিকে বাদ দিলে অন্যটি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।
2. **নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে সঠিক পথে চালিত করে (Control keeps the planning in the right track) :** নিয়ন্ত্রণ ছাড়া পরিকল্পনা উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে না। পরিকল্পনা নির্দিষ্ট পথ ঠিক করে, নিয়ন্ত্রণ দেখে ওইপথে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কিনা। পরিকল্পনার বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো বিচ্যুতি ঘটলে নিয়ন্ত্রণ তা সনাক্ত করে ও কাজ যাতে পরিকল্পনা অনুসারে সম্পাদিত হয় তার ব্যবস্থা করে। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়। পরিকল্পনা তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন তার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। সেজন্য বলা হয় পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ হল ব্যবস্থাপনার **যজম সন্তান** (Twins of management)।
3. **উভয়ই ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি দেয় (Both are forward-looking) :** যদিও অনেক সময় বলা হয় যে পরিকল্পনা ভবিষ্যৎমুখী কিন্তু নিয়ন্ত্রণ অতীতমুখী। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এটি পুরোপুরি সত্য নয়। পরিকল্পনা হল ভবিষ্যতের কার্যক্রম যা অতীত অভিজ্ঞতা ও পূর্বানুমানের সাহায্যে বর্তমানে স্থির করা হয়। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণ অতীত কাজের পর্যালোচনা করে ত্রুটি-বিচ্যুতি যেমন নির্ধারণ করে, তেমনি ভবিষ্যৎ কাজের ক্ষেত্রে অনুরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির পুনরাবর্তন যাতে না ঘটে তারও ব্যবস্থা করে। নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে বাধ্য করে। নিয়ন্ত্রণের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা ভবিষ্যতে পরিকল্পনার রূপায়ণ যাতে আরও উন্নত হয় সেই লক্ষ্যে কাজ করে। কাজেই নিয়ন্ত্রণও ভবিষ্যৎমুখী।

নীচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক তুলে ধরা হল।

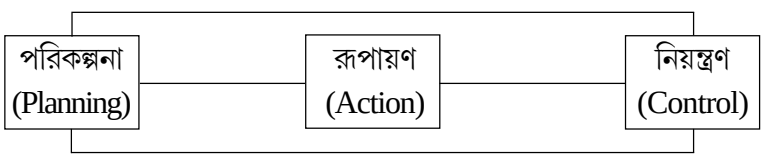

4.9.4 কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হিসাবে গণ্য হয় এবং এই দুটি বিষয়ই কর্মসম্পাদনের সূচিকে অনুসরণ করে। কারণ একবার পণ্য বা সেবার নকশা চূড়ান্ত হয়ে গেলে পণ্য বা সেবা উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ পণ্য বা সেবার দৈনন্দিন উৎপাদন প্রক্রিয়া যাতে সাবলীলভাবে অর্থাৎ বিনা বাধায় চলতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গুণমান (quality) বজায় রাখা। কারণ এটি কার্যসম্পাদন পরিমাপের ক্ষেত্রে অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য হয়। গুণমান প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কৌশল কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলে যে বিষয়টি সুনিশ্চিত হয় তা হল গুণমান নির্ভর উৎপাদন প্রক্রিয়া।

4.9.5 পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকলাপ

কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা হল একটি অনুমান। এই অনুমান হল কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়াগুলিকে দক্ষ এবং কার্যকর করার জন্য যা করা প্রয়োজন সে সংক্রান্ত অর্থাৎ যোগান যেন চাহিদা অনুসারে হয় সে ব্যাপারে আগাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অন্যদিকে কার্যসম্পাদন সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ হল যে কাজ অনুমান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দান এবং যদি তা না হয় তাহলে প্রয়োজনমতো সমন্বয় করা।

পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকলাপের মধ্যে নীচের কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে :

(i) উদ্দেশ্য স্থির করা অর্থাৎ আগাম যেন জানা যায় কি পরিকল্পনা কী করতে চায় ও কখন করতে চায়।

(ii) কাজ ও দায়িত্বের বণ্টন অর্থাৎ কারা নতুন পণ্য বা সেবার সাথে যুক্ত হবে এবং কীভাবে যুক্ত হবে।

(iii) কর্মসূচি প্রণয়ন এবং এর অন্তর্ভুক্ত হল কাজের ধরন, প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কার্যসূচি, যোগান ও চাহিদার কার্যসূচি।

(iv) সম্পদের প্রয়োজন, কর্মী ও তাদের দক্ষতা, অর্থ, সময়, কাঁচামাল, মেশিনপত্র ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মূল্যায়ন করা।

(v) কাজের পরিদর্শন এবং সম্পাদনযোগ্যতার মূল্যায়ন যা নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসাবে গণ্য হয় এবং এর অন্তর্ভুক্ত হল নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপ, কাজের পরিমাণ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতিসমূহ।

4.10 প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়ন

কোনো উদ্যোগের বাস্তব রূপায়ণের লক্ষ্যে সামগ্রিকভাবে প্রস্তুত গুচ্ছ নির্দেশিকাই হল প্রকল্প প্রতিবেদন। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা যে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় তাই প্রকল্প প্রতিবেদন। নতুন উদ্যোগ স্থাপন অথবা চালু উদ্যোগের আধুনিকীকরণ বা সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন এই প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রতিবেদন অপরিহার্য বলে গণ্য হয়। বস্তুত প্রকল্প প্রতিবেদন হল প্রকল্প পরিকল্পনার লিখিত রূপ। নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা স্থির করা হয় সেগুলি প্রকল্প প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয় এবং রূপায়ণকালে সেগুলি অনুসরণ করা হয়। অন্যথায় প্রকল্পের সাফল্য পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে।

সাধারণত ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রায়তন কারবারি সংস্থার প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে খুব বেশি আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না যা বৃহদায়তন কারবারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় আবার প্রকল্প প্রতিবেদনে কত বেশি তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে তাও নির্ভর করে উদ্যোগের আকৃতি ও উৎপাদনের প্রকৃতির উপর। 1999 সালে **বিনোদ গুপ্তা** ((Vinod Gupta) একটি প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে যেসব তথ্যর প্রয়োজন তার একটি সাধারণ তালিকা তৈরি করেছিলেন। তিনি প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আটটি নির্দিষ্ট ও অনুক্রমিক স্তরে বিভক্ত করেছেন। এই নির্দিষ্ট ও অনুক্রমিক স্তরগুলি হল নিম্নরূপ :

1. সাধারণ তথ্যাবলি
2. প্রকল্প বিবরণ
3. বাজার সম্ভাবনা
4. মূলধনী ব্যয় ও অর্থের উৎসসমূহ
5. কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ
6. অন্যান্য আর্থিক বিষয়সমূহ
7. অর্থনৈতিক ও সামাজিক চলকসমূহ
8. প্রকল্প রূপায়ণ

এই প্রতিটি স্তর সংক্রান্ত যেসব তথ্য প্রকল্প প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয় সে সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হল—

1. সাধারণ তথ্যবলি (General Information) : একটি প্রকল্প প্রতিবেদনে যেসব সাধারণ তথ্যাবলি উল্লেখ করতে হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ—

(i) **উদ্যোক্তা সম্পর্কিত তথ্যাবলি (Bio-data promoter) :** এই শিরোনামে উদ্যোক্তার নাম ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্য কোনো ধরনের যোগ্যতা, উদ্যোগ সংস্থাটি অংশীদারি কারবার হিসাবে গড়ে উঠলে প্রত্যেক অংশীদারের উপরোক্ত তথ্যগুলি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা আবশ্যক।

(ii) **শিল্পসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় (Industry Profile) :** প্রকল্পটি যে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রতিবেদনে স্থান পায়। এছাড়াও এই শিল্পের অতীত ইতিহাস, বর্তমান অবস্থা সাংগঠনিক অবস্থা এবং সমস্যা সম্বন্ধেও আলোকপাত করা হয়।

(iii) **গঠন ও সংগঠন (Constitution and Organisation) :** উদ্যোগের গঠন ও তার সাংগঠনিক কাঠামো, অংশীদারি কারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারি চুক্তির প্রধান বিষয়সমূহ, নিবন্ধন সংখ্যা যদি থাকে, ইত্যাদির উল্লেখ থাকে।

(iv) **পণ্য বিবরণ (Product Description) :** যে সব পণ্য উৎপাদন করা হবে বলে স্থির হয় তাদের উপযোগিতা ব্যাপ্তি, পণ্য নক্শা, সমজাতীয় বিকল্প পণ্যের থেকে কী কী অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায় ইত্যাদি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

2. প্রকল্প বিবরণ (Project Description) : প্রকল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়। প্রকল্প বিবরণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল নিম্নরূপ :

(i) **অবস্থান (Location) :** উদ্যোগী সংস্থার ঠিকানা, যে জায়গায় উদ্যোগ অবস্থিত সেটি ভাড়ায় নেওয়া নাকি নিজস্ব, চৌহদ্দি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে সংগৃহীত সম্মতিপত্র ইত্যাদি।

(ii) **ভৌত পরিকাঠামো (Physical Infrastructure) :** ভৌত পরিকাঠামো অন্তর্ভুক্ত নীচের বিষয়গুলি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়—

a) **কাঁচামাল (Raw Materials) :** কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পাওয়া যায় নাকি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, কাঁচামাল যোগানের উৎসসমূহ।

b) **দক্ষ শ্রমিক (Skilled Labour) :** স্থানীয় অঞ্চল থেকে দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায় কিনা, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(iii) **বিভিন্ন সরবরাহ (Utilities) :** এর অন্তর্ভুক্ত হল—

a) **শক্তি (Power) :** শক্তির প্রয়োজনীয়তা, উৎস এবং সরবরাহকারী সংস্থার যেমন 'বিদ্যুৎ পর্ষদ' থেকে অনুমতি।

b) **জ্বালানি (Fuel) :** যে সব জ্বালানির প্রয়োজন, যেমন—কয়লা, গ্যাস, ডিজেল, পেট্রল ইত্যাদির আনুমানিক পরিমাণ ও সরবরাহের উৎস।

c) **জল (Water) :** শিল্পোদ্যোগে জল অপরিহার্য। প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় জলের উৎস পরিস্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে।

d) **দূষণ নিয়ন্ত্রণ (Polution Control) :** যে সব শিল্পোদ্যোগে ধোঁয়া, রাসায়নিক ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি সৃষ্টি হয় তাদের ক্ষেত্রে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে যে দূষণ রোধে কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

e) **জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা (Communication System) :** উদ্যোগের জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থার অবস্থা যেমন—টেলিফোন, টেলিকম, ইন্টারনেট ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রতিবেদন সূচিত করতে হবে।

f) **যানবাহনের সুবিধা (Transport Facilities) :** উদ্যোগ যে জায়গায় অবস্থিত তার পরিবহন ব্যবস্থা যেমন—সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ ইত্যাদি দ্বারা যুক্ত কিনা তাও উল্লেখ করতে হয়।

g) **উৎপাদন প্রক্রিয়া (Production Process) :** যে প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল পণ্যে পরিণত হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

h) **মেশিনপত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি (Machineries and Equipments) :** প্রকল্প প্রতিবেদেন প্রয়োজনীয় মেশিন ও যন্ত্রপাতির একটি তালিকা পূর্ণাঙ্গ বিবরণসহ দিতে হবে অর্থাৎ মেশিনের দাম আকার ও আকৃতি, ধরন, দাম এবং যোগানের উৎসসমূহ।

i) **প্রযুক্তি (Technology) :** প্রযুক্তি নির্বাচন এবং প্রযুক্তি পাওয়ার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়।

3. বাজার সম্ভাবনা (Market Potential) : উদ্যোগের সম্ভাব্য পণ্যের বাজার সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা যাতে পাওয়া যায় তার জন্য নীচের বিষয়গুলি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়—

i) পণ্যের চাহিদা ও যোগানের অবস্থা;

ii) পণ্যের প্রত্যাশিত দাম;

iii) বিপণন কৌশল;

iv) বিক্রয় পরবর্তী পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থাসমূহ; এবং

v) পরিবহন ব্যবস্থা

4. মূলধনী ব্যয় ও অর্থের উৎসসমূহ (Capital Cost and Sources of Finance) : উদ্যোগে যে সব মূলধনী দ্রব্য যেমন—জমি ও বাড়ি, মেশিনপত্র ও আসবাবপত্র, মেশিন প্রতিস্থাপন ব্যয় ইত্যাদির জন্য যে মূলধনী ব্যয় করতে হবে তার একটি আনুমানিক হিসাব প্রকল্প প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সাথে সাথে এসব ব্যয়ের জন্য অর্থের উৎসগুলিও উল্লেখ করতে হয়।

5. কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ (Estimation of Working Capital Requirement) : মূলধনী ব্যয়ের মতোই উদ্যোগের আনুমানিক কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ও সংগ্রহের উৎসগুলি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়।

6. অন্যান্য আর্থিক দিক (Other Financial Aspects) : এই শিরোনামে উদ্যোগের একটি সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতির হিসাব তৈরি করতে হয়। এর থেকে মোট বিক্রয় উৎপাদন ব্যয়, অন্যান্য উপরিব্যয় এবং আনুমানিক লাভ সম্বন্ধে জানা যায়। এছাড়াও একটি সম্ভাব্য উর্দ্বতপত্র ও নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণী তৈরি করলে আরও ভালো হয়। এছাড়াও শিল্প-উদ্যোগের ক্ষেত্রে সমভঙ্গ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমভঙ্গ বিন্দু অর্থাৎ যে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় হলে লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না সেটিও প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়।

7. অর্থনৈতিক ও সামাজিক চলকসমূহ (Economic and Social Variables) : কারবারের সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়। এছাড়া প্রকল্প থেকে যেসব আর্থ-সামাজিক

সুবিধা (Socio-economic benefits) পাওয়ার প্রত্যাশা থাকে সেগুলিও উল্লেখ করতে হয়। এ ধরনের সুবিধার কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল :

i) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

ii) আমদানির বিকল্প;

iii) রপ্তানি;

iv) স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার;

v) এলাকার উন্নয়ন ইত্যাদি

8. প্রকল্প রূপায়ণ (Project Implementation) : প্রকল্প প্রতিবেদনের এটিই শেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক উদ্যোক্তারই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য একটি কর্মসূচি তৈরি করা আবশ্যক। এই কর্মসূচি প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ যথাসময়ে অর্থাৎ সময়সারণি অনুসারে রূপায়ণের ব্যবস্থা করবে। প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে সময়সূচি অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রকল্প রূপায়ণে দেরি হলে আনুষঙ্গিক ব্যয় বেড়ে যায় বা প্রকল্প রূপায়ণ ব্যর্থ হয়ে পড়ে। কাজেই প্রকল্প রূপায়ণের কার্যসূচি তৈরি করা এবং সেই অনুযায়ী প্রকল্প রূপায়ণ সময়মতো সম্পূর্ণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়ন বা প্রস্তুতি শেষ হয় একটি প্রকল্প রূপায়ণের কর্মসূচি ও সময়সূচির মধ্য দিয়ে।

4.11 সারাংশ

এই এককটি পড়ে আমরা কারবারি ধারণার উৎসসমূহ এবং সম্ভাব্যতা পরীক্ষা সম্পর্কে এক সুন্দর ধারণা লাভ করতে পারলাম। কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব, প্রস্তাবের তাৎপর্য, প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে নতুন কারবারের অবস্থান, অবস্থান নিধারণকারী বিষয়সমূহ, নতুন উদ্যোগের সজ্জা, সজ্জার ধরন, নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বপরি পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পর্কেও এক সুন্দর ধারণা লাভ করতে পারলাম।

4.12 প্রশ্নাবলী

ক. এমসিকিউ প্রশ্নাবলি

1. কারবারি ধারণার উৎস হিসাবে নীচের কোনটি গণ্য হয়?

(ক) বাণিজ্যিক প্রদর্শনী ও মেলা

(খ) উদ্যোক্তার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ

(গ) অন্য উদ্যোক্তার কাছ থেকে সংগ্রহ করা

(ঘ) (ক) ও (খ)

2. নীচের কোনটি কারবারি ধারণার উৎস হিসাবে গণ্য হয় না?
   (ক) উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ
   (খ) গবেষণা
   (গ) প্রচলিত পণ্যকে অনুকরণ করা
   (ঘ) কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত ধারণা
3. সম্ভাব্যতা পরীক্ষা মূলত কয় ধরনের?
   (ক) তিন ধরনের (খ) চার ধরনের
   (গ) পাঁচ ধরনের (ঘ) ছয় ধরনের
4. নীচের কোনটি বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা পরীক্ষার বিষয় হিসাবে গণ্য হয় না?
   (ক) লগ্নির উপর প্রত্যাশিত আয়ের হার (খ) বিক্রয় পূর্বানুমানের পরিমাণ
   (গ) কোন ধরনের ক্রেতা পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী (ঘ) কারবারের বিক্রয় পূর্বানুমানের পরিমাণ
5. নীচের কোন কাজটি একটি কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রতিবেদন কাজ হিসাবে গণ্য হয়?
   (ক) পথ প্রদর্শকের কাজ (খ) কারবার পরিচালনার কাজ
   (গ) বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার কাজ (ঘ) (ক) ও (গ)
6. কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা বা নকশা তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য কী?
   (ক) কাজ যাতে সঠিক সময়ে সম্পন্ন হয়
   (খ) কারবারের কাজ সম্পাদনকে মসৃণ করা
   (গ) ব্যয় হ্রাস
   (ঘ) ক্রেতাদের গুণগত মানের পণ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা দান
7. নতুন উদ্যোগের অবস্থান নির্বাচনে নীচের কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়?
   (ক) কাঁচামাল (খ) মুনাফা
   (গ) শ্রমিক (ঘ) পরিকাঠামো
8. উদ্যোগের স্থান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নির্ধারণকারী যে সব বিষয় বিবেচনা করতে হয় তাদের মধ্যে নীচের কোনটি পড়ে না?
   (ক) কাঁচামালের লভ্যতা (খ) মুনাফাযোগ্যতা
   (গ) বাজারের নৈকট্য (ঘ) শ্রমিকের সহজপ্রাপ্যতা
9. কার্পাস বয়ন শিল্প স্থাপনের জন্য যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল—
   (ক) রাজনৈতিক অবস্থা (খ) বাজারে নৈকট্য
   (গ) জলবায়ু (ঘ) কাঁচামালের প্রাপ্যতা

10. জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি ঠাণ্ডা জায়গায় কী ধরনের উদ্যোগ গঠন করলে সুবিধা পাওয়া যায়?

(ক) লৌহ-ইস্পাত উদ্যোগ (খ) বস্ত্র কারখানা

(গ) কাগজ শিল্প (ঘ) ঘড়ি তৈরির কারখানা

11. 2010 সালে খঙ্কা (Khanka) একটি উদ্যোগের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করে বিষয়গুলির একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন। নীচে উল্লিখিত কোন বিভাগটি তাঁর তালিকায় ছিল না?

(ক) সামাজিক বিষয়সমূহ (খ) গুণগত বিষয়সমূহ

(গ) নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়সমূহ (ঘ) জন্মগত বিষয়সমূহ

12. নতুন উদ্যোগের সজ্জা (Lay out)-র উদ্দেশ্য হিসাবে নীচের কোনটি অন্তর্ভুক্ত হয় না?

(ক) উদ্যোগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি

(খ) কর্মপ্রবাহ সচল রাখা

(গ) উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় যেন ছেদ না পড়ে

(ঘ) সময়ের অপচয় যেন না হয়

13. উদ্যোগের অভ্যন্তরীণ সজ্জা স্থির করার ক্ষেত্রে যেসব নীতি মেনে চলা হয় তাদের মধ্যে নীচে উল্লিখিত কোন নীতিটি বিবেচনা করা হয় না?

(ক) ন্যূনতম চলাচলের নীতি (খ) স্থান ব্যবহারের নীতি

(গ) স্বচ্ছতার নীতি (ঘ) পরিদর্শনের নীতি

14. নীচের কোনটি উদ্যোগের অভ্যন্তরীণ সজ্জার ধরন বলে গণ্য হয় না?

(ক) পণ্য সজ্জা (খ) প্রক্রিয়া সজ্জা

(গ) সার্বিক সজ্জা (ঘ) সমবায় সজ্জা

15. জাহাজ তৈরি, এরোপ্লেন, ওয়াগন তৈরির ক্ষেত্রে কী ধরনের অভ্যন্তরীণ সজ্জা অনুসৃত হয়?

(ক) পণ্য সজ্জা (খ) সমব্যয় সজ্জা

(গ) প্রক্রিয়া সজ্জা (ঘ) স্থির অবস্থামূলক সজ্জা

উত্তর: 1. (ঘ) 2. (গ) 3. (ক) 4. (গ) 5. (ঘ) 6. (ঘ)
7. (খ) 8. (খ) 9. (গ) 10. (ঘ) 11. (ক) 12. (ক)
13. (গ) 14. (গ) 15. (ঘ)

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. সম্ভাব্যতা পরীক্ষা কাকে বলা হয়?

2. কারবার পরিকল্পনা বলতে কি বোঝেন?

3. বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা কাকে বলে?
4. নতুন উদ্যোগের সজ্জা বলতে কি বোঝায়?
5. পণ্য সজ্জা কাকে বলে?

গ. দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. কারবারি ধারণার উৎসসমূহ আলোচনা করুন।
2. বাজার সম্ভাব্যতা এবং বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে?
3. কারবার পরিকল্পনার তাৎপর্য আলোচনা করুন।
4. কারবার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।
5. কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া প্রণয়নের নীতিসমূহ আলোচনা করুন।
6. কারবারের অবস্থান নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।
7. উদ্যোগের অভ্যন্তরীণ সজ্জার ধরন ব্যাখ্যা করুন।
8. প্রকল্প প্রতিবেদনের বিভিন্ন স্তর যে সমস্ত তথ্য উল্লেখ করে তা আলোচনা করুন।

একক-5 ❑ সম্পদ সংগ্রহ (Resource Mobilization)

গঠন

5.0 উদ্দেশ্য

5.1 প্রস্তাবনা

5.2 সম্পদ সংগ্রহ—অর্থ ও সংজ্ঞা

5.3 সম্পদ সংগ্রহ বা গতিশীলতার ধরন

5.4 সম্পদ সংগ্রহ বা গতিশীলতার গুরুত্ব

5.5 নতুন উদ্যোগের আবাসস্থল ও উপযোগসমূহ

5.6 বিক্রেতা, সরবরাহকারী, ব্যাঙ্কার, মুখ্য ক্রেতাদের সাথে প্রাথমিক চুক্তি

5.7 সারাংশ

5.8 প্রশ্নাবলী

5.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন—

- সম্পদ সংগ্রহ বলতে কী বোঝায়।
- সম্পদ সংগ্রহ-এর বিভিন্ন ধরন।
- সম্পদ সংগ্রহ-এর গুরুত্ব।
- নতুন উদ্যোগের আবাসস্থল ও উপযোগসমূহ
- বিক্রেতা, সরবরাহকারী, ব্যাঙ্কার, মুখ্য ক্রেতাদের সাথে প্রাথমিক চুক্তি।

5.1 প্রস্তাবনা

সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদের গতিশীলতা বলতে কোনো কারবারি সংস্থার নতুন ও অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব কার্যকলাপ করা হয় তাদের বোঝায়। এর মধ্যে সম্পদের অধিক ব্যবহার এবং বিদ্যমান সম্পদের সর্বাধিকীকরণ করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। অনেক সময় একে নতুন কারবারের উন্নয়ন হিসাবেও গণ্য করা হয়। এই একক থেকে আপনারা সম্পদ সংগ্রহ-এর বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হবেন।

5.2 সম্পদ সংগ্রহ—অর্থ ও সংজ্ঞা

সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদের গতিশীলতা বলতে কোনো কারবারি সংস্থার নতুন ও অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব কার্যকলাপ করা হয় তাদের বোঝায়। এর মধ্যে সম্পদের অধিক ব্যবহার এবং বিদ্যমান সম্পদের সর্বাধিকীকরণ করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। অনেক সময় একে নতুন কারবারের উন্নয়ন হিসাবেও গণ্য করা হয়।

'সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদের গতিশীলতার অপর একটি সংজ্ঞা হল যে বিভিন্ন সম্পদ সরবরাহকারীদের থেকে বিভিন্ন উপায়ে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের একটি প্রক্রিয়া'। এই সম্পদগুলির কাম্য ব্যবহারের মাধ্যমেই কারবারি সংস্থার পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হয়। অর্থাৎ এর কাজ হল সময়মতো স্বল্পব্যয়ে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

অপর একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে সম্পদ সংগ্রহ বা গতিশীলতা হল একটি নতুন উদ্যোগ বা বিদ্যমান কারবারি সংস্থার নতুন বা অতিরিক্ত অর্থ, মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ সংগ্রহের জন্য গৃহীত কার্যকলাপ যার দ্বারা উদ্যোগের লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হয়। এর উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের সুষম উন্নয়নকে (Sustainability) সুনিশ্চিত করা।

একটি উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য অর্থ সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন পক্ষের সমর্থন যেমন বন্ধুবান্ধবদের সমর্থন, পরিবারের সমর্থন, ডিলারদের সমর্থন, কর্মচারীদের সমর্থন, পরিকাঠামো ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। অর্থাৎ অর্থ সমেত এসব সম্পদকেই সম্মিলিতভাবে সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদের গতিশীলতা বলে।

কাজেই এটি হল প্রকৃতপক্ষে উদ্যোগের স্বপক্ষে বিভিন্ন ধরনের সমর্থন সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া এবং এর অন্তর্ভুক্ত হল নগদ অর্থ ও বস্তুগত সমর্থন। সম্পদ গতিশীলতার উদ্দেশ্য হল সঠিক সময়ে সঠিক দামে সংগ্রহ করা ও সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাতে সেগুলির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়।

5.3 সম্পদ সংগ্রহ বা গতিশীলতার ধরন

প্রতিটি উদ্যোগের নিজস্ব কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে এবং ওই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের কাজকর্ম পরিচালিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও এসব কাজকর্ম চালানোর জন্য উদ্যোগকে সম্পদ সংগ্রহ করতে হয় এবং সংগৃহীত সম্পদের কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হয়। এসব সম্পদের সাহায্যেই উদ্যোগ পণ্য বা সেবা উৎপাদন করতে সমর্থ হয় এবং আয় অর্জন করে। এই সম্পদগুলির মধ্যে যেগুলি মূল সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় সেগুলি হল—

i) ভৌত বা বস্তুগত সম্পদ

ii) আর্থিক সম্পদ

iii) মানবিক সম্পদ

উদাহরণস্বরূপ যেসব উৎপাদক 'মাইক্রোচিপ' তৈরি করে তারা মূলধন-নিবিড় উৎপাদন সুবিধা পেতে চায়। অন্যদিকে মাইক্রোচিপের নকশা তৈরি করার পরে এরূপ উদ্যোগ মানবিক সম্পদের উপরই

বেশি নির্ভর করে। তবে একটি নতুন উদ্যোগে যদিও আর্থিক সম্পদই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয় তবুও নীচে উল্লিখিত সম্পদগুলির প্রয়োজনীয়তাও কোনো অংশে কম নয়। এগুলি হল—

i) আর্থিক সম্পদ
ii) মেধা সম্পদ
iii) মানবিক সম্পদ
iv) ভৌত সম্পদ
v) শিক্ষামূলক সম্পদ
vi) আবেগমূলক সম্পদ
vii) নৈতিক সম্পদ
viii) সাংস্কৃতিক জ্ঞানজনিত সম্পদ
ix) সম্পর্কভিত্তিক সম্পদ

নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

i. আর্থিক সম্পদ (Financial Resources) : একটি কারবারি উদ্যোগ শুরু করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হল প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা। কারণ অর্থই হল বিনিময়ের মাধ্যম। আর্থিক সম্পদের সাহায্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সহজেই সংগ্রহ করা যায়। এছাড়াও কারবারের আকৃতি-প্রকৃতি যাই হোক না কেন কম-বেশি প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেই হয়। তাই এধরনের ব্যয় হল প্রাক্ উদ্যোগ সংক্রান্ত ব্যয়। সুতরাং আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করা হল উদ্যোগ গঠনের প্রাথমিক কাজ। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করা যায় কিন্তু এদের মধ্যে সম্পদ সংগ্রহের সহজ উৎসগুলি হল—

(a) উদ্যোক্তার নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করা সবচেয়ে সহজ কাজ।
(b) বিকল্প উপায় হল ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করা।
(c) এছাড়াও আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকেও উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত ঋণ নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।
(d) যেসব ব্যক্তি উদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক।

এগুলি ছাড়াও নতুন উদ্যোগ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ যেসব উৎস থেকে সংগ্রহ করা যায় সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(e) **ভালোবাসার অর্থ (Love Money) :** সাধারণ উদ্যোক্তা স্বামী/স্ত্রীর কাছ থেকে, পিতা-মাতার কাছ থেকে, পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকেও ঋণ হিসাবে অর্থ সংগ্রহ করে। যেহেতু অর্থের উৎসের সাথে উদ্যোক্তার ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে এবং এই ভালোবাসার উপর ভিত্তি করেই অর্থ সংগৃহীত হয়, তাই একে ভালোবাসার অর্থ বলা হয়। ভবিষ্যতের উদ্যোগের লাভ হলে এদের অর্থ ক্রমান্বয়ে পরিশোধ করা হয়।

(f) **উদ্যোগ মূলধন (Venture Capital) :** উদ্যোগ মূলধন তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ উদ্যোগের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস, তবে সব ধরনের উদ্যোগের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই উৎসটি উপযোগী নয়। কারণ উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা কেবলমাত্র সেসব উদ্যোগেই অর্থ সরবরাহ করতে সম্মত হয় যারা প্রযুক্তি নির্ভর কারবার করে এবং যাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। এরা তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বায়ো-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প উদ্যোগে লগ্নি করতে বেশি আগ্রহী হয়। এছাড়াও, এসব প্রতিষ্ঠান নতুন উদ্যোগের মালিকানার অংশের অর্থ লগ্নি করতে সম্মত হয় যা সব উদ্যোগের ক্ষেত্রে উপযোগী হয় না, তবে সাথে সাথে এরা ঝুঁকির অংশও বহন করে।

(g) **দেবদূত লগ্নিকারী (Angel Investers) :** দেবদূত লগ্নিকারী বলতে বোঝায় যেসব বিত্তশালী ব্যক্তি তাদের সঞ্চিত অর্থ নতুন উদ্যোগে লগ্নি করে। এরা সাধারণত সম্পদশালী পরিবারের সদস্য বা অবসরপ্রাপ্ত কোম্পানি পরিচালক বা প্রধান কার্যনির্বাহী। এদের কারবার পরিচালনায় প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকে। তারা সদ্য গড়ে ওঠা উদ্যোগে মালিকানার বিনিময়ে সরাসরি অর্থ বিনিয়োগ করে। এছাড়াও এরা উদ্যোগ পরিচালনায় অংশগ্রহণও করে যাতে উদ্যোগের কাজকর্মে স্বচ্ছতা থাকে। এসব লগ্নিকারীরা উদ্যোগের ঝুঁকিও বহন করতে সম্মত থাকে।

(h) **কারবারি ইনক্যুবেটর (Business Incubator) :** কারবারি ইনক্যুবেটর বলতে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠিত কারবার বা কোম্পানি নতুন উদ্যোগকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। এসব কোম্পানি নতুন উদ্যোগের উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে সহায়তা প্রদান করে, যেমন—উদ্যোগ গড়ে তোলার জায়গা, অফিস সংক্রান্ত সহায়তা প্রযুক্তি ও অন্যান্য সহায়তা, কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের সহায়তা, উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বিপণন সংক্রান্ত পরামর্শ ইত্যাদি। অর্থাৎ যে কোম্পানি ইনক্যুবেটর হিসবে কাজ করে তারা নতুন উদ্যোগের সাথে তাদের প্রশাসনিক, পণ্য চলাচল ও প্রযুক্তিগত সম্পদের সুবিধা পেয়ে থাকে। সাধারণত এ ধরনের সাহায্য দেওয়া হয় উদ্যোগ স্থাপনের পর থেকে দুই বছরের জন্য। অর্থাৎ নতুন উদ্যোগের পণ্য বা সেবা বাজারে উপস্থাপিত হওয়ার পর এরা সরে যায় ও নতুন উদ্যোগকে নিজের মতো চলতে দেয়।

(i) **সরকারি অনুদান ও ভর্তুকি (Grants and Subsidy) :** অনেক সময়ই নতন উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি নতুন উদ্যোগকে অনুদান ও ভর্তুকি দিয়ে থাকে। এর পিছনে কারণ হল যাতে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় থাকে ও জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। নতুন উদ্যোগের গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়, বিপণন ব্যয়, বেতন বাবদ ব্যয় এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য অনুদান দিয়ে থাকে। অনুদান (grant) বলতে বোঝায় যেসব সরকারি সাহায্য পরিশোধ করার প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে ভর্তুকি হল উদ্যোগের ব্যয়ের অংশবিশেষ যা সরকার পূরণ করে দেয়, যদি সরকারি শর্ত উদ্যোগ পূরণ করতে সমর্থ হয়।

ii. মেধাসম্পদ (Intellectual Resource) : মেধাসম্পদ বলতে বোঝায় কারবারের এমন এক সম্পদ যা দেখা যায় না বা স্পর্শ করা যায় না অথচ কারবারের অন্তর্নিহিত মূল্য বাড়িয়ে দেয়। সাধারণত উদ্যোগের কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি মেধাসম্পদ বলে গণ্য হয়। এটি হল উদ্যোগের সবকিছুর যোগফল যা উদ্যোগের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এগুলি উদ্যোগের উদ্‌বর্তপত্রে দেখানো হয় না কিন্তু মেধাসম্পদ উদ্যোগকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। বৃহৎ কোম্পানির ক্ষেত্রে মেধাসম্পদ পরিচালনাকে 'জ্ঞান ব্যবস্থাপনা' (kowledge management) হিসাবে অভিহিত করা হয়। বস্তুত উদ্যোগের ক্ষেত্রে এটি 'মেধা মূলধন' (intellectual capital) হিসাবে গণ্য হয়।

iii. মানবিক সম্পদ (Human Resource) : যেকোনো কারবারি উদ্যোগেরই সাফল্য নির্ভর করে উদ্যোগের মানবিক সম্পদের গুণমানের উপর। কারণ নির্ভরযোগ্য হলে উৎপাদনশীলতা যেমন বৃদ্ধি পায় সাথে সাথে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করাও সহজ হয়। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ কর্মীরাই উদ্যোগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেকারণেই উদ্যোগের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যাতে সঠিক কাজের জন্য সঠিক কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগ করা সম্ভব হয়। যদিও একটি নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে খুব বেশি সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হয় না তবুও এমন কর্মী নির্বাচন করতে হবে যাদের মধ্যে 'উচ্চ সম্ভাবনা' (High potentiality) থাকে। সুতরাং উদ্যোগের মানবসম্পদ যেন পরিমাণে বেশি না হয়ে গুণগত মানে ভালো হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হয়।

iv. ভৌত ও বস্তুগত সম্পদ (Physical Resource) : কারবারি উদ্যোগ ছোটো বা বড়ো যাই হোক না কেন তাদের কিছু পরিমাণ ভৌত সম্পদের প্রয়োজন হয় এবং একে পরিকাঠামোগত সম্পদও বলা হয়। ভৌত সম্পদ দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, তার আকার ও আকৃতি থাকে এবং কিছু স্থান জুড়ে থাকে। ঘর-বাড়ি, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যোগাযোগ করার যন্ত্রপাতি, কার্যকরি বিপণন সংক্রান্ত জিনিসপত্র ইত্যাদি। উদ্যোগের সংগৃহীত অর্থের অনেকটাই এইসব ভৌত বা বস্তুগত সম্পদ সংগ্রহের পিছনেই ব্যয় হয়ে যায়। বাস্তবে দেখা গেছে যে অধিকাংশ ছেটো ছোটো উদ্যোগ ভাড়া বাড়িতে বা গ্যারেজে বা খুব ছোটো জায়গা শুরু করা হয়েছে।

v. শিক্ষামূলক সম্পদ (Educational Resources) : একটি নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তা কিছু বাস্তব শিক্ষালাভ করে বা ভবিষ্যতে তাকে উদ্যোগের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। উদ্যোক্তা হিসাবে তার শিল্পোদ্যোগ সম্বন্ধে ধারণা যেমন পরিস্কার হয় তেমনি প্রতিযোগীদের সম্বন্ধেও সে ধারণা পায়। এর ফলে তার কারবারি জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষামূলক সম্পদের উৎসগুলি হল বিভিন্ন বাণিজ্যিক সমিতি (Trade Associations), স্থানীয় চেম্বার অফ্ কর্মাস ইত্যাদি। এছাড়াও উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রশাসনিক সংস্থাগুলি থেকেও বিভিন্ন তথ্য ও পরামর্শ পাওয়া যায় যা শিক্ষামূলক সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়।

vi. আবেগজনিত সম্পদ (Emotional Resource) : মানুষ মাত্রই আবেগপ্রবণ এবং উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। একটি উদ্যোগ গড়ে তোলা অত্যন্ত মানসিক চাপের ব্যাপার। আবেগকে

সংযত রাখার জন্য উদ্যোক্তার প্রয়োজন হল একটি সহায়ক দল তৈরি করা প্রয়োজনে যাতে তারা উদ্যোক্তাকে সঠিক পরামর্শ দিতে সমর্থ হয় ও উৎসাহিত করতে পারে। এই দলে বন্ধু-বান্ধব, পরিবারের সদস্য ও দক্ষ পেশাজীবিদের নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। এভাবে তৈরি দলকেই আবেগজনিত সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়।

vii. নৈতিক সম্পদ (Moral Resource) : নৈতিক সম্পদ গড়ে ওঠে সংহতি বা পারস্পরিক নির্ভরতাজনিত সমর্থন, আইনগত সমর্থন ও সহানুভূতিশীল সমর্থন নিয়ে। এই সম্পদগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া যায় বলে এগুলি সংগ্রহ করা খুব সহজ হয় না।

viii. সাংস্কৃতিক জ্ঞান সম্পদ (Cultural Knowledge Resource) : সাম্প্রতিকালে সাংস্কৃতিক জ্ঞান সম্পদের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সম্পদ খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এরূপ সম্পদের উদাহরণ হল কীভাবে একটি দায়িত্ব পালন করতে হয়, কীভাবে রিপোর্টারদের সাথে একটি আলোচনা চক্র চালানো হয়, কীভাবে একটি সভা অনুষ্ঠিত করা হয়, কীভাবে সংগঠন গড়ে তোলা হয়, কীভাবে বিশ্বব্যাপী জ্ঞাতকরণের অন্তর্জাল (www) অনুসন্ধান করতে হয়, একটি উৎসব কীভাবে শুরু করা হয় ইত্যাদি।

ix. সম্পর্ক ভিত্তিক সম্পদ (Relational Resource) : সম্পর্কভিত্তিক সম্পদের মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে সেগুলি হল ক্রেতা সম্পর্ক, সরবরাহকারী সম্পর্ক, ট্রেড মার্ক বা ট্রেড নাম এবং প্রতিনিধি সম্পর্ক। উদ্যোগের মূল্য বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা অপরিসীম। এর উপর নির্ভর করেই একটি কারবারের সুনাম গড়ে ওঠে। কাজেই সম্পর্কভিত্তিক সুনাম শিরোনাম কারবারের হিসাবে বিশেষ করে উদ্বর্তপত্রে দেখানো হয়।

5.4 সম্পদ সংগ্রহ বা গতিশীলতার গুরুত্ব

একটি কারবারি উদ্যোগ একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ বা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গড়ে ওঠে। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উদ্যোগ বিভিন্ন কার্যকলাপ গ্রহণ করে। এসব কার্যকলাপ সম্পাদন করার জন্য উদ্যোগের বিভিন্ন ধরনের সম্পদের প্রয়োজন হয়। যেহেতু উদ্যোগ একটি কৃত্রিম ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হয় সেকারণে উদ্যোগ নিজে নিজে কোনো কাজ করতে পারে না। তাই তাকে বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ করতে হয় যাদের মধ্যে প্রধান হল বস্তুগত সম্পদ অর্থাৎ কারবারের পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা, আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করার সাথে সাথে আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি ও মানবিক সম্পদ সংগ্রহ করা যাদের সাহায্যে ও যাদের মাধ্যমে কারবারি উদ্যোগ তার কার্যকলাপ সম্পাদন করে। সংগৃহীত সম্পদের গতিশীলতার মাধ্যমে কারবারি উদ্যোগ পণ্য বা সেবার উৎপাদন করে ও ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে সেগুলির বিপণন করে।

সম্পদ সংগ্রহ ও সম্পদের কার্যকরী ব্যবহারই একটি কারবারি উদ্যোগে সাফল্য এনে দেয়। এর গুরুত্ব বোঝার জন্য নীচের যুক্তিগুলি তুলে ধরা হল।

(i) উদ্যোগের সম্পদের বিভিন্নতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধির জন্য সম্পদ গতিশীলতার প্রয়োজন হয়।

(ii) এটি একটি স্বাধীন বাজেট তৈরি করতে সাহায্য করে।

(iii) উদ্যোগের পছন্দসই প্রকল্পে ব্যয় বরাদ্দ করা ও কর্মসূচি সফল করার ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা রয়েছে।

(iv) অন্যদের উপর নির্ভরতা কমায়।

(v) এটি প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে।

(vi) এর মাধ্যমে দেশীয় মূলধন ও প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভব হয়।

(vii) উদ্যোগে যাদের স্বার্থ থাকে তাদের সাথে ও সামগ্রিভাবে সমাজের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়।

(viii) কারবারের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে যার ফলে দীর্ঘকালীন সুবিধা পাওয়া যায়।

সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদ গতিশীলতার বৈশিষ্ট্যসমূহ : সংগৃহীত সম্পদ ও তাদের গতিশীলতার ক্ষেত্রে যেসব বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) সম্পদের সনাক্তকরণ

(ii) সম্পদ সরবরাহকারীর সনাক্তকরণ

(iii) সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি অনুসৃত হয় সেগুলির চিহ্নিতকরণ

(iv) সম্পদ সরবরাহকারীর সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন

(v) সম্পদের সঠিক ব্যবহার

(vi) মানবিক দক্ষতা, সেবা, তথ্য ও যন্ত্রপাতি

(vii) নতুন সম্পদ খুঁজে বের করা

(viii) উদ্যোগের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা

(ix) আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস করা।

5.5 নতুন উদ্যোগের আবাসস্থল ও উপযোগসমূহ

উদ্যোগের সম্পদ সংক্রান্ত পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গেলে উদ্যোক্তা স্পষ্ট ধারণা পায় যে উদ্যোগ গঠনের জন কত পরিমাণ এবং কী ধরনের জায়গা লাগবে। সাথে সাথে তাকে এও স্থির করতে হয় যে উদ্যোগস্থলে কী কী পরিষেবা তথা উপযোগিতা থাকা দরকার। কারণ উদ্যোগ যদি উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত না হয় এবং যেসব সুবিধা কারবার চালাতে গেলে অবশ্যই থাকা দরকার সেগুলির ব্যবস্থা আগাম করা দরকার। কাজেই এই বিষয়গুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। অন্যথায় ভবিষতে কারবার চালিয়ে নিয়ে যাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। কারণ উদ্যোগের জায়গা পরিবর্তন করা সহজ কাজ নয় এবং বারে বারে তা করা সম্ভবও নয়। তাই যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করে স্থান নির্বাচন ও উদ্যোগের জায়গার পরিমাণ স্থির করতে হবে এবং সাথে সাথে এটাও দেখতে হবে যে ওই স্থানে প্রয়োজনীয় পরিষেবার সুবিধা রয়েছে কিনা।

কারবারের অবস্থান ও স্থান নির্বাচন : একটি কারবারি উদ্যোগ যখন গড়ে ওঠে তখন তার অবস্থান ও স্থান বা জায়গা নির্বাচনের সময় নীচের বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হয়। এগুলি হল—

(i) কারবার শৈলী অর্থাৎ চিরাচরিত খুচরা বিপণী নাকি বিশেষত্বসূচক বিপণী, নাকি কিয়স্ক ইত্যাদি।

(ii) উদ্যোগের সম্ভাব্য ক্রেতা কারা, তাদের নৈকট্য এবং কত সহজে তারা কারবারের জায়গায় পৌঁছাতে পারবে।

(iii) কারবারের সামনে হেঁটে চলা লোকেদের সংখ্যা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ।

(iv) গাড়ি, বাইক, সাইকেল ইত্যাদি রাখার সুবিধা।

(v) কারবার যে এলাকায় অবস্থিত সেটি পরিবেশ বান্ধব কিনা।

(vi) কারবার এলাকা কারবার ও ক্রেতাদের পক্ষে নিরাপদ কিনা।

(vii) অন্যান্য কারবার ও বিভিন্ন পরিষেবার অবস্থান কতটা নিকটে।

(viii) কারবারের সরবরাহকারীদের অবস্থান থেকে কারবারের দূরত্ব।

(ix) কী কী পরিকাঠামো তৈরি করার প্রয়োজন পড়বে।

(x) বিভিন্ন পরিষেবা বা সুবিধার অবস্থান ও সে সংক্রান্ত ব্যয়।

(xi) ওই জায়গায় কারবার স্থাপন আইনসম্মত কিনা।

(xii) শ্রমিক, পরিবহণ, জ্বালানি, শক্তি, কাঁচামাল ইত্যাদি সহজলভ্য কিনা।

(xiii) ভবিষ্যতে প্রসারণ করার সম্ভাবনা।

উপযোগিতা বা সুবিধাসমূহ : জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য পরিষেবাগুলিকে এককথায় উপযোগিতা বা সুবিধা বলে গণ্য করা হয়। একটি সফল উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে এগুলির উপস্থিতি আবশ্যিক। উদাহরণস্বরূপ, জল, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কী ধরনের উপযোগিতা উদ্যোগের জন্য প্রয়োজন তা নির্ভর করে কারবারের আকৃতি ও প্রকৃতির উপর। এসব উপযোগিতা কারবারি কার্যকলাপ ভালোভাবে চালাতেই সাহায্য করে না, সাথে সাথে কর্মীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। একটি নতুন উদ্যোগে যেসব উপযোগিতা থাকা অবশ্যই দরকার সেগুলি নীচে উল্লেখ করা হল।

(i) **জল :** নতুন উদ্যোগে যথেষ্ট পরিমাণ জলের ব্যবস্থা থাকা দরকার। জল দু-ভাবে কাজে লাগে—উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এবং কর্মীদের খাওয়া, হাত-মুখ ধোওয়া ও টয়লেট-এর জন্য জল ছাড়া উদ্যোগ একদিনও চলতে পারে না।

(ii) **পয়ঃপ্রণালী :** উদ্যোগের কার্যকলাপের ফলে বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থের উদ্ভব হয়। এছাড়া কর্মীরাও টয়লেটে মল-মূত্র ত্যাগ করে যা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কাজেই পয়ঃপ্রণালীর সুবিধা থাকা দরকার।

(iii) **টেলিযোগাযোগের ব্যবস্থা :** বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে টেলিযোগাযোগ ছাড়া কারবার চালানো কল্পনাই করা যায় না। সেকারণে উদ্যোগে সেসব পরিষেবাজনিত সুবিধা থাকা দরকার সেগুলি হল টেলিফোন, অন্তর্জাল বা ইন্টারনেট, ফ্যাক্স মেশিন ইত্যাদি।

(iv) **বিদ্যুৎ :** বর্তমান যুগে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলে এক পাও চলা যায় না, উদ্যোগের ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালানোর জন্যও বিদ্যুতের প্রয়োজন হতে পারে আবার আলো, পাখা, এসি মেশিন ইত্যাদি চালানোর জন্য বিদ্যুতের দরকার। তাই বিদ্যুতের সুবিধা না থাকলে কারবার গড়ে উঠতে পারে না।

(v) **পার্কিং :** বৃহদায়তন উদ্যেগের ক্ষেত্রে যেমন খুরচা পণ্য বিক্রয়কারী সুপারস্টোর, মল প্রভৃতি জায়গায় ক্রেতার আগমন ঘটে ও তারা দূর-দূরান্ত থেকে এসব জায়গায় জিনিসপত্র ক্রয় করতে আসে। কাজেই তাদের গাড়ি বাইক ইত্যাদি রাখার জন পার্কিং-এর ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

(vi) **ক্যান্টিন :** টিফিন-এর সময় কর্মীরা যাতে খাবার পায় তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তবে ছোটো কারবারে যেখানে কর্মী সংখ্যা কম সেখানে এ ব্যবস্থা না থাকলেও চলে। কিন্তু বড়ো উদ্যোগে যেখানে বহু লোক কাজ করে সেখানে ক্যান্টিনের সুবিধা থাকা আবশ্যক।

(vii) **টয়লেট :** উদ্যোগ-স্থানে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট থাকা আবশ্যিক শর্ত। মৌলিক স্বাস্থ্য কল্যাণ, গোপনীয়তা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য টয়লেট অপরিহার্য এবং টয়লেট অবশ্যই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হবে এবং মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

উপরোক্ত উপযোগ বা পরিষেবা ছাড়াও আরও কিছু পরিষেবা বা সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে কারবারভেদে এসব পরিষেবা কমাতেও পারে বা নাও পারে। উদাহরণস্বরূপ পোশাক পাল্টানোর জন ঘর নার্সিংহোম হাসপাতালের ক্ষেত্রে নার্সদের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু অন্যত্র সেভাবে প্রয়োজন নাও হতে পারে; তেমনি ফটোকপির সুবিধা এল.সি.ডি প্রোজেক্টার, ভিডিও কর্নফারেন্সিং-এ সুবিধা, খাবার ঘর, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি সবক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না।

5.6 বিক্রেতা, সরবরাহকারী, ব্যাঙ্কার, মুখ্য ক্রেতাদের সাথে প্রাথমিক চুক্তি

প্রাথমিক চুক্তি বলতে বোঝায় একটি উদ্যোগ গঠিত হওয়ার আগে অর্থাৎ উদ্যোগ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার জন্য উদ্যোক্তারা যেসব চুক্তি করে। উদাহরণস্বরূপ উদ্যোগ গঠনের জন্য যদি কোনো সম্পত্তি যেমন বাড়ি, কারখানার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য চুক্তি করা হয় বা নতুন কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য চুক্তি করা হয় তাহলে এগুলি এ ধরনের চুক্তির অন্তর্গত। বস্তুত এই স্তরে যেহেতু উদ্যোগ গঠিত হয়নি তাই উদ্যোক্তার সাথেই চুক্তি সম্পন্ন হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত উদ্যোগটি নিবন্ধিত হচ্ছে অর্থাৎ আইনগতভাবে গড়ে উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত এধরনের চুক্তির জন্য উদ্যোগ দায়ী থাকে না। এরূপ চুক্তির আইনগত অবস্থা 1963 সালে Specific Relief Act, 1963 দ্বারা স্থির হয়। এধরনের চুক্তির বৈধতা সংক্রান্ত এই আইনের নির্দেশগুলি তুলে ধরা হল।

(i) 1963 সালের Specific Relief Act প্রবর্তিত হওয়ার আগে এ ধরনের প্রাথমিক চুক্তি বাতিল (void) বলে গণ্য হত। এর ফলে উদ্যোক্তাদের চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে অসুবিধা হত।

(ii) কিন্তু 1963 সালের Specific Relief Act চালু হওয়ার ফলে উদ্যোক্তারা স্বস্তি পায় কারণ 1963 সালের আগে যেসব চুক্তি করা হয়েছিল সেগুলি বৈধ বলে গণ্য হয়।

(iii) বর্তমান আইন অনুসারে কোনো কোম্পানির উদ্যোক্তারা কোম্পানির প্রবর্তন তথ্য নিবন্ধনের আগে যদি কোম্পানির হয়ে এবং কোম্পানির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো ন্যায্য চুক্তি করে থাকে তাহলে কোম্পানি সেই চুক্তি বলবৎ করতে পারে।

চুক্তি অপরিহার্য বিষয়সমূহ : একজন ব্যক্তি বা সংস্থা অপর একজন ব্যক্তি বা সংসথার কাছে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় কারণ বৈধ চুক্তি তাকে আইনানুগ নিরাপত্তা প্রদান করে, এছাড়াও চুক্তির বিষয় সম্পর্কিত একটি পরিস্কার চিত্র তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো দ্রব্য ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহলে চুক্তিতে ওই দ্রব্যের আইনানুগ বিবরণ দিতে হবে যাতে বোঝা যায় যে কোন্ দ্রব্য ক্রয়ের চুক্তি হয়েছে। এছাড়াও যাদের মধ্যে চুক্তি হচ্ছে তাদের নাম এবং লেনদেন তাদের কী ভূমিকা তা সুস্পষ্টভাবে দিতে হবে। এছাড়াও একটি বৈধ চুক্তির ক্ষেত্রে যেসব বিষয় অপরিহার্য বলে গণ্য হয় সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল।

ভারতীয় চুক্তি আইনের 10 ধারা অনুযায়ী সমস্ত সম্মতিই চুক্তি বলে গণ্য হবে যদি—

(i) চুক্তিরত বিভিন্ন পক্ষের চুক্তিতে আবদ্ধ হবার যোগ্যতা থাকে;

(ii) আইনসঙ্গত প্রতিদানের সঙ্গে সম্মতি বা সায় স্বেচ্ছাপ্রদত্ত হয়;

(iii) সম্মতির বিষয়বস্তুর বৈধতা থাকে; এবং

(iv) যদি সেই সম্মতি সরাসরি বাতিল বলে ঘোষিত না হয়।

অর্থাৎ কোনো সম্মতি যদি কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পালন করতে পারে, তবেই সেই সম্মতি আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হয়ে চুক্তিতে পরিণত হয়। যে নির্দিষ্ট শর্তগুলি পূরণের ফলে কোনো সম্মতি চুক্তি বলে গণ্য হতে পারে, সেই শর্তসমূহকে চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বলা হয়। চুক্তির উপাদানগুলি নীচের রেখাচিত্রে দেখানো হল :

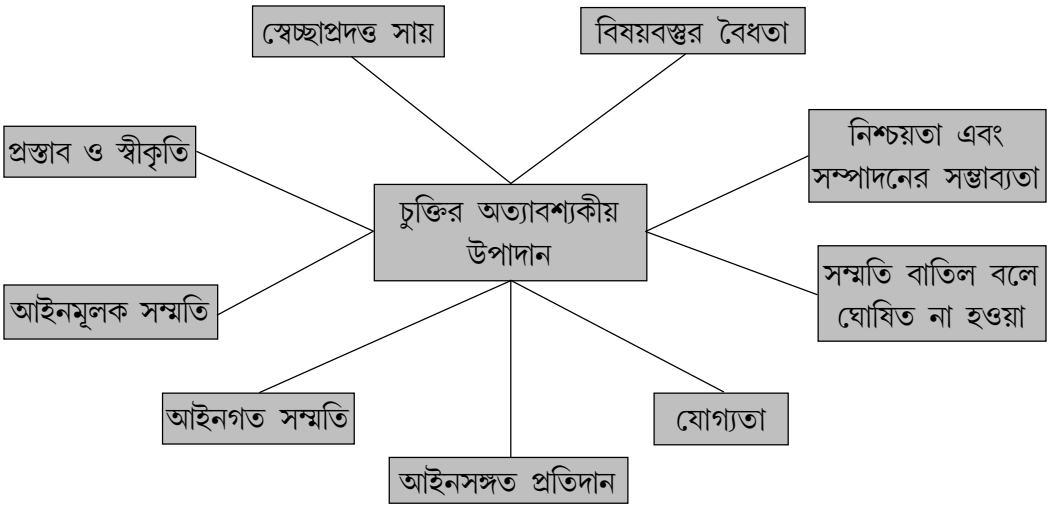

উপরের রেখাচিত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি নীচে বিশদভাবে আলোচনা করা হল :

1. প্রস্তাব বা স্বীকৃত (Offer and Acceptance) : চুক্তির উৎপত্তির জন্য ন্যূনতম দুটি পক্ষ থাকা প্রয়োজন। এদের মধ্য এক পক্ষ প্রস্তাব দেয় এবং অপর পক্ষ সেই প্রস্তাব স্বীকার করে। এই প্রস্তাবটি সুনিশ্চিত (Definite) হতে হবে এবং প্রস্তাবের স্বীকৃতিও নিঃশর্ত এবং সম্পূর্ণ (Unqualified and absolute) হতে হবে। চুক্তি গঠনের জন্য এই ধরনের প্রস্তাব ও তার স্বীকৃতি আইনসঙ্গত হতে হবে এবং চুক্তি আইনে প্রস্তাব ও স্বীকৃতি সম্বন্ধে যেসব নিয়মকানুন আছে, সেই সব নিয়ম অনুসারেই প্রস্তাব এবং স্বীকৃতি সম্পাদিত হতে হবে।

2. আইনমূলক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা (Intention to create legal relationship) : যখন দুটি পক্ষ চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন অবশ্যই তাদের মধ্যে পারস্পরিক আইনগত সম্পর্ক গড়ে তোলার ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। আইনমূলক সম্পর্ক বলতে পারস্পরিক দায় এবং অধিকারের সম্পর্ককে বোঝায়। যদি তাদের মধ্যে এই সম্পর্ক গড়ে তোলার কোনো অভিপ্রায় না থাকে, তবে তাদের মধ্যে কোনো চুক্তি হওয়া সম্ভব নয়।

কোনো সামাজিক সম্মতি (Social agreement) যেহেতু দুটি পক্ষে মধ্যে কোনো আইনমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে না, সেজন্য এগুলি চুক্তি হতে পারে না।

বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যে সমস্ত সম্মতি (Agreement) গড়ে ওঠে, সেসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক গড়ে তোলার অভিপ্রায় থাকে।

আবার বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক সম্মতি হওয়া সত্ত্বেও তা চুক্তি বলে বিবেচিত নাও হতে পারে, যদি দেখা যায় যে সম্মতির বিভিন্ন পক্ষ আদৌ নিজেদের মধ্যে আইনমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে উৎসাহী নয়।

3. আইনসঙ্গত প্রতিদান (Lawful consideration) : 'প্রতিদান' কথাটির অর্থ হল কোনো সুবিধা বা লাভ যা এক পক্ষের কাছ থেকে অপর পক্ষের কাছে যায়। কোনো 'সম্মতি' আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য হয়ে চুক্তিতে পরিণত হওয়ার জন্য চুক্তিসংশ্লিষ্ট প্রতিটি পক্ষকেই কিছু দিতে হবে এবং তার পরিবর্তে অপর পক্ষের কাছ থেকে কিছু পেতে হবে। চুক্তি বাবদ এই 'যা কিছু দেওয়া হল' বা 'যা কিছু পাওয়া গেল', তাকেই বলে প্রতিদান। এই প্রতিদান যে টাকা বা কোনো দ্রব্য হতে হবে তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন, কোনো কাজ করা বা কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকা বা কোনো কাজ না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া, এগুলিও প্রতিদান হিসেবে গণ্য হয়। তবে এই প্রতিদান অবশ্যই আইনসঙ্গত হওয়া চাই। কোনো কিছু না পেয়ে কোনো কাজ করার বা কোনো কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সাধারণত আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য নয় [Abdul Aziz vz Masum Ali (1974)]।

4. পক্ষগণের যোগ্যতা (Capacity to the parties) : চুক্তি আইনের 11 এবং 12 ধারায় বলা হয়েছে যে চুক্তি করার জন্য চুক্তির বিভিন্ন পক্ষের কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। সবাই চুক্তি করতে পারে না। চুক্তি আইন অনুসারে চুক্তির পক্ষগণ নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করতে পারলে তবেই চুক্তি করার যোগ্য বলে গণ্য হয়। অর্থাৎ, সেই ব্যক্তিই চুক্তি করতে পারে যে—

(i) প্রাপ্তবয়স্ক (Major) :

(ii) সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (Sound Mind) :

(iii) আইনের দ্বারা চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত নয় (Not disqualified from contracting by any law to which he is subject)।

অন্যভাবে বলা যা যে, কিছু বিশেষ ক্ষেত্র বাদে অপ্রাপ্তবয়স্ক, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, উন্মত্ত বা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিরা এবং আইনানুসারে চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য ব্যক্তিরা চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না।

5. প্রকৃত এবং স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সায় (Free and genuine consent [ধারা 13 এবং 14]) : চুক্তি সম্পাদনের জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সায়। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি, যে যে বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে সেই সব বিষয়ে, একই সময়ে, একই অর্থে যদি একমত হয়, তখন বলা হয় যে তারা স্বেচ্ছাপ্রদত্তভাবে সায় দিয়েছে। যদি বলপ্রয়োগ (Coercion), অনুচিত প্রভাব (undue influence). প্রতারণা (Fraud), মিথ্যা বর্ণনা (Misrepresentation), ভুল (Mistake) ইত্যাদির দ্বারা সায় প্রদত্ত হয় তখন তাকে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সায় হিসেবে গণ্য করা হয় না।

6. বিষয়বস্তুর বৈধতা (Lawful object [ধারা 23]) : চুক্তির বিষয়বস্তু অবশ্যই আইনসঙ্গত এবং বৈধ হওয়া প্রয়োজন। অন্যভাবে বলা যায় যে, সম্মতির বিষয়বস্তু কখনোই অবৈধ, নীতিবিগর্হিত বা জনস্বার্থের বিরোধী হতে পারবে না। কেন না এসব ক্ষেত্রে ঐ সম্মতি আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়।

7. সম্মতি বাতিল ঘোষিত না হওয়া (Agreement declared not viod [ধারা 24-30]) : চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে দেখা দরকার যে সম্মতি যেন দেশের আইনে বাতিল বলে ঘোষিত না হয়। ভারতীয় চুক্তি আইনে নিম্নলিখিত পাঁচ ধরনের সম্মতি বাতিল বলে ঘোষিত :

(i) বিবাহ-প্রতিবন্ধক সম্মতি [ধারা 26];

(ii) বাণিজ্য-প্রতিবন্ধক সম্মতি [ধারা 27];

(iii) মামলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি [ধারা 28];

(iv) অনিশ্চিত সম্মতি [ধারা 29];

(v) বাজি ধরার সম্মতি [ধারা 30];

8. নিশ্চয়তা (Certainty [ধারা 29]) : চুক্তির অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। সম্মতির মধ্যে কোনোরকম অনিশ্চয়তা বা অস্পষ্টতা থাকলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হয় না। যদি সম্মতি অনিশ্চিত এবং অস্পষ্ট হয় বা সম্মতির অর্থ বোঝা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে সেই সম্মতি কখনোই আইনের দ্বারা কার্যকরী হয় না। নীচের উদাহরণে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল।

9. সম্পাদনের সম্ভাব্যতা (Possibility of performance [ধারা 56]) : যে কাজ করা অসম্ভব তা সম্পাদন করার সম্মতি নিষ্ফল বলেই বিবেচিত হয়। অসম্ভব কোনো বিষয় বা কাজ সম্পাদন করার জন্য কোনো সম্মতি আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হয় না। সম্মতির বিষয়বস্তু সম্পাদনযোগ্য হওয়া দরকার।

10. আইনগত প্রক্রিয়া (Legal formalities [ধারা 10]) : চুক্তি লিখিত বা মৌখিক হতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চুক্তি লিখিত হয়। আবার আইনগত দিক থেকে

কোনো কোনো সময়ে চুক্তি নিবন্ধনের (Registration) প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে চুক্তির আইনগত প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হয়। এখানে আইনগত প্রক্রিয়া বলতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন, যথাযথ স্বাক্ষর ইত্যাদিকে বোঝানো হয়।

চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ নীতিসমূহ : একটি চুক্তির সৃষ্টি হয় যখন দু-জন ব্যক্তি পরস্পরের জন্য কিছু করতে সম্মত হয় এবং এদের 'চুক্তিবদ্ধ পক্ষ' বলা হয়। এরা কোনো ব্যক্তিবিশেষ হতে পারে বা ব্যাঙ্কার, ক্রেতা, ডিলার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কিছু মানুষের গোষ্ঠী বা কোনো কারবারের প্রতিনিধিও হতে পারে। সাধারণভাবে চুক্তির জন্য একটি দলিল তৈরি করা হয় যাতে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর করে। মৌখিক চুক্তিও আইনানুসারে বৈধ হয়। তবে কারবারি ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তিই করা হয় কারণ ভবিষ্যতে যদি দু-পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে লিখিত চুক্তি সেই নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে। আবার এমন কিছু চুক্তি আছে যেগুলি অবশ্যই লিখিত হতে হবে এবং আরও কিছু অতিরিক্ত শর্তপূরণ করলে তবেই চুক্তিটি বৈধ বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ-1. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোনো চুক্তি হলে তা অবশ্যই লিখিত হতে হবে।

উদাহরণ-2. একটি সম্পত্তির বান্ধকি চুক্তি আবশ্যিকভাবে লিখিত হবে এবং 'নোটারি' দ্বারা প্রস্তুত হতে হবে।

আবার, কিছু ক্ষেত্রে আইন লিখিত চুক্তির কথা না বললেও উদ্যোক্তাদের উচিত হল চুক্তি লিখিত আকারে করা। কেননা মৌখিক চুক্তির ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে চুক্তি সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যা দেখা দিলে সমস্যা সমাধান জটিল হয়ে পড়ে কারণ—চুক্তির দু-পক্ষও পৃথক মতামত পোষণ করে। তাই চুক্তির সাধারণ নীতিটি হল যে বাণিজ্যিক চুক্তি লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং চুক্তি লিখিত হলে ভবিষ্যতে চুক্তি সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে না বা সমস্যা দেখা দিলেও তা সহজেই নিরসন করা যায়। বাস্তবক্ষেত্রে উদ্যোক্তা যখন বিক্রেতা, ক্রেতা, ব্যাঙ্কার, সরবরাহকারী ইত্যাদির সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায় সেক্ষেত্রে চুক্তি সংক্রান্ত নীচের বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। এই বিষয়গুলি হল নিম্নরূপ :

(i) চুক্তিতে চুক্তির বিষয়সমূহ অবশ্য সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে। চুক্তির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জায়গা থাকা চলবে না এবং পরিস্কারভাবে চুক্তির শর্তসমূহ উল্লেখ করতে হবে।

(ii) চুক্তির মধ্যে এমন কোনো বিষয় থাকবে না যা অনির্দিষ্ট বা কোনো পক্ষের দায় অসীম। এছাড়াও চুক্তিতে এমন কোনো শর্ত থাকবে না যা অস্বাভাবিক চরিত্রের। এরকম কোনো শর্ত থাকলে উভয়পক্ষের আগাম অনুমতি থাকতে হবে।

(iii) চুক্তির শর্তগুলি যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যেখানে সম্ভব সাধারণ ও বিশেষ শর্তগুলি একটি প্রমাণ আকৃতির চুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা বাঞ্ছনীয়।

(iv) যেক্ষেত্রে প্রমাণ আকৃতির চুক্তি ব্যবহার করা হয় না সেক্ষেত্রে আইনত ও আর্থিক পরামর্শ নিয়ে চুক্তির বিষয়গুলি চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় এবং চুক্তিতে উভয়পক্ষের সম্মতিসূচক স্বাক্ষরের আগেই ওই পরামর্শ নিতে হবে।

(v) চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আগেই উদ্যোক্তাকে চুক্তিপত্রের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় ভালোভাবে জানতে হবে এবং দেখতে হবে যে চুক্তির বৈধতা যেন সুনিশ্চিত হয়।

(vi) চুক্তিবদ্ধ কোনো পক্ষ যদি পরবর্তীকালে চুক্তি পালনে অস্বীকার করে এবং আদালতে মামলা হয় তাহলে চুক্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় হল যদি মামলাকারী ঈশ্বরের কাজ (Act of God) প্রমাণ করতে পারে অর্থাৎ যে কাজ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। অবশ্য চুক্তিতে যদি উল্লেখ থাকে যে 'ঈশ্বরের কাজ'-এর উদ্ভব হলেও চুক্তির দায় নিষ্কৃতি হবে না তাহলে মামলাকারী তার দায় অস্বীকার করতে পারে না।

(vii) সাধারণভাবে একটি চুক্তি বাতিল হতে পারে না। তবে কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে চুক্তি বাতিল বা রদ হতে পারে যদি চুক্তিবদ্ধ কোনো পক্ষের চুক্তি করার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে গণ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ একজন নাবালক বা উন্মাদ বা দেউলিয়া ব্যক্তি চুক্তি করার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে গণ্য হয় এবং এরূপ ব্যক্তি চুক্তির পক্ষ হলে সেই চুক্তি গোড়া থেকেই বাতিল বলে গণ্য হয় (void abinitio)।

(viii) যদি কোনো চুক্তি বাতিল হয় তাহলে চুক্তির উভয়পক্ষ পূর্ব অবস্থায় ফিরে যায় অর্থাৎ তারা চুক্তি সম্পাদনের আগে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায়। কারণ চুক্তি বাতিল হলে চুক্তির আর কোনো অস্থিত্ব থাকে না। এমতাবস্থায় উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তি সংক্রান্ত যেসব লেনদেন ঘটেছিল তা ফেরত দিতে হয়।

(ix) সাধারণভাবে একটি চুক্তি উভয়পক্ষের আলোচনা ও সম্মতির মাধ্যমে চূড়ান্ত হয়। কিন্তু ভোগ্যপণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার কোনো সুযোগ থাকে না। এরূপক্ষেত্রে ক্রেতা/ভোক্তার নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থাও আইনে আছে. এধরনের চুক্তিতে যদি অন্যান্য কোনো শর্ত বিক্রেতা উল্লেখ করে তাহলে সেগুলি বাতিল বলে গণ্য হয় এবং এ ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রমাণ আকৃতির চুক্তির (Standard form of contract) নীতি অনুসৃত হয়।

5.7 সারাংশ

এই এককটি পড়ে আপনারা যে সমস্ত বিষয়গুলি জানতে পারলেন তা হল—

- সম্পদ সংগ্রহ-এর অর্থ ও সংজ্ঞা।
- সম্পদ সংগ্রহ বা গতিশীলতার ধরন এবং গুরুত্ব।
- নতুন উদ্যোগের আবাসস্থল ও উপযোগসমূহ।
- বিক্রেতা, সরবরাহকারী, ব্যাঙ্কার, মুখ্য ক্রেতাদের সাথে প্রাথমিক চুক্তি।

5.8 প্রশ্নাবলী

ক. এমসিকিউ প্রশ্নাবলি

1. সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্য হিসাবে নীচের কোন বক্তব্যটি সঠিক?
   (ক) উদ্যোগের প্রয়োজনীয় সম্পদ সঠিক সময়ে ও সঠিক ব্যয়ে সংগ্রহ করা ও সুষম উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করা
   (খ) সম্পদের মাধ্যমে কারবারি কার্যকলাপ চালানো
   (গ) মুনাফা অর্জন
   (ঘ) কোনোটিই নয়
2. নীচের কোনটি উদ্যোগের সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়?
   (ক) আর্থিক সম্পদ (খ) বস্তুগত সম্পদ
   (গ) শ্রমিক ও কর্মচারী (ঘ) সবগুলিই
3. উদ্যোগের সম্পদগুলির মধ্যে মূল সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়—
   (ক) আর্থিক সম্পদ (খ) মানবিক সম্পদ
   (গ) বস্তুগত সম্পদ (ঘ) সবগুলিই
4. উদ্যোগের সম্পদগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদটি হল—
   (ক) বস্তুগত সম্পদ (খ) আর্থিক সম্পদ
   (গ) মানবিক সম্পদ (ঘ) অলীক সম্পদ
5. নীচের কোনটি উদ্যোগের ভৌত সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়?
   (ক) অর্থ (খ) শ্রমিক
   (গ) কাঁচামাল (ঘ) সুনাম
6. নীচের কোন উৎসটি থেকে নতুন উদ্যোগের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা হয়?
   (ক) ভালোবাসার অর্থ (খ) উদ্যোগ মূলধন
   (গ) দেবদূত লগ্নিকারী (ঘ) সবগুলিই
7. দেবদূত লগ্নিকারী বলতে বোঝায়—
   (ক) যারা চড়া সুদে ঋণ দেয়
   (খ) যারা অর্থের বিনিময়ে উদ্যোগের অংশীদার হয়
   (গ) যেসব বিত্তশালী ব্যক্তি তাদের সঞ্চিত অর্থ নতুন উদ্যোগে লগ্নি করতে চায়
   (ঘ) কোনোটিই নয়

8. কারবারি ইনক্যুবেটর বলতে কী বোঝোয়?
   (ক) উদ্যোগে প্রযুক্তিগত সুবিধা দানের যন্ত্র
   (খ) যেসব প্রতিষ্ঠিত কারবার নতুন উদ্যোগকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে
   (গ) সরকারি সহায়তা প্রদান
   (ঘ) সবগুলিই
9. উদ্যোগের মেধাসম্পদ বলতে কী বোঝোয়?
   (ক) মেধা দ্বারা গঠিত সম্পদ
   (খ) উদ্যোগের কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি
   (গ) যে সম্পদ খালি চোখে দেখা যায় না
   (ঘ) যে সম্পদ খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়
10. বড় বড় কোম্পানির ক্ষেত্রে মেধা সম্পদ পরিচালনাকে কী বলা হয়?
   (ক) মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা (খ) কর্মী ব্যবস্থাপনা
   (গ) জ্ঞান ব্যবস্থাপনা (ঘ) কোনোটিই নয়
11. নৈতিক সম্পদের উপাদান হিসাবে নীচের কোনটি গণ্য হয়?
   (ক) সংহতি বা পারস্পরিক নির্ভরতার সমর্থন
   (খ) আইনগত সমর্থন
   (গ) সহানুভূতির সমর্থন
   (ঘ) সবগুলিই
12. নীচের কোনটি সম্পদ সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হয়?
   (ক) সম্পদের সনাক্তকরণ (খ) সম্পদ সরবরাহকারীর সনাক্তকরণ
   (গ) আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস করা (ঘ) সবগুলিই
13. উদ্যোগের অবস্থান বা স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলির মধ্যে নীচের কোনটি নয়?
   (ক) ধরন
   (খ) সহজগম্যতা
   (গ) নিজস্ব জায়গা না লীজে নেওয়া জায়গায় উদ্যোগ স্থাপিত হবে
   (ঘ) সবগুলিই
14. সম্পর্কভিত্তিক সম্পদের উপাদান নয় নীচের কোনটি?
   (ক) ক্রেতা সম্পর্ক (খ) সরবরাহকারীর সম্পর্ক
   (গ) প্রতিযোগী সম্পর্ক (ঘ) প্রতিনিধি সম্পর্ক

15. সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদ গতিশীলতার গুরুত্ব বোঝাতে নীচের কোনটি প্রাসঙ্গিক?
    (ক) বাজেট তৈরিতে সাহায্য করে
    (খ) দেশীয় মূলধন ও প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভব হয়
    (গ) অন্যদের উপর নির্ভরতা কমায়
    (ঘ) সবগুলিই
16. নীচের কোনটি উদ্যোগের উপযোগিতা বা সুবিধা হিসাবে গণ্য হয় না?
    (ক) জল (খ) বিদ্যুৎ
    (গ) বন্দর (ঘ) পয়ঃপ্রণালী
17. উদ্যোগের উপযোগিতা বা সুবিধাসমূহ প্রত্যক্ষ প্রভাব হিসাবে নীচের কোনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ?
    (ক) ব্যয় বৃদ্ধি ঘটায়
    (খ) উদ্যোগ উন্নয়নে সাহায্য করে
    (গ) উদ্যোগের কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে
    (ঘ) কোনোটিই
18. বিক্রেতা, সরবরাহকারী, ব্যাঙ্কার, মুখ্য ক্রেতা ইত্যাদির সাথে প্রাথমিক চুক্তি ভারতীয় চুক্তি আইন ছাড়াও অন্য কোন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?
    (ক) Negotiable Instruments Act (খ) Specific Relief Act
    (গ) Indian Partnership Act (ঘ) কোনোটিই নয়
19. চুক্তির অপরিহার্য বিষয় হিসাবে নীচের কোনটি প্রাসঙ্গিক?
    (ক) প্রতিদান (খ) আইনগত বৈধতা
    (গ) চুক্তি করার সামর্থ্য (ঘ) সবগুলিই
20. মৌখিক চুক্তি আইনানুসারে——নীচের বিকল্প থেকে শূন্যস্থানটি পূরণ করো।
    (ক) অবৈধ (খ) বৈধ
    (গ) বাতিলযোগ্য (ঘ) কোনোটিই নয়
21. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি কীরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়?
    (ক) মৌখিক চুক্তি (খ) লিখিত চুক্তি
    (গ) লিখিত ও নিবন্ধিত (ঘ) কোনোটিই নয়
22. একটি সম্পত্তির বন্ধকী চুক্তি কী ধরনের হওয়া উচিত?
    (ক) মৌখিক
    (খ) লিখিত

(গ) লিখিত এবং নোটারি দ্বারা প্রস্তুত হতে হবে

(ঘ) সবগুলিই

23. চুক্তির মধ্যে এমন কোনো বিষয় থাকবে না যা—

(ক) অনির্দিষ্ট (খ) কোনো পক্ষের দায় অসীম

(গ) অস্বাভাবিক চরিত্রের (ঘ) সবগুলিই

24. চুক্তিবদ্ধ কোনো পক্ষ পরবর্তীকালে চুক্তি পালনের দায় অস্বীকার করলে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে—

(ক) চুক্তিটি অপ্রবর্তনীয় (খ) চুক্তিপালন অসম্ভব

(গ) ঈশ্বরের কাজ (ঘ) সবগুলিই

25. একটি চুক্তি গোড়া থেকেই বাতিল বলে গণ্য হয় যদি চুক্তির কোনো পক্ষ—

(ক) সাবালক হয় (খ) সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ হয়

(গ) নাবালক হয় (ঘ) ওই ব্যক্তি আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়

26. চুক্তি বৈধ হলে প্রতিদান অবশ্যই থাকতে হবে এবং প্রতিদান অবশ্যই হবে—

(ক) অর্থ দিয়ে (খ) বস্তুগত দ্রব্যে

(গ) অংশত অর্থ ও অংশত বস্তুগত দ্রব্যে (ঘ) কোনোটিই নয়

27. কখন প্রমাণ আকৃতির চুক্তির নীতি আবশ্যিকভাবে অনুসৃত হয়?

(ক) ভোগ্যপণ্যের চুক্তির ক্ষেত্রে (খ) বাড়ি বন্ধকের চুক্তির ক্ষেত্রে

(গ) লটারি, বাজি ইত্যাদি চুক্তির ক্ষেত্রে (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর:

1. (ক)	2. (ঘ)	3. (ঘ)	4. (খ)	5. (গ)	6. (ঘ)
7. (গ)	8. (খ)	9. (খ)	10. (গ)	11. (ঘ)	12. (ঘ)
13. (ঘ)	14. (গ)	15. (গ)	16. (ঘ)	17. (গ)	18. (খ)
19. (ঘ)	20. (ঘ)	21. (খ)	22. (খ)	23. (গ)	24. (ঘ)
25. (গ)	26. (গ)	27. (ক)			

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. সম্পদ সংগ্রহ কাকে বলে?
2. মেধা সম্পদ কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
3. নৈতিক সম্পদ কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
4. মানবিক সম্পদ বলতে কী বোঝায়?
5. আর্থিক সম্পদ সংগ্রহের যেকোনো দুটি উৎস উল্লেখ করুন।

6. উদ্যোগ মূলধন বলতে কী বোঝায়?
7. দেবদূত লগ্নিকারী বলতে কী বোঝায়?
8. আবেগজনিত সম্পদ কাকে বলে?

গ. দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. সম্পদ সংগ্রহের বিভিন্ন ধরন আলোচনা করুন।
2. সম্পদ সংগ্রহের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
3. নতুন উদ্যোগের আবাসস্থল ও উপযোগসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
4. চুক্তির অপরিহার্য বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।
5. চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ নীতিসমূহ আলোচনা করুন।
6. সম্পদ গতিশীলতার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

একক-6 ❑ ভারতবর্ষে পারিবারিক কারবারি উদ্যোগ (Family business in India)

গঠন

6.0 উদ্দেশ্য

6.1 প্রস্তাবনা

6.2 পারিবারিক কারবার—অর্থ ও সংজ্ঞা

6.3 ভারতবর্ষে পারিবারিক ব্যবসা বা উদ্যোগের ভূমিকা

6.4 পারিবারিক কারবারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

6.5 ভারতের সমকালীন রোল মডেলসমূহ—তাদের মূল্যবোধ, কারবারি দর্শন ও আচরণগত অভিযোজন

6.6 পারিবারিক কারবারি উদ্যোগে বিরোধ বা দ্বন্দ

6.6.1 পারিবারিক কারবারে বিরোধের কারণ বা উৎসসমূহ

6.6.2 পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তি

6.7 সারাংশ

6.8 প্রশ্নাবলী

6.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন—

- পারিবারিক কারবারের অর্থ ও সংজ্ঞা
- ভারতবর্ষে পারিবারিক ব্যবসা বা উদ্যোগের ভূমিকা
- পারিবারিক কারবারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
- ভারতের সমকালীন রোল মডেলসমূহ
- পারিবারিক কারবারি উদ্যোগে বিরোধ এবং এই বিরোধের নিষ্পত্তি

6.1 প্রস্তাবনা

পরিবার ও ব্যবসায় শব্দ দুটি প্রাচীনকাল থেকেই সমকালীন। পরিবার যেখানে প্রাচীনতম টিকে থাকা সামাজিক ব্যবস্থা (Social system) সেখানে কারবার বা ব্যবসা হল প্রাচীনতম টিকে থাকা অর্থনৈতিক

ব্যবস্থা (Economic system)। ব্যবসার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পৃথিবীর সবদেশেই এ ধরনের পারিবারিক ব্যবসা গড়ে উঠেছে এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP), কর্মসংস্থানে ও রপ্তানিতে এদের অবদান অপরিসীম। যদিও দেশ-ভেদে এদের সংখ্যা বিভিন্ন তবুও দেশের মোট কারবারি সংস্থার প্রায় 60 শতাংশ পারিবারিক ব্যবসা এবং এরা Fortune 500 তালিকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান দখল করে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারের মালিকানায় পরিচালিত কারবারের সংখ্যা প্রায় 80 শতাংশ এবং ওই দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) 40 শতাংশ উৎপাদন পারিবারিক উদ্যোগ থেকে আসে। 1965 সালে কেন্দ্রীয় সরকারের এক সমীক্ষায় ভারতের বেসরকারি উদ্যোগ ক্ষেত্রে 75টি বৃহদাকার পারিবারিক উদ্যোগকে চিহ্নিত করেছিল যারা 1536টি কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং এই ক্ষেত্রের 47 শতাংশ সম্পদের মালিকানা ও আদায়ীকৃত মূলধনের 44 শতাংশ এদের মালিকানায় ছিল। পারিবারিক ব্যবসায় বা উদ্যোগের উপস্থিতি প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বের সব দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। 80 শতাংশের বেশি ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হয় পারিবারিক উদ্যোগে। বিশ্বের মোট কর্মসংস্থানের 50 শতাংশ এবং বিশ্বের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের 40 থেকে 50 শতাংশ পারিবারিক উদ্যোগ থেকে আসে। প্রামাণ্য তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের প্রাচীনতম পারিবারিক কারবারটি হল 'কঙ্গো গুমি' (Kongo Gumi) নামে একটি জাপানি কোম্পানি যা 578 খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠেছিল এবং কোম্পানিটি বর্তমানে 40 প্রজন্মের বংশধরের দ্বারা এখনও পরিচালিত হচ্ছে। নীচে বিশ্বের কয়েকটি বিখ্যাত পারিবারিক ব্যবসা টেবিলাকারে তুলে ধরা হল :

নাম	দেশ	বাৎসরিক আয়	পরিবার
1. ওয়াল মার্ট	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA)	245 বিলিয়ন ডলার	স্যাম ওয়াল্টার
2. স্যামসাঙ গোষ্ঠী	দক্ষিণ কোরিয়া	99 বিলিয়ন ডলার	লী (Lee) পরিবার
3. ফ্ল্যাট গোষ্ঠী	ইতালি	55 বিলিয়ন ডলার	অ্যাগচেল পরিবার
4. ম্যাককেন ফুড্স	কানাডা	3.5 বিলিয়ন ডলার	ম্যাক্কেন পরিবার
5. টাটা গোষ্ঠী	ভারতবর্ষ	7.9 বিলিয়ন ডলার	টাটা পরিবার

এই এককটিতে পারিবারিক কারবারের অর্থ ও সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, ভারতে পারিবারিক উদ্যোগের ভূমিকা, ভারতের সমকালীন রোল মডেলসমূহ, পারিবারিক কারবারি উদ্যোগে বিরোধ এবং সেই বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

6.2 পারিবারিক কারবার—অর্থ ও সংজ্ঞা

বিশ্বে অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও পারিবারিক উদ্যোগে বহু কারবারি সংস্থা প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছে। পারিবারিক উদ্যোগ বা কারবার বোঝাতে বিভিন্ন শব্দবন্ধের প্রয়োগ হতে দেখা যায়। এই প্রতিশব্দগুলি হল 'পারিবারিক মালিকানা', 'পরিবার নিয়ন্ত্রিত', 'পরিবার পরিচালিত', 'বিজনেস হাউসেস', 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসেস' ইত্যাদি কারবারি সংস্থা।

পারিবারিক উদ্যোগে গঠিত কারবারের যেসব সংজ্ঞা পাওয়া যায় তাদের দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়—পরিকাঠামোগত সংজ্ঞা ও প্রক্রিয়াগত সংজ্ঞা। **পরিকাঠামোগত সংজ্ঞার** (Structured definition) কয়েকটি নীচে তুলে ধরা হল—

বেরী (Baury) প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হল যে, 'কারবারের মালিকানা একটি মাত্র পরিবারের উপর ন্যস্ত থাকলে তাকে পারিবারিক কারবার বলা হয়।'

রোসেন ব্লাট, ডে মিক, অ্যান্ডারসন ও জনসন (Rosenblate, De Mik, Anderson and Johnson) বলেছেন—'যে কারবারের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানা একটিমাত্র পরিবারের থাকে এবং কারবারের কাজকর্মে অন্তত দুজন সদস্য যুক্ত থাকে তাই হল পারিবারিক কারবার।'

লীচ (Leach) প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'যে কারবারে একটিমাত্র পরিবার কার্যকরভাবে কারবার নিয়ন্ত্রণ করে এবং 50 শতাংশের বেশি ভোটাধিকার থাকে এবং সংস্থার উচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপনা পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠে তাই হল পারিবারিক কারবার।'

অন্যদিকে **প্রক্রিয়াগত** সংজ্ঞায় কীভাবে একটি পরিবার কারবারে জড়িত হয় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নীচের সংজ্ঞাগুলি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া হয়েছে।

আর. জি. ডোনেলি (R. G. Donneley)-এর মতানুসারে 'পারিবারিক কারবার হল এমন এক সংস্থা যা পরিবারের অন্তত দুটি প্রজন্ম ওই কারবারের সাথে যুক্ত থাকে এবং সংস্থার নীতিকে প্রভাবিত করে ও সাথে সাথে পরিবারের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে।'

পি. ডেভিস (P. Davis) পারিবারিক উদ্যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'যখন কারবারের নীতি এবং সিদ্ধান্ত পরিবারের একাধিক সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন তাকে পারিবারিক উদ্যোগ বা কারবার বলে। এই প্রভাব সদস্যরা মালিকানা মাধ্যমে বা ব্যবস্থাপনায় যুক্ত থাকার ফলে প্রয়োগ করে। এটি পরিবার ও কারবার এই দু-ধরনের সংগঠনের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠে যা হল পারিবারিক কারবারের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে সংক্ষিপ্ত ও সরলভাবে পারিবারিক কারবারের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়, যে কারবার পরিবারের দুই বা ততোধিক সদস্যদের দ্বারা গড়ে ওঠে ও যাদের হাতে কারবারের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ থাকে। অন্যভাবেও বলা যায় যে, পারিবারিক কারবার হল যে কারবারের মালিকানা অথবা ব্যবস্থাপনা একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে।

6.3 ভারতবর্ষে পারিবারিক ব্যবসা বা উদ্যোগের ভূমিকা

ভারতবর্ষে পারিবারিক উদ্যোগে কারবার বা ব্যবসা গড়ে তোলাই প্রাচীন পদ্ধতি। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যে সব উদ্যোগ গড়ে উঠেছে তাদের বেশিরভাগই পরিবারের সাহায্য ও সমর্থনে গড়ে উঠেছে। পরিবারের প্রয়োজনে, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এবং পরিবারের সদস্যদের পরিচালনায় ওইসব উদ্যোগ গড়ে উঠেছিল। টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, থাপার, সিংহানিয়া, আম্বানি, আদানি, ডালমিয়া প্রভৃতি পরিবার সফল পারিবারিক উদ্যোগ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল।

পারিবারিক কারবার বা উদ্যোগের উৎস সন্ধান করলে দেখা যায় যে প্রাচীনকালের 'বাজার পদ্ধতি' (bazar system) পারিবারিক উদ্যোগ গঠনে সাহায্য ও সহায়তা করেছে। প্রাথমিকভাবে পারিবারিক কারবার পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও টাকা দাদন দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ছিল। এধরনের কারবার কয়েকটি বিশেষ সম্প্রদায় যেমন উত্তর ভারতে জৈন এবং মাড়ওয়ারিদের দ্বারা গড়ে উঠেছিল। তবে পারিবারিক উদ্যোগে শিল্পসংস্থা গড়ে তুলতে দেখা যায় আধুনিককালেই—ব্রিটিশ রাজত্বকালে ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে।

কাওয়াসজি দাভর (Cawasji Davar) 1854 সালে প্রথম একটি কাপড়ের কল স্থাপন করেন অধুনা মুম্বাইতে। এর ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কিছু ব্যবসায়িক সম্প্রদায় মুম্বাই ও আমেদাবাদে কিছু বস্ত্র বয়ন কারখানার পত্তন করেন। এই সময়ে যেসব ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল তাদের মধ্যে উত্তর ভারতে আগরওয়াল ও গুপ্তা, দক্ষিণে ছেটিয়ার, পশ্চিম ভারতে পার্শি, গুজরাটে জৈন এবং বেনিয়া, মুসলিম খোজা ও মেমনরা এবং সারাভারত জুড়ে মাড়ওয়ারিরা।

ভারতবর্ষে পারিবারিক উদ্যোগের ভুমিকা পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে পরিবারের নাম করতে হয় সেটি হল একটি পার্শি পরিবার যার কর্ণধার ছিলেন জামসেদজি রুস্তমজি টাটা। তিনি অধুনা ঝাড়খন্ড রাজ্যের সাকাত গ্রামে একটি বিশাল ইস্পাত কারখানার পত্তন করেন যা বিশ্ববিখ্যাত। পরবর্তীকালে তাঁর নামে এই এলাকার নাম হয় জামসেদপুর বা টাটানগর। এই শিল্প কারখানা ছাড়াও জামসেদজি টাটা বিভিন্ন ধরনের শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলেছিলেন যাদের মধ্যে নাগপুরে কাপড় কল, মুম্বাই তাজ হোটেল এবং বেশ কিছু আবাসন গড়ে তোলার ব্যবস্থা। টাটাদের এই উদ্যোগ অন্যান্য উদ্যোগী পরিবারকেও উৎসাহিত করে। এর ফলশ্রুতিতে একাধিক পরিবার যেমন বিড়লা, খৈতান, বাঙুর, গোয়েঙ্কা কলকাতায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা গড়ে তোলেন এবং এর ফলে কলকাতা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিকভাবে পারিবারিক ব্যবসায় গড়ে ওঠে ক্ষুদ্রায়তন কারবার যাতে কম মূলধনের প্রয়োজন হত এবং কারবার পরিচালনাও সরল ছিল। কিন্তু যখন উৎপাদন ও নির্মাণ শিল্পেও পারিবারিক উদ্যোগ প্রবেশ করে তখন অনেক বেশি মূলধনের প্রয়োজন পড়ে এবং এই বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ কেবলমাত্র পরিবারের সদস্যদের দিয়ে পরিচালনা করাও দুরূহ হয়ে পড়ে। অথচ তারা বাইরের কোনো ব্যক্তিকে পরিচালনায় অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক হয়, কারণ তারা জানত যে বাইরের ব্যক্তি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করলে পরিবারের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য তারা পরিবারের সদস্যদের বাইরেও আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত করে ও তাদের কারবারের অংশ দিতে শুরু করে। এর ফলে মূলধন সংগ্রহের সমস্যা অনেকটাই মেটে। তবে কারবারের মালিকানার বেশি অংশই পরিবারের হাতে থাকে। এভাবেই যৌথ মূলধনী কারবারের পথ প্রশস্ত হয়। বৃহদায়তন কারবারের নিয়ন্ত্রণ পরিবারের হাতে রাখার জন্য এসময়ই ম্যানেজিং এজেন্সি সিস্টেম চালু হয়েছিল যা 1970 সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। 1970 সালে এই পদ্ধতির বিলোপ ঘটে। ইতিমধ্যে কোম্পানি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পায় এবং ভারতের অধিকাংশ কারবারি প্রতিষ্ঠান কোম্পানি হিসাবে গড়ে ওঠে ও পরিচালিত হতে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রে অধিকাংশ কোম্পানিরই নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কতিপয় পরিবারের হাতেই ছিল। 1950-এর দশকে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ **আর. কে. হাজারী** (R. K. Hazari) একটি বিস্তৃত সমীক্ষায়

দেখেন যে, ওই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসংস্থাগুলির মালিকানা 18টি ভারতীয় পরিবারের ও 2টি ব্রিটিশ পরিবারের মালিকানায় ছিল। অবশ্য 1950 সালের পর যেহেতু ভারতে কারবারি পরিবেশের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, এর ফলে পারিবারিক কারবারের মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। পারিবারিক কারবার ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে ভূমিকা পালন করে এসেছে সেগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

(i) স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারতবর্ষের দারিদ্র দূরীকরণে ও বেকারসমস্যা সমধানে পারিবারিক উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ পালন করে আসছে। পারিবারিক কারবারি উদ্যোগের ব্যাপ্তি বিশাল। বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রায় 90 শতাংশ কারবারি সংস্থা এর অন্তর্গত যার মধ্যে অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রায়তন, মাঝারি শিল্পসংস্থা (MSME) যেমন রয়েছে তেমনি অংশীদারি, ঘরোয়া কোম্পানি ও সার্বজনিক কোম্পানিও পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। দেশের শিল্পায়নে পারিবারিক কারবারি উদ্যোগের ভূমিকা সর্বাধিক।

(ii) পারিবারিক উদ্যোগের ভূমিকা বিচার করে বলা হয় এরাই হল ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদন্ড। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) 70 শতাংশের বেশি উৎপাদন এই পারিবারিক উদ্যোগগুলি থেকে আসে। কাজেই দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির নিরিখে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(iii) পারিবারিক কারবারগুলি মূলধন গঠনেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। মূলধন লভ্যতার কারণে অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রায়তন, মাঝারি ও বৃহদায়তন পারিবারিক উদ্যোগ গড়ে উঠেছে। এর ফলে মূলধনের কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই মূলধন গঠনে ও মূলধনের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এধরনের কারবার প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

(iv) ভারতীয় অর্থনীতি পারিবারিক উদ্যোগের সাফল্য ও ব্যর্থতার দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ সেনসেক্স-এর 500টি কোম্পানির 73 শতাংশ কোম্পানিই পারিবারিক মালিকানাধীন কোম্পানি। নিফ্‌টির 30টি কোম্পানির মধ্যে প্রায় অর্ধেক কোম্পানি পারিবারিক কোম্পানি। অর্থাৎ মূলধন বাজারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এসব কারবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই মূলধন বাজারেও এদের অসামান্য ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

6.4 পারিবারিক কারবারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

পারিবারিক কারবারের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

1. এক বা একাধিক পরিবারের কিছু সদস্য কেবলমাত্র একটি পারিবারিক কারবারি সংস্থা গড়ে তোলে।
2. পরিবারের সদস্যদের আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে পারিবারিক কারবারে একজন সদস্যের পদমর্যাদা নির্ভর করে।
3. পরিবার কারবারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে মালিকানার ভিত্তিতে অথবা কারবারি সংস্থার পরিচালনার ভিত্তিতে এবং পরিবারের সদস্যরাই পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল দায়িত্বে থাকেন।

4. পরিবার কারবারি নীতি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে যাতে কারবার ও পরিবার উভয়েরই স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।
5. পারিবারিক কারবারি সংস্থার মালিকানা ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী প্রজন্মের উপর বর্তায়।
6. ভারতবর্ষের পারিবারিক ব্যবসায় মূলত জাতভিত্তিক (Caste based), প্রত্যেক জাতের নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে যা তাদের পারিবারিক ব্যবসাতেও প্রতিফলিত হয়।

6.5 ভারতের সমকালীন রোল মডেলসমূহ—তাদের মূল্যবোধ, কারবারি দর্শন ও আচরণগত অভিযোজন

ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোল মডেল রয়েছে। তবে কারবারি ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা বিপুল। বিশেষত স্টার্ট-আপ কারবারি ক্ষেত্রে অধুনা অনেক রোল মডেল দেখতে পাওয়া যায় যারা কারবারি ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য পেয়েছে এবং অনেকেই সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে গেছে। ভারতের সমকালীন রোল মডেল সম্বন্ধে আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমরা এমন কয়েকজন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আলোচনা করছি যারা স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতের শিল্প ব্যবস্থাকে অনেক উচ্চতায় তুলে দিয়েছেন এবং অনেক কারবারির আদর্শ হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এদের মধ্যে দু-জন পুরুষ ও দু-জন মহিলা রোল মডেল, তাঁদের মূল্যবোধ, কারবারি দর্শন ও আচরণগত অভিযোজন নীচে তুলে ধরা হল।

ধীরুভাই আম্বানি (1932-2002)

ধীরুভাই আম্বানির প্রকৃত নাম ধীরজ লাল হীরাচাঁদ আম্বানি। তিনি গুজরাটের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কালক্রমে একজন ব্যতিক্রমী উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 1960 সালে তিনি মশলার কারবার শুরু করেন মুম্বাইতে এক কামরার একটি ঘরে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির নাম রাখেন **রিলায়েন্স কমার্শিয়াল কর্পোরেশন**। 50 বছরের আগেই কোম্পানিটি ভারতবর্ষের বৃহত্তম বেসরকারি কোম্পানি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 'ফরচুন-500' কোম্পানির স্বীকৃতি পায়। তিনি যখন স্কুল ছাত্র ছিলেন তখনও তিনি কারবারি কার্যকলাপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি রান্নার ভোজ্য তেল বিক্রয় করতেন এবং গ্রামীণ বাজারে সপ্তাহান্তে গ্রামীণ মেলায় আলু ও পেঁয়াজ ভাজা বিক্রয় করতেন। উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ওই স্কুলের সাধারণ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার সময় জুনাগড় ছিল নবাবের সাম্রাজ্য। ধীরুভাই জুনাগড়কে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তির আন্দোলনে সামিল হন এবং আন্দোলনে সাফল্য লাভ করেন। তাঁর চরিত্রের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি ছিল যার মধ্যে ছিল পরিশ্রম করার ক্ষমতা ও দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি। স্বাধীনতার পর তিনি সমাজবাদী আন্দোলনে যোগদান করেন। রাজনৈতিক সাফল্য পাওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেন কারণ তাঁর হৃদয়ে ব্যবসার প্রতি অদম্য টান ছিল। পারিবারিক দূরবস্থা এবং বাবার অসুস্থতার ফলে তিনি তাঁর স্নাতক স্তরের শিক্ষা করতে পারেননি। ওই সময় সুয়েজ ক্যানেল-এর উপর অবস্থিত **এডেন** (Aden) বন্দরটি অত্যত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং খনিজতেল মজুতের

বন্দর হিসাবে বিশ্বে সুপরিচিত ছিল। বছরে প্রায় 6,300 জাহাজ এই বন্দরে নোঙর করত ও ব্যবসায়িক কাজকর্ম করত। সুয়েজ খালের পূর্বদিকে **এ. বেসে এন্ড কোম্পানি** একটি বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ইউরোপীয়, এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার বহু কোম্পানির ব্যবসায়িক প্রতিনিধি ছিল। 1954 সলে এডেনে **শেল রিফাইনারি কোম্পানি** (Shell Refinary Co.) গঠিত হয় ও কোম্পানিটি তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য এ. বেসে এন্ড কোম্পানিকে প্রধান বণ্টনকারী হিসাবে নিয়োগ করে। ধীরুভাই এই কোম্পানির কর্মী হিসাবে বন্দরের ফিলিং স্টেশনগুলি দেখভাল করার দায়িত্ব পান। এখান থেকেই তিনি ভবিষ্যতের নিজস্ব রিফাইনারি গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন।

1958 সালে ধীরুভাই তাঁর স্বল্প সঞ্চয় নিয়ে মুম্বাইতে ফিরে আসেন ও তাঁর মশলার ব্যবসা শুরু করেন। এই ব্যবসাতে তিনি মশলার উচ্চ মান ও ক্রেতাদের সময়মতো মশলা সরবরাহের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ব্যবসাতে তাঁর মন ভরছিল না এবং তিনি আরও বড়ো কিছু কবার সুযোগ খুঁজছিলেন। তিনি লক্ষ করেন যে সুতো ব্যবসাতে ভালো মুনাফা রয়েছে কিন্তু সাথে সাথে অনেক বেশি মূলধনের প্রয়োজন, তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে অল্প করে সুতো ব্যবসা শুরু করেন এবং কালক্রমে এই ব্যবসার একজন অগ্রণী ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ধীরুভাই দেখেন যে সুতো বিক্রয় না করে যদি বস্ত্র শিল্প গড়ে তোলা যায় তাহলে মুনাফা আরও বেশি হবে। তাই তিনি 1966 সালে আমেদাবাদের কাছে **নারোদা শিল্প তালুকে** 5000 বর্গগজ পরিমাণ জমি নিয়ে একটি বস্ত্রবয়ন কারখানা গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে এই কারখানা 125 একর জমির উপর বিস্তার লাভ করে। এই কারখানায় উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য তিনি কেবলমাত্র **বিমল** (Only Vimal) নামে সর্বত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। 1990 সাল নাগাদ এই কারখানায় 85,000 শ্রমিক কাজ করত ও বার্ষিক উৎপাদন ছিল 28 লক্ষ কোটি টাকা। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ-এর উন্নয়ন আরও গতি পায় যখন তাঁর দুই ছেলে মুকেশ আম্বানি ও অনিল আম্বানি কারবারে যোগ দেয়। বর্তমানে এই কোম্পানি বস্ত্র শিল্প, পেট্রো-রসায়ন শিল্প, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, টেলি যোগাযোগ (Jio), তথ্য প্রযুক্তি, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে, খুচরো কারবার, মূলধন বাজার ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে কারবার করে। 2002 সালে ধীরুভাই আম্বানির মৃত্যুর পর দুই ভাইয়ের মধ্যে কোম্পানির মালিকানা বণ্টন হয় ও ফ্ল্যাগশিপ রিলায়েন্স কোম্পানি মুকেশ আম্বানির ভাগে পড়ে। উদ্যোক্তা হিসাবে ধীরুভাই আম্বানি সারা বিশ্বজুড়েই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এবং ফেডারেশন ও ইন্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (FICCI) তাঁকে **'বিংশ শতকের উদ্যোক্তা'** (Entrepreneur of the 20th century) শিরোনামে ভূষিত করে।

মূলবোধ (Values) :

(i) আত্মবিশ্বাস

(ii) সততা

(iii) কঠোর পরিশ্রমী

(iv) দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা

(v) কারবারি নৈতিকতা

কারবারি দর্শন (Business Philosophy) : তাঁর কারবারি দর্শন ছিল যে 'তুমি যদি তোমার স্বপ্ন না পূরণ করো তাহলে অন্য কেউ তোমাকে ভাড়া নিয়ে তাদের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে'। বড় কিছু করার চিন্তা করো, দ্রুত চিন্তা করো এবং অন্যদের আগেই চিন্তা করো। ব্যবসায়িক ধারণা কারও একচেটিয়া মালিকানা নয়। মুনাফা পাবার জন্য কেউ তোমাকে আমন্ত্রণ করবে না, তোমাকেই যা করার করতে হবে।

ব্যবহারিক অভিযোজন (Behavioural Orientation) :

(i) সাহসী,

(ii) কৌশলী,

(iii) সৃজনশীলতা,

(iv) সারল্য।

রতন টাটা (Ratan N. Tata)

রতন টাটা, টাটা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ-এর টাটা সন্স অ্যান্ড হোল্ডিং কোম্পানির চেয়ারম্যান ছিলেন 1991 সাল থেকে 2012 সালে অবসর নেওয়ার দিন পর্যন্ত। এছাড়াও তিনি টাটা কোম্পানির অন্যান্য কোম্পানি যেমন—টাটা স্টিল, টাটা গ্লোবাল বেভারেজ, টাটা টেলিসার্ভিস, টাটা মোটর, টি.সি.এস, টাটা কেমিক্যাল ও ইন্ডিয়া হোটেল ইত্যাদিরও চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর কার্যকালে টাটা গ্রুপের আয় অনেক গুণে বেড়ে যায় এবং এর পরিমাণ 2011-12 সালে ছিল 100 বিলিয়ন ডলার। টাটা গ্রুপের অনেক কোম্পানিও বিশ্বে বাজারে নেতৃত্ব দেয়। যেমন টাটা স্টিল বিশ্বের অগ্রণী ইস্পাত উৎপাদক 15টি কোম্পানির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। অনুরূপভাবে টাটা মোটর বিশ্বের 10টি প্রথম সারির বাণিজ্যিক গাড়ি উৎপাদকের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে, টি. সি. এস বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানি, টাটা বেভারেজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা-কোম্পানি এবং টাটা কেমিক্যাল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সোডা অ্যাশ তৈরির সংস্থা।

মূলবোধ (Values) :

(i) তোমার দলগত প্রচেষ্টাকে সম্মান জানাও,

(ii) অন্যদের উপর বিশ্বাস (Trust) রাখো

(iii) নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ো না।

কারবারি দর্শন (Business Philosophy) :

(i) কখনোই শেখা ও শোনা বন্ধ করো না,

(ii) একটি ধারণাই পার্থক্য টেনে দেয় (an idea makes a difference),

(iii) সাম্রাজ্যের প্রাপ্য ফিরিয়ে দাও।

ব্যবহারগত অভিযোজন (Behavioural Orientation) :

(i) তোমার সিদ্ধান্তের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখো

(ii) কর্মীদের স্বার্থ দেখা ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।

রোল মডেল হিসাবে মহিলা উদ্যোক্তা

কিরণ মজুমদার শ (Kiran Mazumdar Shaw)

কিরণ মজুমদার একজন ভারতীয় উদ্যোক্তা যিনি 'বায়োকন লিমিটেড'-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ওষুধ কোম্পানিগুলির মধ্যে 'বায়োকন' একটি পরিচিত নাম যেটি বাঙ্গালোরে অবস্থিত। 1953 সালে তাঁর জন্ম এবং বিশপ কটন স্কুলে তাঁর স্কুল শিক্ষা শেষ করে প্রাণীবিদ্যায় অনার্স নিয়ে মাউন্ট কারমেল কলেজ থেকে পাস করেন 1971 সালে। তিনি তাঁর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

পড়াশোনা শেষ করে কিরণ মেলবোর্নে বিয়ার তৈরির শিক্ষানবীশ হিসাবে কিছুদিন কাজ করেন। এছাড়াও তিনি কলকাতায় জুপিটার নামক একটি মদ তৈরির কারখানায় প্রযুক্তিগত পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং 1975 থেকে 1977 সাল পর্যন্ত তিনি বরোদায় স্ট্যান্ডার্ড মেকিং কর্পোরেশন-এর প্রযুক্তি ব্যবস্থাপক হিসাবে চাকুরি করেছিলেন।

1978 সালে তিনি '**বায়োকন**' প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রথমদিকে কোম্পানি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম প্রস্তুত করত। পরে এটি একটি বায়োফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। কোম্পানি গবেষণার ক্ষেত্রে বহুমূত্র (Diabetes), ক্যান্সার (Oncology) এবং স্ব-নিরোধক অসুখের উপর গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেয়। তাঁর এই কাজের জন্য তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন যার মধ্যে অন্যতম হল 1989 সালে '**পদ্মশ্রী**' ও 2005 সালে '**পদ্মভূষণ**' পুরস্কার। সম্প্রতি **টাইম ম্যাগাজিন** পৃথিবীর 100 জন ক্ষমতাবান মানুষের যে তালিকা প্রকাশ করেছে সেই তালিকায় তিনি স্থান পেয়েছেন। এছাড়াও **ফর্বস** প্রকাশিত বিশ্বের 100 জন ক্ষমতাধর মহিলা হিসাবে এবং টাইমস ম্যাগাজিন বিশ্বের 50 জন মহিলা উদ্যোগপতির যে তালিকা প্রকাশ করেছেন, সেগুলিতেও কিরণ মজুমদার শ-এর নাম রয়েছে। তাছাড়াও তিনি ইন্ডিয়ান স্কুল অফ্ বিজনেস (Indian School of Business) এবং হায়দ্রাবাদে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT)-র মতো দুটি প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমন্ডলীর সদস্য।

মূলবোধ (Values) :

(i) নিজের প্রতি বিশ্বাস (Belief in herself),

(ii) নেতৃত্বদান (Leadership),

(iii) দূরদৃষ্টি (Vision),

(iv) উদ্যমী

(vi) ব্যর্থতাকে ভয় না পাওয়া।

কারবারি দর্শন (Business Philosophy) :

(i) কারবারি নৈতিকতা (Ethics in business),

(ii) নির্ভুল কাজ (Precision in work)

(iii) গুণগত মান বজায় (Quality)।

আচরণমূলক অভিযোজন (Behavioural Orientation) :

(i) সাহসী (Courageous),

(ii) দুঃসময়েও অচঞ্চল (Undeterred by set-backs)

(iii) কর্পোরেট নাগরিকত্ব (Corporate citizenship)।

কল্পনা সরোজ (Kalpana Saroj)

কল্পনা সরোজ একজন দলিত মহিলা, ভারতীয় উদ্যোক্তা, মহারাষ্ট্রের রোশেরখেদা গ্রামে জন্মে ছিলেন। বর্তমানে তিনি '**কামানি টিউব কোম্পানির**' প্রধান কার্যনির্বাহী (CEO)। কামানি টিউব কোম্পানি ক্রমাগত লোকসানে চলার ফলে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। কল্পনা সরোজ কোম্পানিটি কিনে নেন এবং পুনর্গঠন করেন। অচিরেই কোম্পানি লাভের মুখ দেখে। কিন্তু উদ্যোক্তা হিসাবে কল্পনা সরোজের জীবন সংগ্রাম এতটা সহজ ছিল না।

কল্পনা 12 বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায় এবং সে তার স্বামীর পরিবারের সাথে মুম্বাইয়ের একটি বস্তিতে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে তাকে নানাভাবে নিগ্রহ করায় তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তার বাবা তাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করে গ্রামে ফিরিয়ে আনেন এবং সে মা-বাবার সাথে বসবাস করতে থাকে। গ্রামবাসীরাও তাদের পরিবারকে একঘরে করে দেয় এবং সে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। 16 বছর বয়সে সে তার কাকার সাথে মুম্বাইতে বসবাস করার জন্য আসে এবং একটি পোশাক তৈরির কারখানায় কাজ নেয়। এরপর নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য সরকারি ঋণ নিয়ে প্রথমে একটি দর্জির দোকান ও পরে একটি আসবাবপত্রের দোকান শুরু করেন। পরে তিনি আবার তাঁর বিভিন্ন যোগাযোগ ও দক্ষতার জন্য বাড়ি-জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসাতেও সাফল্য অর্জন করেন। ওই সময়ই তিনি 'কামানি টিউব'-এর পরিচালকমন্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত হন এবং কোম্পানি দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার ফলে তিনি কোম্পানিটি কিনে নেন ও পুনর্গঠিত করে তাকে মুনাফার মধ্যে নিয়ে আসেন। বর্তমানে তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর আনুমানিক মূল্য 112 মিলিয়ন ডলার। 2013 সালে ভারত সরকার তাঁকে ব্যবসা ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য '**পদ্মশ্রী**' প্রদান করেন।

মূলবোধ (Values) :

(i) সাফল্যের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,

(ii) অন্যদের অনুপ্রাণিত করাই প্রধান লক্ষ্য

(iii) সামাজিক ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়ানে।

কারবারি দর্শন (Business Philosophy) : একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উদ্যোক্তার থামার কোনো জায়গা নেই।

আচরণগত অভিযোজন (Behavioural Orientation) :

(i) সাহসী (Courageous),

(ii) বেপরোয়া ও অসমসাহসী (Daring)

(iii) লড়াকু (Fighter)।

6.6 পারিবারিক কারবারি উদ্যোগ বিরোধ বা দ্বন্দ

পরিবার-ভিত্তিক কারবারে পরিবারের সদস্য এবং বাইরের যেসব সদস্য কারবার পরিচালনার অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কারণ পারিবারিক কারবার হল বিভিন্ন ব্যক্তির এমন এক সংমিশ্রণ যেখানে কোনো বিষয়ে তাদের মতামত বিভিন্ন হয় এবং মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। এছাড়া পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে স্বার্থজনিত টানাপোড়েনের ফলে বিরোধের সৃষ্টি হয় কারণ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই কারবারের সুবিধা সমানভাবে ভোগ করে যদিও মহিলা সদস্যদের সে অধিকার থাকে না। প্রকৃতপক্ষে যদি পারিবারিক কারবারে কোনো বিরোধ না থাকে তাহলে মনে করা হয় যে সদস্যদের কারবারের ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই বা কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই। কাজেই দ্বন্দের অনুপস্থিতি পারিবারিক কারবারের শুভ লক্ষণ নয়। আবার চরম দ্বন্দও কারবারের সমাপ্তি ঘটাতে পারে। তাই বলা হয় যে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে দ্বন্দ থাকা পারিবারিক ব্যবসার পক্ষে মঙ্গল। তবে বিরোধ যাতে চরম জায়গায় না পৌঁছায় এবং শুরুতেই বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারলে পারিবারিক কারবার সুস্থিত হয় এবং সদস্যদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক অনেক মজবুত হয়। তাই পারিবারিক কারবারে বিরোধের নিষ্পত্তি করতে হলে বিরোধের কারণ বা উৎসকে চিহ্নিত করা দরকার। অন্যথায় বিরোধ-নিষ্পত্তি সহজ হয় না।

6.6.1 পারিবারিক কারবারে বিরোধের কারণ বা উৎসসমূহ

পারিবারিক উদ্যোগের উপর বিভিন্ন সমীক্ষায় পারিবারিক উদ্যোগে বিরোধের যেসব কারণ তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি তুলে ধরা হল।

পারিবারিক কারবারে বিরোধের কারণ বা উৎসসমূহ :

1. সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision making)
2. কারবারের দিক্‌নির্দেশ (Direction for the business)
3. সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব (Roles and responsibilities)
4. সুযোগ-সুবিধা (Opportunities and Benefits)
5. মালিকানা (Ownership)
6. ব্যক্তিত্বের প্রভেদ (Personality difference)
7. বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনা (Estate Plan)
8. বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় (In-laws)

9. জবাবদিহির বাধ্যবাধকতা (Accountability)
10. ভাইয়ে ভাইয়ে প্রতিদ্বন্দিতা (Sibling rivalry)
11. উত্তরাধিকার (Succession)
12. জ্ঞাতকরণ (Communication)

নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।

1. **সিদ্ধান্তগ্রহণ (Decision making) :** পারিবারিক কারবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি স্বচ্ছতা না থাকে তাহলে বিরোধের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে কার কতটা ক্ষমতা তা সুস্পষ্টভাবে বলে দিতে হবে। অন্যথায় নির্দেশের একতা বজায় রাখা যায় না এবং একাধিক সদস্য একাধিক সিদ্ধান্ত নিলে কারবার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেকারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণজনিত মতবিরোধ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা দরকার এবং এ-ধরনের বিরোধ পারিবারিক কারবারের সর্বাধিক ক্ষতি করে।
2. **কারবরের দিক্ নির্দেশ (Direction for the business) :** পারিবারিক কারবারের লক্ষ্য কী তা সদস্যদের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। যদি সদস্যদের মধ্যে কারবারের লক্ষ্যপূরণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকে তাহলে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।
3. **সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব (Role and responsibilities) :** পারিবারিক কারবারের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হল যে সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া হয় না। এর ফলে কারবারে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। আবার অনেক সময় সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের টানাপোড়েন দ্বন্দের সৃষ্টি করে।
4. **সুযোগ-সুবিধা (Opportunities and benefits) :** বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার তারতম্যও অনেক সময় মতবিরোধের কারণ হয়। ওই সুযোগ-সুবিধা প্রদানে অন্যায় ও অসাম্য থাকলে দ্বন্দ আরও প্রকট হয় বিশেষত পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যদের মধ্যে।
5. **মালিকানা (Ownership) :** পারিবারিক কারবারের কর্তার দায়িত্ব সর্বাধিক। প্রকৃত মালিকানা ও পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ওই মালিকানার হস্তান্তরের বিষয়টি স্থির করে প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত করা ও পরিবারের সদস্যদে জানানো বাঞ্ছণীয়। এর অন্যথা হলে সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।
6. **ব্যক্তিত্বের প্রভেদ (Personality difference) :** কারবারে যেমন পারিবারিক সদস্যরা থাকে তেমনি বাইরের কর্মচারী সদস্যও থাকে। এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রভেদ বা পার্থক্য থাকেই। কারবারের কাজ হল এই বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মানুষদের কারবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে লক্ষ্যের দিতে এগিয়ে চলা, যাতে ব্যক্তিত্বের সংঘাত না দেখা দেয়। এজন্য সদস্যদের মধ্যে যাতে খোলামেলা জ্ঞাতকরণ ঘটে তার পরিবশে গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়।
7. **বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনা (Estate Plan) :** বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনা যদি পরিস্কার না হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যদের কাছে তা স্পষ্ট না করা হয় তাহলে তাদের

মনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। আর এই উদ্বেগ থেকেই মতবিরোধ দেখা দেয়। মতবিরোধ চূড়ান্ত আকার নিলে পারিবারিক কারবার বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

8. **বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় (In-laws) :** পুত্রবধূ বা জামাতা বা সদস্যদের স্ত্রী প্রত্যেকেরই পারিবারিক কারবারের প্রতি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থ থাকে। অনেক সময়ই তারা না বুঝেই দ্বন্দের অবতারণা করে ফেলে। সেজন্য তাদের কারবারে কী ভূমিকা তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় মতবিরোধ বৃদ্ধি পায়।

9. **জবাবদিহির বাধ্যবাধকতা (Accountability) :** পারিবারিক সদস্যদের আবশ্যিকভাবে জবাবদিহি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তারা যদি প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ সম্পাদনে অপারগ হয় তাহলে এজন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। অর্থাৎ সকলের জন্য একই নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

10. **ভাইয়ে ভাইয়ে প্রতিদ্বন্দিতা (Sibling rivalry) :** বাবা-মায়ের মনোযোগ পাওয়ার জন্য শৈশবকালে ভাই ও বোনেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা খুবই সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু যদি এই প্রতিদ্বন্দিতা বড় হওয়ার পরও তাদের মধ্যে দেখা দেয় তখন তা আর সাধারণ ব্যাপার থাকে না, পরিবারের বা পারিবারিক কারবারের মধ্যে সঙ্কটজনক সমস্যার সৃষ্টি করে। এমনকি এর ফলে পারিবারিক কারবার বিভক্ত হয়ে দুই বা তিনভাগে পরিণত হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল 2005 সালে মুকেশ আম্বানি ও অনিল আম্বানির বিরোধ। এর ফলশ্রুতিতে ধীরুভাই আম্বানির ব্যবসা দুই ছেলে ও স্ত্রীর মধ্যে 30 : 30 : 40 অনুপাতে ভাগ হয়ে যায়।

11. **উত্তরাধিকার (Succession) :** একটি প্রচলিত প্রবাদ হল যে পারিবারিক কারবার হল তিন প্রজন্মের। প্রথম প্রজন্ম কারবার গড়ে, দ্বিতীয় প্রজন্ম কারবারকে মজবুত করে ও তৃতীয় প্রজন্ম কারবারকে শেষ করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে 97 শতাংশ পারিবারিক কারবার তৃতীয় প্রজন্মেই শেষ হয়ে গেছে। তাই বলা হয় যে পারিবারিক কারবারের উত্তরাধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিচার-বিবেচনা করে স্থির করতে হয়। উত্তরাধিকার বলতে এখানে প্রধানত ভবিষ্যতে কারবারের নেতৃত্বদানের অধিকারী কে হবে তাকে বোঝায়। প্রত্যেক সদস্যের অভিমতকে গুরুত্ব দিয়ে উত্তরাধিকারী চূড়ান্ত করতে হয়। অন্যথায় মতবিরোধ চূড়ান্ত আকার নেয় ও কারবার গভীর সঙ্কটে পড়ে।

12. **জ্ঞাতকরণ (Communication) :** পারিবারিক কারবারের জ্ঞাতকরণ প্রক্রিয়া দুর্বল হলে অর্থাৎ সদস্যদের কারবারের বিভিন্ন বিষয় সঠিক সময়ে সঠিকভাবে জ্ঞাত করা না হলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয় যা পরবর্তী সময়ে মতবিরোধের সৃষ্টি করে। অস্পষ্ট, অনিয়মিত ও অসম্পূর্ণ বার্তা জ্ঞাপন ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে যা থেকেই মতবিরোধ ও নানা ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের উদ্ভব হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে পারিবারিক দ্বন্দ বা মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার পিছনে উপরের এক বা একাধিক কারণ থাকতে পারে। গঠনমূলক মতবিরোধ বা দ্বন্দ গ্রহণযোগ্য হলেও ধ্বংসাত্মক মতবিরোধ কখনই কাম্য নয় কারণ এর ফলে পারিবারিক কারবারে অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দেয়।

6.6.2 পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তি

অল্পমাত্রায় বিরোধের উপস্থিতি প্রতিটি কারবার-সংস্থারই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু যখন সহকর্মী ও কারবারের কর্মচারীরা পরিবারের সদস্য হয় সেক্ষেত্রে পারস্পরিক বিরোধ কারবারের একটি জ্বলন্ত সমস্যা হিসাবে গণ্য হয়। কারণ সদস্যদের মধ্যে বিরোধ পারিবারিক কারবারের অস্তিত্বের উপরই আঘাত করে। সেকারণেই বলা হয় যে পারিবারিক কারবার তৃতীয় প্রজন্মেই শেষ হয়ে যায়। এর পিছনে প্রধান কারণ হল কারবারের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ। সুতরাং পারিবারিক কারবারের বিরোধ সবসময়ই অন্য মাত্রা পায়। যৌথ মুলধনী কারবারের ক্ষেত্রে সহকর্মীদের মধ্যে বা কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে বিরোধ যাতে সমস্যা সৃষ্টি না করে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং কোম্পানির মানবসম্পদ বিভাগ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু পারিবারিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে যেহেতু পরিবারের সদস্যরাই কারবারের কর্মচারী বা ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করে তাই পরিবার ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য টানা মুশকিল হয়ে পড়ে। কারণ পারিবারিক বিরোধের প্রভাব যেমন কারবারের উপর পড়ে তেমনি কারবারের বিরোধ পরিবারের উপরও পড়ে। কাজেই সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে বিরোধের নিষ্পত্তি করতে না পারলে তা কারবার ও পরিবার উভয়ের মধ্যেই চরম সঙ্কট সৃষ্টি করে। নীচে পারিবারিক কারবারের বিরোধ নিষ্পত্তির পাঁচটি উপায় তুলে ধরা হল।

পারিবারিক কারবারের বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়সমূহ :

(i) নিয়মানুগ প্রশাসনিক কাঠামোর উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি
(Reliance on formal Governance structure)

(ii) পরিবারের সদস্যদের ক্ষোভ প্রকাশের ব্যবস্থা করা
(Give family members space to air grievance)

(iii) পারিবারিক ক্ষেত্রে কারবারের আলোচনা নয়
(No business discussion in family domain)

(iv) বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাতকরণ সময়মতো ও দ্রুত করতে হবে
(Timely and fast communication)

(v) বিরোধ বড় ধরনের হলে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে
(Appoint expert to mediate major conflicts)

নীচের এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল :

(i) **নিয়মানুগ প্রশাসনিক কাঠামোর উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি (Reliance on formal governance structure) :** অধিকাংশ পারিবারিক কারবারের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পরিবারের সদস্য কারবারের বিভিন্ন বিষয় বিশেষত যেগুলি বিরোধের জন্ম দেয় সেগুলি আলোচনার জন্য কোনো ফোরাম পায় না। নিয়মানুগ প্রশাসনিক কাঠামোতে কিন্তু 'পারিবারিক সংসদ' (family council) এবং 'পারিবারিক ফোরাম' (family forum) থাকে যেখানে সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের বিষয়গুলির নিষ্পত্তি ঘটাতে পারে। কাজেই নিয়মানুগ প্রশাসন

পারিবারিক বা আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত সমস্যাগুলি মেটাতে সমর্থ হয় কারণ এই কাঠামোর মাধ্যমে কারবারের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনাকে আলাদা করা হয়।

(ii) **পরিবারের সদস্যদের ক্ষোভ প্রকাশের ব্যবস্থা করা (Give family members space to air grievances) :** পারিবারিক কারবারের সদস্যদের অসন্তুষ্টি, ক্ষোভ, হতাশা ইত্যাদি কারবারে বিরোধের সৃষ্টি করে। এই ক্ষোভ প্রশমিত না হওয়ার ফলেই তা বিক্ষোভে পরিণত হয়। এই বিষয়টি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পরিবারের প্রথম প্রজন্মের সদস্যদের মধ্যে, কারণ তারা তাদের প্রয়োজন ও উদ্বেগ জানানোর কোনো নিরাপদ জায়গা পায় না। যখন এসব সদস্যদের কথা শোনার কেউ থাকে না, তখন ছোট সমস্যাই বড় হয়ে যায়। সেকারণেই বিরোধ এড়ানোর সর্বোত্তম উপায় হল পারিবারিক কারবারের নেতৃত্ব যার হাতে থাকে তাকে ধৈর্যসহকারে অন্যান্য সদস্যদের ক্ষোভ ও উদ্বেগ শুনতে হবে এবং মতবিরোধের বিষয়গুলি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে দিতে হবে। সুতরাং বয়স্ক ব্যক্তিদের অন্যান্য সদস্যদের কথা শোনার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে এবং মতপার্থক্যের বিষয়গুলি তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে ও উৎসাহিত করতে হবে। তবে বয়স্ক সদস্যরা অবশ্যই বিচারকের মতো আচরণ করবেন না, পারিবারিক কারবারের নেতা হিসাবে তাদের আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলবেন।

(iii) **পারিবারিক ক্ষেত্রে কারবারের আলোচনা নয় (No business discussion in the family domain) :** পারিবারিক কারবারের একটি বড় সমস্যা হল যে পরিবার ও কারবার অনেক সময়ই সমর্থক হয়ে পড়ে। অথচ এরা পৃথক দুটি সত্তা। পরিবার হল একটি সামাজিক সংগঠন, অন্যদিকে কারবার হল একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। যেহেতু পরিবারের সদস্যদের দ্বারাই পারিবারিক কারবার পরিচালিত হয় তাই তাদের মধ্যে পার্থক্য টানা দুরূহ হয়ে ওঠে। অনেক সময় পরিবারের সমস্যা কারবারকে প্রভাবিত করে, আবার কারবারি সমস্যা পারিবারিক সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে। কাজেই এই দুই সংগঠনের মধ্যে পৃথকীকরণ ঘটালে সমস্যা অনেকটাই নিরসন হবে বলে মনে করা হয়।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল যে কারবারে কারবারি বিষয়গুলি আলোচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করতে হবে। পরিবারের সদস্যরা কারবার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ওই নির্দিষ্ট সময়ে তাদের মতামত দেবে বা অন্যান্যদের সাথে মতামত বিনিময় করবে। এর বাইরে অন্যান্য সময় পারিবারিক সদস্যরা কারবার সংক্রান্ত আলোচনা করবে না, কেবলমাত্র পারিবারিক বিষয়ে তাদের দায়-দায়িত্ব পালন করবে। অর্থাৎ ওই নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে পরিবারের সদস্যরা 'আলোচনা কেন্দ্রের' (No discussion zone) বাইরে থাকবে বলে তারা অনেক হালকা মনে পরিবারে থাকতে পারবে।

(iv) **বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাতকরণ সময়মতো ও দ্রুত করতে হবে (Timely and fast Communication) :** কারবারের অধিকাংশ বিরোধের উৎপত্তি ঘটে সঠিক মাত্রায়, সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে কোনো বিষয় পরিবারের সদস্যদের না জানানোর জন্য। সঠিকভাবে জ্ঞাতকরণ করা হলে অনেক সমস্যা শুরুতেই মিটে যায় এবং বিরোধ বাড়তে পারে না। যেসব

সদস্যরা নিয়মিতভাবে কারবারের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে তাদের সাথে কারবারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করার জন্য নিয়মানুগ সভার ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে জটিল বিষয়গুলির উপর সদস্যদের ঐকমত্য হওয়ার সুযোগ ঘটে এবং বিরোধ উৎপত্তির জায়গা থাকে না। অর্থাৎ খোলামেলা জ্ঞাতকরণ বিরোধ-সৃষ্টি ও বিরোধ বেড়ে যাওয়াকে প্রতিরোধ করে। এর দ্বারা সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয় কারণ তারা বুঝতে পারে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের অগোচরে নেই এবং তাদের মতামতও শোনা হয়েছে।

(v) **বড় আকারে বিরোধের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ (Appointment of an expert when the problem has been aggravated) :** যখন পারিবারিক বিরোধ চরম আকার ধারণ করে এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ধারাবাহিক আলোচনা করেও বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না তখন বাইরের কোনো বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এরূপ বিশেষজ্ঞ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার পরও কোনো সমাধানসূত্র পাওয়া না যাওয়ায় মধ্যস্থতাকারীর উপস্থিতিতে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে এবং বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটেছে। কারণ বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সদস্যের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় অনুধাবন করে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান সূত্র পেশ করেন যা সকলেই মেনে নেয়। সেকারণেই পরিবারের বাইরের কোনো অভিজ্ঞ, দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ করলে অনেক সময়ই ভালো ফল পাওয়া যায় এবং দীর্ঘকালীন পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে অনেক পারিবারিক সমস্যা যা দীর্ঘদিন যাবৎ মেটানো সম্ভব হয় না তা বাইরের দক্ষ মধ্যস্থতাকারীর উপস্থিতিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মিটে গেছে। অনুরূপ সমস্যা হয়েছিল 2003 সালে রিলায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ধীরুভাই আম্বানির মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছেলে মুকেশ ও অনিল আম্বানির মধ্যে প্রায় দু-বছর পর বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে 2005 সালে এবং এই কাজে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল।

6.7 সারাংশ

এই এককটি পড়ে আপনারা যে বিষয়গুলি জানতে পারলেন তা হল—

- পারিবারিক কারবারের অর্থ ও সংজ্ঞা।
- ভারতবর্ষে পারিবারিক উদ্যোগের ভূমিকা।
- পারিবারিক কারবারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।
- ভারতের সমকালীন রোল মডেলসমূহ।
- পারিবারিক কারবারি উদ্যোগে বিরোধ এবং বিরোধ নিষ্পত্তি।

6.8 প্রশ্নাবলী

ক. এমসিকিউ প্রশ্নাবলি

1. বিশ্বের নিরিখে মোট ব্যবসার কত শতাংশ পারিবারিক উদ্যোগে নিয়ন্ত্রিত হয়?
   (ক) 60% (খ) 70%
   (গ) 80% (ঘ) 90%
2. বিশ্বের মোট কর্মসংস্থানের কত শতাংশ পারিবারিক কারবার থেকে আসে?
   (ক) 40% (খ) 50%
   (গ) 60% (ঘ) 75%
3. বিশ্বের প্রাচীনতম পারিবারিক কারবারটি হল——এবং এটি——-এ অবস্থিত। শূন্যস্থান পূরণ করো।
   (ক) ম্যাক্‌ডোনাল্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (খ) ফ্ল্যাট গোষ্ঠী, ইতালি
   (গ) কঙ্গো গুমি, জাপান (ঘ) আলিবাবা, চিন
4. ভারতবর্ষের পারিবারিক ব্যবসায় হল——। শূন্যস্থান পূরণ করো।
   (ক) সমাজভিত্তিক (খ) জাতভিত্তিক
   (গ) ধর্মভিত্তিক (ঘ) কোনোটিই নয়
5. 1854 সালে মুম্বাইতে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপন করেছিলেন কে?
   (ক) ধীরুভাই আম্বানি (খ) ঘনশ্যাম দাস বিড়লা
   (গ) কাওয়াসজি দাভর (ঘ) ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি
6. সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পারিবারিক কারবার গড়ে তুলেছিল কোন সম্প্রদায়?
   (ক) মাড়োয়ারি সম্প্রদায় (খ) পার্শি সম্প্রদায়
   (গ) ছোটিয়ার সম্প্রদায় (ঘ) মেনন সম্প্রদায়
7. ভারতবর্ষে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা কত সালে বিলুপ্ত হয়?
   (ক) 1962 সালে (খ) 1966 সালে
   (গ) 1970 সালে (ঘ) 1975 সালে
8. ভারতবর্ষে বেসরকারি ক্ষেত্রে পারিবারিক কারবারের অংশ কত?
   (ক) 65% (খ) 70%
   (গ) 85% (ঘ) 90%

9. নীচের উল্লিখিত কোন বিকল্পটি পারিবারিক কারবারের বিরোধের কারণ হিসাবে গণ্য হয়?
   (ক) ব্যক্তিত্বের প্রভেদ বা পার্থক্য (খ) উত্তরাধিকার
   (গ) জবাবদিহি বাধ্যবাধকতা (ঘ) সবগুলিই
10. নীচের কোনটি পারিবারিক উদ্যোগের বিরোধের উৎস হিসাবে গণ্য হয় না?
   (ক) সদস্যদের অসম সুযোগ সুবিধা (খ) ভাইয়ে ভাইয়ে মতবিরোধ
   (গ) বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার উপস্থিতি (ঘ) জ্ঞাতকরণ ত্রুটি
11. নীচের কোনটি পারিবারিক কারবারের বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় হিসাবে গণ্য হয়?
   (ক) নিয়মানুগ প্রশাসনিক কাঠামোর উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি
   (খ) সদস্যদের ক্ষোভ প্রকাশের ব্যবস্থা করা
   (গ) পারিবারিক ক্ষেত্রে কারবারের আলোচনা
   (ঘ) সবগুলিই
12. নীচের কোনটি পারিবারিক উদ্যোগের বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় হিসাবে গণ্য হয় না?
   (ক) দ্রুত জ্ঞাতকরণের ব্যবস্থা
   (খ) বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিয়োগ
   (গ) সদস্যদের ক্ষোভ চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করা
   (ঘ) কোনোটিই নয়
13. 'রোল মডেল' শব্দবন্ধটির প্রচলন কে করেন?
   (ক) সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (খ) সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট কে মার্টন
   (গ) অর্থনীতিবিদ্ জোসেফ শ্যুমপিটার (ঘ) কেউই নন
14. একজন রোল মডেলের মধ্যে নীচের কোন বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায়?
   (ক) ইতিবাচক ও সফল ব্যক্তি
   (খ) আত্মবিশ্বাসী ও আদর্শবান
   (গ) মানুষের জন্য ভালো কিছু করার চেষ্টা করেন
   (ঘ) সবগুলিই
15. ধীরুভাই আম্বানি প্রবর্তিত ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি কোম্পানির নাম কী?
   (ক) রিলায়েন্স কর্মাশিয়াল কর্পোরেশন (খ) রিলায়েন্স পেট্রোকেম লিঃ
   (গ) রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (ঘ) কোনোটিই নয়

16. ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (FICCI) কাকে 'বিংশ শতকের উদ্যোক্তা' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল?

(ক) রতন টাটা (খ) ধীরুভাই আম্বানি

(গ) মুকেশ আম্বানি (ঘ) গৌতম আদানি

17. 'তুমি যদি তোমার স্বপ্ন পূরণ না করো তাহলে তোমাকে ভাড়া নিয়ে অন্য কেউ তার স্বপ্নকে পূরণ করবে'?—এটি কার জীবন দর্শন?

(ক) রতন টাটা (খ) ধীরুভাই আম্বানি

(গ) কিরণ মজুমদার শ-এর (ঘ) সকলেরই

18. 'একটি ধারণাই পার্থক্য টেনে দেয় এবং সমাজের প্রাপ্য ফিরিয়ে দাও'—এটি কোন উদ্যোক্তার জীবনদর্শন?

(ক) রতন টাটার (খ) ধীরুভাই আম্বানির

(গ) মুকেশ আম্বানির (ঘ) কারও নয়

19. ঔষধ কোম্পানি 'বায়াকন' কে প্রতিষ্ঠা করেন?

(ক) বি. জি. শ (খ) কিরণ মজুমদার শ

(গ) পিরামল ব্রাদার্স (ঘ) এদের কেউ নয়

20. নীচের কোনটি বায়োকন ঔষধ কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা কিরণ মজুমদার শ-এর মূলবোধ (values) বলে গণ্য হয়?

(ক) আত্মবিশ্বাস (খ) দূরদৃষ্টি

(গ) ব্যর্থতাকে ভয় না পাওয়া (ঘ) সবগুলিই

21. কামানি টিউব কোম্পানির প্রধান কার্যনির্বাহী (CEO) কে?

(ক) অনিল আম্বানি (খ) আদি গডরেজ

(গ) কল্পনা সরোজ (ঘ) কেউই নয়

22. 'একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উদ্যোক্তার থামার কোনো জায়গা নেই'—এটি কোন উদ্যোক্তার কারবারি দর্শন?

(ক) কল্পনা সরোজ (খ) ঊষা মাথুর

(গ) ছন্দা কোছার (ঘ) কারও নয়

উত্তর: 1. (গ) 2. (খ) 3. (গ) 4. (ঘ) 5. (গ) 6. (ক)
7. (গ) 8. (ঘ) 9. (ঘ) 10. (গ) 11. (গ) 12. (গ)

13. (খ) 14. (ঘ) 15. (গ) 16. (খ) 17. (খ) 18. (ক)
19. (খ) 20. (ঘ) 21. (গ) 22. (ক)

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. পারিবারিক কারবার কাকে বলে?
2. পারিবারিক কারবারের যে কোনো দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
3. ভারতবর্ষে পারিবারিক উদ্যোগের ভূমিকা (যে কোনো দুটি) উল্লেখ করুন।
4. পারিবারিক কারবারে বিরোধের যে কোনো দুটি কারণ উল্লেখ করুন।
5. পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির যে কোনো দুটি উপায় উল্লেখ করুন।

গ. দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. পারিবারিক কারবারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
2. ভারতের পারিবারিক উদ্যোগের ভূমিকা আলোচনা করুন।
3. পারিবারিক কারবারে বিরোধের কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।
4. পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির বিভিন্ন উপায় ব্যাখ্যা করুন।

একক-7 ❑ অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারি সংস্থা [Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)]

গঠন

7.0 উদ্দেশ্য

7.1 প্রস্তাবনা

7.2 সংজ্ঞা

7.3 অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারি সংস্থার ভূমিকা

7.4 অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারি সংস্থার অর্থসংস্থান

7.5 অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারি সংস্থার ব্যবস্থাপনা

7.6 সারাংশ

7.7 প্রশ্নাবলী

7.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন—

- অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবার বলতে কী বোঝায়
- অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারের ভূমিকা
- অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারের অর্থসংস্থান এবং ব্যবস্থাপনা

7.1 প্রস্তাবনা

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রায়তন কারবারি উদ্যোগগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অল্প মূলধনের সাহায্যে ক্ষুদ্রায়তন কারবার গঠন করা যায় এবং যে কোনো জায়গায় গড়ে তোলা যায় বলে এই ধরনের কারবারগুলি দেশের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে স্থাপিত হয়। ক্ষুদ্রায়তন কারবারগুলি প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং স্থানীয় ও জাতীয় উপকরণের কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করে এক দিকে গ্রামীণ-অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তোলে, গ্রাম্য জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে এবং অন্যদিকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতক উন্নয়নে সহায়তা করে। কীভারে বিষয়গুলি সম্ভব তা এই একক থেকে ধারণা পাওয়া যাবে।

7.2 সংজ্ঞা

কোনো দেশের শিল্পায়নের দুটি স্তম্ভ হল ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পসংস্থা। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংস্থার অস্তিত্ব খুব বেশি দেখা যায়, কারণ স্বাধীনতার পর থেকেই এই সংস্থাগুলিকে পরিকল্পনা কাঠামোয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। একারণেই ভারতীয় অর্থনৈতিক বিকাশে সাম্প্রতিকালেও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংস্থাগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব ও সুবিধা দেওয়া হয়। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন যা অধুনা নীতি আয়োগ (NITI AYOG) নামে পরিচিত, তারা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উদ্যোগকে 'গ্রামীণ ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (VSI)' নামে আখ্যা দিয়েছেন। এর মধ্যে যেমন আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন শিল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তেমনি ধ্রুপদী কুটিরশিল্প, গ্রামীণ শিল্প ও সহায়ক শিল্পও এর অন্তর্ভুক্ত।

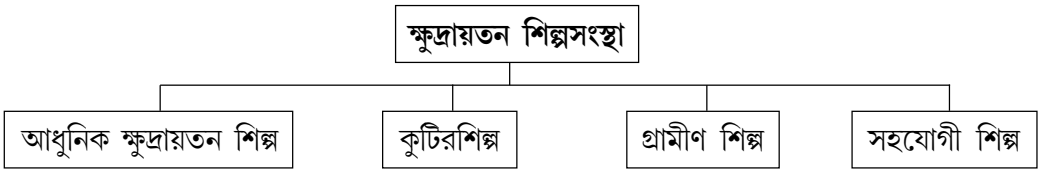

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংস্থাগুলি কাজের ভিত্তিতে মূলত পাঁচ ধরনের হয়। এগুলি হল উৎপাদন শিল্প, সরবরাহ শিল্প, সেবা শিল্প, সহযোগী শিল্প ও খনিজ বা খাদান শিল্প। এই ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংস্থাগুলিকে ও প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য 2006 সালে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্পসংস্থার উন্নয়ন আইন (MSMED Act) প্রবর্তন হয়। এই আইনে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্পসংস্থাগুলিকে দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি হল—

নির্মাণকারী শিল্পসংস্থা (Manufacturing Enterprises) :

1951 সালের শিল্পোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রথম তফশিলে (First Schedule of Industries [Development and Regulations] Act. 1951) উল্লিখিত শিল্প সংস্থাগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। এই আইন অনুসারে যেসব সংস্থা অন্য কোনো শিল্পের প্রয়োজনীয় পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদন বা নির্মাণ করে তাদেরকে নির্মাণকারী শিল্পসংস্থা বলা হয়। এই সংস্থাগুলি নির্মাণকারী শিল্পসংস্থা কিনা তা ঠিক করা হয় সংস্থার মেশিন ও যন্ত্রপাতিতে (Plant and Machinery) লগ্নির পরিমাণের উপর।

যেসব সংস্থা দ্রব্য নির্মাণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা মজুতকরণের কাজে যুক্ত থাকে অর্থাৎ **নির্মাণকারী সংস্থা** তাদের বিভিন্ন ধরনগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) **অতিক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা (Mini Enterpries) :** যেসব সংস্থার কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমাণ 25 লক্ষ টাকার বেশি নয় তাদের অতি-ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা বলা হয়। এখানে লগ্নি বলতে লগ্নির প্রকৃত মূল্যকে বোঝায় এবং জমি ও বাড়ির মূল্য এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(ii) **ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংস্থা (Small Enterprise) :** যেসব শিল্পসংস্থার কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমাণ 25 লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু 5 কোটি টাকার কম তাদের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংস্থা

বলে। উপরের অনুরূপ, এক্ষেত্রেও লগ্নির প্রকৃত পরিমাণ বলতে লগ্নির প্রকৃত মূল্যকে বোঝায় এবং জমি ও বাড়ির জন্য লগ্নি-এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(iii) **মাঝারি শিল্পসংস্থা (Medium Enterprise) :** যেসব শিল্পসংস্থার কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমাণ 5 কোটি টাকার বেশি কিন্তু 10 কোটি টাকার বেশি নয় এবং লগ্নির মধ্যে বাড়ি ও জমির মূল্য অন্তর্ভুক্ত হয় না তাদের মাঝারি শিল্প সংস্থা বলে।

সেবাপ্রদানকারী শিল্পসংস্থা (Service Enterprises) :

যেসব সংস্থা সেবা প্রদানের সাথে যুক্ত থাকে তাদের ধরন ঠিক করা হয় সংস্থার সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমাণের উপর।

সেবা প্রদানকারী সংস্থার ক্ষেত্রে MSMED Act. 2006-এর নির্দেশানুসারে যন্ত্রপাতিতে লগ্নি অর্থাৎ বাড়ি, জমির জন্য লগ্নির অর্থ বাদ দিয়ে সংস্থার ধরন নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা হয়। নীচের সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি লগ্নিভেদে অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থা হিসাবে গণ্য হয়—

(ক) যারা কম দূরত্বের রাস্তায় বা জলপথে পরিবহন যান চালায় তবে সংস্থার যানবাহনের সংখ্যা 10-এর বেশি নয়;

(খ) খুচরা কারবারি কিন্তু তাদের ঋণ-সীমা (Credit Limit) 10 লক্ষ টাকার বেশি নয়;

(গ) ক্ষুদ্রায়তন কারবার যাদের ব্যবসার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রকৃত ক্রয়মূল্য 20 লক্ষ টাকার বেশি নয়;

(ঘ) পেশাজীবী ও স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তি যাদের ঋণ করার সর্বাধিক সীমা 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত যার মধ্যে 2 লক্ষ টাকা কার্যকরি মূলধনের জন্যে। তবে ওই ব্যক্তি যদি পেশাজীবি ডাক্তার হন এবং গ্রাম বা শহরতলিতে তিনি চিকিৎসা পরিষেবা দেন তাহলে তাঁর ঋণ করার সীমা 15 লক্ষ টাকা পর্যন্ত যার মধ্যে 3 লক্ষ টাকা কার্যকরি মূলধনের জন্য।

সুতরাং সেবা বা পরিষেবা দানকারী সংস্থার বিভিন্ন বিভাগগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) **অতিক্ষুদ্র সেবাদানকারী সংস্থা (Micro Enterprise) :** যেসব সংস্থার সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিতে লগ্নির প্রকৃত ক্রয়মূল্য 10 লক্ষ টাকার বেশি নয় তাদের অতি-ক্ষুদ্র সেবাদানকারী সংস্থা বলা হয়।

(ii) **ক্ষুদ্রায়তন সেবাদানকারী সংস্থা (Small Enterprise) :** যেসব সেবাপ্রদানকারী সংস্থার সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য লগ্নির পরিমাণ 10 লক্ষ টাকা থেকে 2 কোটি টাকা পর্যন্ত তাদের ক্ষুদ্রায়তন সেবাদানকারী সংস্থা বলা হয়।

(iii) **মাঝারি সেবাপ্রদানকারী সংস্থা (Medium Enterprise) :** যেসব সংস্থার সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য লগ্নির পরিমাণ 2 কোটি টাকার থেকে 5 কোটি টাকা তাদের মাঝারি সেবা প্রদানকারী সংস্থা বলে।

এক নজরে বিভিন্ন সংস্থার লগ্নি চিত্র

সংস্থার ধরন	নির্মাণ ক্ষেত্রের সংস্থা (কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমাণ)	সেবাক্ষেত্রের সংস্থা (প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমাণ)
(i) অতি-ক্ষুদ্র (Micro)	25 লক্ষ টাকার বেশি নয়	10 লক্ষ টাকার বেশি নয়
(ii) ক্ষুদ্রায়তন (Small)	25 লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু সর্বাধিক 5 কোটি টাকা	10 লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু 2 কোটি টাকার বেশি নয়
(iii) মাঝারি (Medium)	5 কোটি টাকার বেশি কিন্তু 10 কোটি টাকার বেশি নয়	2 কোটি টাকার বেশি কিন্তু 5 কোটি টাকার বেশি নয়

MSMED Act 2006 অনুসারে MSME-র সংজ্ঞা ঠিক করা হলেও 1লা জুলাই, 2020 থেকে অতিক্ষুদ্র (Small), ক্ষুদ্রায়তন (Small) ও মাঝারি (Medium) শিল্প সংস্থার সংজ্ঞা পরিবর্তন করা হয়েছে যেখানে নির্মাণ ক্ষেত্র (Manufacting) ও সেবা ক্ষেত্রের (Service)-এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। নতুন নিয়মানুসারে দুটি শর্তের কথা বলা হয়েছে যেমন—(i) যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমাণ ও (ii) বাৎসরিক আয় (Annual turnover)। শর্তগুলি নিম্নরূপ—

সংস্থার ধরন	বিবরণ বা শর্ত
(i) অতিক্ষুদ্র (Micro)	(i) যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমাণ : 1 কোটি টাকার বেশি নয় এবং (ii) বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ : 5 কোটি টাকার বেশি নয়।
(ii) ক্ষুদ্রায়তন (Small)	(i) যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমাণ : 10 কোটি টাকার বেশি নয় (ii) বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ : 50 কোটি টাকার বেশি নয়
(iii) মাঝারি (Medium)	(i) যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমাণ : 50 কোটি টাকার বেশি নয় এবং (ii) বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ : 250 কোটি টাকার বেশি নয়

MSME-র চতুর্থ আদমশুমারি (4th Census of MSME) :

ভারতবর্ষে অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থার আদমশুমারি চালানো হয়। এই সমীক্ষা থেকে ভারতে নিবন্ধিত MSME সংস্থাগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। নীচের ছকে 2009-10 সালে নিবন্ধিত MSME-র সংখ্যা এবং তাদের মধ্যে নির্মাণ সংস্থা ও সেবাপ্রদানকারী সংস্থার সংখ্যাসহ প্রতিটির শতকরা হার তুলে ধরা হল।

বিবরণ (Particulars)	**অতিক্ষুদ্র (Micro)**	**ক্ষুদ্রায়তন (Small)**	**মাঝারি (Medium)**	**মোট (Total)**
1. নির্মাণকারী সংস্থার সংখ্যা	9,74,610	57,670	2,830	10,35,100
2. সেবা প্রদানকারী সংস্থার সংখ্যা	5,01,070	15,910	400	5,17,390
3. মোট MSME-র সংখ্যা	14,75,680	73,580	3,230	15,52,490
4. শতকরা হিসাবে	95.05	4.74	0.21	100
5. শতকরা হিসাবে নির্মাণকারী সংস্থা	94.16	5.57	0.27	66.67
6. শতকরা হিসাবে সেবা প্রয়োজনীয় সংস্থা	96.85	3.08	0.08	33.33

উৎস : ভারত সরকারের MSME মন্ত্রক, বার্ষিক প্রতিবেদন 2009-10

মালিকানার দিক থেকে দেখা যায় যে MSME-র সিংহভাগ মালিকানা রয়েছে একক মালিকানায় (Proprietorship)। এদের সংখ্যা সর্বাধিক এবং যা মোট MSME-এ 90 শতাংশের মতো। এর পরেই রয়েছে অংশীদারি সংস্থা হিসাবে যেসব MSME গড়ে উঠেছে। এর পর ক্রমান্বয়ে ঘরোয়া কোম্পানি বা সার্বজনিক কোম্পানি হিসাবে যেসব MSME গড়ে উঠেছে তারা রয়েছে। অল্প কিছু MSME সমবায় সমিতি হিসাবেও গড়ে উঠেছে। 2009-10 সালে প্রকাশিত ভারত সরকারের MSME মন্ত্রক দ্বারা প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের এ সংক্রান্ত তথ্য টেবিলাকারে নীচে তুলে ধরা হল।

মালিকানা ধরন (Ownership Pattern)	**সংখ্যা (Number)**	**শতকরা Percentage)**
1. এক-মালিকানাধীন সংস্থা	14,02,800	90.36
2. অংশীদারি সংস্থা	59,800	3.85
3. ঘরোয়া কোম্পানি	41,700	2.69
4. সার্বজনিক কোম্পানি	8,200	0.53
5. সমবায় সমিতি	4,600	0.30
6. অন্যান্য	35,300	2.27
মোট	**15,52,400**	**100**

রিপোর্টে MSME-র অন্যান্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল যে দেশের GDP-তে এদের অবদান 8%। নির্মাণকারী সংস্থার মোট উৎপাদনের প্রায় 45 শতাংশ উৎপাদন এই অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলি (MSME) করে থাকে। এছাড়াও ভারতের মোট রপ্তানির প্রায় 40 শতাংশ এই ক্ষেত্র থেকে রপ্তানি হয়। এছাড়াও এসব সংস্থার উচ্চ শ্রমিক-মূলধন অনুপাত, উচ্চ বৃদ্ধি ও উচ্চ ব্যাপকতার কারণে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নলক্ষ্য অর্জন করা সহজ হয়। MSME-র চতুর্থ আদমশুমারি অনুসারে এই সংস্থাগুলিতে প্রায় 6 কোটি লোকের কর্মসংস্থান হয়। এদের মধ্যে নির্মাণ শিল্পে 28 শতাংশ ও সেবা প্রদানকারী শিল্পসংস্থায় 72 শতাংশ। এসব সংস্থার শ্রমিক-মূলধন অনুপাত ও সার্বিক বৃদ্ধি বৃহৎ শিল্পসংস্থার তুলনায় অনেক বেশি। সেকারণেই ভারত সরকার MSME সংস্থাগুলির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে তাদের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করে থাকেন। তাই আশা করা হয় যে এই সংস্থাগুলির অংশ জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এবং রপ্তানি ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাবে এবং এদের মাধ্যমেই দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও প্রগতি নতুন গতি পাবে।

2020 সালে ভারত সরকার অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারি সংস্থায় লগ্নির পরিমান পরিবর্তন করে বিনিয়োগের এবং বিক্রয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন কারবারি সংস্থার সংজ্ঞা পুনরায় ঠিক করেন। নতুন লগ্নিচিত্রটি হল নিম্নরূপ :

নতুন লগ্নিচিত্র (2020 সালে ঘোষণা অনুযায়ী)

সংস্থার ধরন	নির্মাণ ক্ষেত্রের সংস্থা বিনিয়োগ এবং বাৎসরিক বিক্রয় (Turnover)	সেবা ক্ষেত্রের সংস্থা বিনিয়োগ এবং বাৎসরিক বিক্রয় (Turnover)
(i) অতিক্ষুদ্র (Micro)	বিনিয়োগে এক কোটি টাকার বেশি নয়	বিক্রয় (Turnover) পাঁচ কোটি টাকার টাকার বেশি নয়
(ii) ক্ষুদ্র (Small)	বিনিয়োগে এক কোটি টাকার বেশি কিন্তু দশ কোটি টাকার বেশি নয়	বিক্রয় (Turnover) পাঁচ কোটি টাকার বেশি কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার বেশি নয়
(iii) মাঝারি (Medium)	বিনিয়োগে দশ কোটি টাকার বেশি কিন্তু কুড়ি কোটি টাকার বেশি নয়	বিক্রয় (Turnover) পঞ্চাশ কোটি টাকার বেশি কিন্তু একশত কোটি টাকার বেশি নয়

Note : বিনিয়োগ (Investment) এবং বিক্রয় (Turnover)

7.3 অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারি সংস্থার ভূমিকা

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাত্যহিক চাহিদা মেটানোর কাজে এবং জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ নিষ্পত্তির কাজে নিযুক্ত থাকে। এই ধরনের কারবারের ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হল :

ক. অর্থনৈতিক ভূমিকা (Economic Role)

(i) **কম মূলধন :** উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হল বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের অপ্রতুলতা। কাজেই যাদের স্বল্প পরিমান মূলধন আছে অথচ বড় প্রতিষ্ঠানে শেয়ার কিনে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নন তাঁদের পক্ষে স্বল্প মূলধন নিয়ে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবার স্থাপন করা মোটেই অসুবিধাজনক নয়।

(ii) **কর্ম সংস্থানের সুযোগ :** ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগগুলি সাধারণত শ্রম-নিবিড়। স্বল্প মূলধন নিয়ে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করে এই ধরনের উদ্যোগগুলি পরিচালিত হয়। ফলে এই শিল্পগুলিতে কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ তৈরি হয়। অল্প মূলধনে ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবার গড়ে তোলা যায় বলে বেশি সংখ্যক উদ্যোক্তা এই ধরনের কারবার স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

(iii) **উপযোগিতা সৃষ্টি :** কিছু প্রতিবন্ধকতামূলক উপাদান থাকায় এই জাতীয় কারবারের সম্প্রসারণের সুযোগ খুবই কম। তাদের কাজকর্মের পরিধি স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। স্থানীয়

জনসাধারণের চাহিদা এবং অভাব-অভিযোগ মেটানো হয়। স্থানীয় উৎসের যথাযথ ব্যবহার করে উপযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব এবং উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় লোকের চাহিদা মেটানো যায়।

(iv) **কম ঝুঁকি :** বৃহদায়তন কারবারের তুলনায় অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার পরিমান অনেক কম। ক্ষুদ্রায়তন কারবারে কম মূলধন প্রয়োজন। স্বল্প উৎপাদনের ঝুঁকিও এখানে কম থাকে। কাজেই যদি কারবারের লোকসান হয় তাহলে তার পরিমান খুব কমই হবে।

(v) **কম উৎপাদন ব্যয় :** এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যে সব বিভিন্ন উপাদান প্রয়োজন অর্থাৎ কাঁচামাল, শ্রম, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সবই স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায়। পরিবহন ব্যয় খুবই কম। অন্যান্য উপরিব্যয়ের খরচও খুব সামান্য। ফলে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় স্বাভাবিকভাবেই কম হয়।

(vi) **নতুন বাজার সৃষ্টি :** ক্রেতাদের সঙ্গে মালিকের সরাসরি যোগাযোগ থাকে সুতরাং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেসব ক্রেতা বসবাস করেন তাদের চাহিদা মেটানোর দিকে মালিক যথাযথ মনোযোগ দেন। এভাবে নতুন বাজার সৃষ্টি করাও সম্ভব।

(vii) **নমনীয়তা :** দেশের সার্বিক পরিবেশের ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে এই সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা খুবই কষ্টকর যদি না পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, যা প্রধানত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্ষুদ্র কারবারগুলির যথেষ্ট নমনীয়তা থাকায় পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

(viii) **নিয়োগ কর্তা ও কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক :** অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারে মালিক তাঁর কাজের সুবিধার জন্য কিছু সহকারি কর্মী নিয়োগ করেন। এইসব কর্মীদের সঙ্গে মালিকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে বলে তাদের অভাব-অভিযোগ, সমস্যা-অসুবিধা প্রভৃতির দিকে তিনি নজর দিতে পারেন। ফলে মালিক ও কর্মীদের মধ্যে এক সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

(ix) **ভোগকারিগণের সন্তুষ্টি প্রদান :** বিভিন্ন সৌখিন দ্রব্য সামগ্রী প্রধানত ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানেই উৎপাদন করা হয়। ভোগকারিগণের সঙ্গে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকের সরাসরি যোগাযোগ থাকায় মালিক সহজেই তাঁদের রুচি-পছন্দ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করেন। পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য সংগ্রহ করে ভোগকারিগণও সন্তুষ্টি লাভ করেন।

(x) **উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ :** অনেক মানুষের মধ্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও উদ্যোগ গ্রহণের মনোবল থাকে। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারি ক্ষেত্রে সেই ক্ষমতা ও মনোবল প্রয়োগের সুযোগ দান করে। ফলে বহু ব্যক্তির দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। এইভাবে ক্ষুদ্রায়তন কারবারি উদ্যোগ মানব সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে।

খ. সামাজিক ভূমিকা (Social Role)

(i) **সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা :** অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারের মাধ্যমে গণ-উৎপাদন ও গণ-বণ্টন সম্ভব। ফলে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব।

(ii) **আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ :** বৃহদায়তন শিল্প গঠনের জন্য প্রচুর মূলধন ছাড়াও উন্নত ধরনের প্রযুক্তিও প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে পরিকাঠামোর যথেষ্ট অভাব থাকার দরুন সেখানে বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। ঐ সব অঞ্চলে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প স্থাপন করা যায়। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প স্থাপন করে এভাবে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো যায় এবং আঞ্চলিক বৈষম্য অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব হয়।

(iii) **আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস :** ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উদ্যোগ আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যদি অধিক সংখ্যক অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা যায়, তাহলে নতুন নতুন কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং কিছুটা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা যাবে।

(iv) **দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার :** ক্ষুদ্র শিল্পে সরল উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় বলে বিদেশি প্রযুক্তি আমদানি করার প্রয়োজন হয় না। ক্ষুদ্র শিল্পে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগের যথেষ্ট সামাজিক গুরুত্ব বর্তমান।

(v) **সুপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার :** স্থানীয় সম্পদকে ব্যবহার করে ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবার গড়ে তোলা যায়। কাজেই স্থানীয়ভাবে যে সম্পদ এতদিন অজ্ঞাত বা সুপ্ত ছিল, সেগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে শিল্প সম্পর্কে সচেতনতা জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে।

(vi) **পুরাতন ঐতিহ্য রক্ষা :** ক্ষুদ্র কারবার স্থাপনের মাধ্যমে পুরানো ঐতিহ্য রক্ষা করা এবং বজায় রাখা সম্ভব হয়। কোনো-না-কোনোভাবে প্রতিটি দেশই নিজ নিজ ঐতিহ্য বজায় রাখতে চায়, ফলে দেশের গৌরব ও ঐতিহ্য সুরক্ষিত থাকে।

7.4 অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারি সংস্থার অর্থসংস্থান

এই ধরনের কারবারের মূলধনের পরিমান অল্প, কারবার গঠন ও দৈনন্দিন কার্য নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উদ্যোক্তাগণ তাঁদের ব্যক্তিগত উৎস থেকে সংগ্রহ করেন। কারবার সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলে ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারে উৎসাহদানের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক এবং সরকারি অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণদানের ব্যবস্থা করেছে।

ছোট ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য এবং পরিকাঠামো সরবরাহ করে সরকার সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে সরকারের জটিল নিয়মকানুন এবং

দীর্ঘসূত্রিতা অতিক্রম করে সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পারেন। এছাড়া সরকার যে পরিমান সাহায্য দিয়ে থাকেন তা পর্যাপ্ত পরিমানের না হওয়ায় সকল উদ্যোক্তার পক্ষে এটা উপভোগ করা সম্ভব হয় না। যাঁরা প্রভাবশালী এবং সৌভাগ্যবান তাঁরাই সরকারি সাহায্যের সিংহভাগ উপভোগ করেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা দেয়।

7.5 অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারি সংস্থার ব্যবস্থাপনা

এই ধরনের কারবারি উদ্যোগগুলির কার্যাবলি পরিচালনা করা অনেক সহজ। এদের পরিচালনার জন্য খুব বেশি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকলেও এই ধরনের উদ্যোগ পরিচালনা করতে কোন অসুবিধা হয় না। কারবারের আয়তন ছোট হওয়ায় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তেমন কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয় না। সহজ পরিচালনার জন্য এই ধরনের কারবার খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই ধরনের কারবারের ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করেন উদ্যোগের মালিক নিজেই। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করার জন্য কিছু বেতনভুক সাহায্যকারী নিয়োগ করা হয়। তবে মালিকই সর্বেসর্বা। তিনি কারবারের সব দিকই দেখেন। এতে অবশ্য তাঁর কারবারি স্বার্থও সুরক্ষিত হয়।

7.6 সারাংশ

উদ্যোগ গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবার হল নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য এক ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি। এই ধরনের কারবার বলতে এক বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক নিজেদের প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন এক বিশিষ্ট এলাকার মধ্যে কাজ করার জন্য ছোট আয়তনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করা বোঝায়। এই এককটি পাঠ করে আমরা সকলে যে বিষয়গুলি জানতে পারলাম তা হল—

- অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবার বলতে কী বোঝায়
- অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারের ভূমিকা
- অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারের অর্থসংস্থান এবং ব্যবস্থাপনা

7.7 প্রশ্নাবলী

ক. এমসিকিউ প্রশ্নাবলি

1. MSMED আইন কত সালে প্রবর্তিত হয়েছিল?

(ক) 2000 সালে (খ) 2003 সালে

(গ) 2005 সালে (ঘ) 2006 সালে

2. 1951 সালের শিল্পোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রথম তফশিলে উল্লিখিত শিল্পসংস্থাগুলিকে কী শিল্প বলা হয়?

(ক) সেবা শিল্প (খ) নির্মাণকারী শিল্প

(গ) খনিজ বা খাদান শিল্প (ঘ) সহযোগী শিল্প

3. পণ্য উৎপাদন করে যেসব শিল্পসংস্থার কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমান 10 কোটি থেকে 20 কোটি টাকা পর্যন্ত তারা কী নামে পরিচিত? (2020 সালের নিয়ম অনুসারে)

(ক) অতিক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা (Micro Enterprise)

(খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংস্থা (Small Enterprise)

(গ) মাঝারি শিল্পসংস্থা (Medium Enterprise)

(ঘ) সবগুলিই

4. যেসব নির্মাণকারী শিল্পে কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ 1 কোটি থেকে 10 কোটি টাকা তারা কী নামে পরিচিত? (2020 সালের নিয়ম অনুসারে)

(ক) অতিক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা (খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংস্থা

(গ) মাঝারি শিল্পসংস্থা (ঘ) কোনোটিই নয়

5. একটি মাঝারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য লগ্নির ন্যূনতম ও সর্বাধিক লগ্নির পরিমান কত? (2020 সালের নিয়ম অনুসারে)

(ক) 10 লক্ষ টাকা ও 2 কোটি টাকা (খ) 50 কোটি ও 100 কোটি টাকা

(গ) 10 লক্ষ টাকা ও 1 কোটি টাকা (ঘ) কোনোটিই সঠিক নয়

6. যেসব সেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য লগ্নির ন্যূনতম ও সর্বাধিক লগ্নির পরিমান 2 লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু 2 কোটির বেশি নয় তাদের বলা হয়— (2020 সালের ঠিক আগের নিয়ম অনুসারে)

(ক) অতিক্ষুদ্র (Micro) (খ) ক্ষুদ্রায়তন (Small)

(গ) মাঝারি (Medium) (ঘ) কোনোটিই নয়

7. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি কারবারি সংস্থাদের (MSME) মধ্যে কোন ধরনের কারবারের সংখ্যা সর্বাধিক?

(ক) একমালিকানাধীন সংস্থা (খ) অংশীদারি সংস্থা

(গ) সমবায় সংস্থা (ঘ) যৌথ মূলধনী কোম্পানি

8. ভারতের GDP-তে MSME-র অবদান মোটামুটিভাবে কত?

(ক) 4% (খ) 6%

(গ) 8% (ঘ) 10%

9. MSME-র চতুর্থ আদমশুমারি (Census) অনুসারে এসব সংস্থায় কত লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে?

(ক) 2 কোটি (খ) 4 কোটি

(গ) 6 কোটি (ঘ) 8 কোটি

10. নীচের কোনটি প্রাচীনতম টিকে থাকা সামাজিক ব্যবস্থা?

(ক) কারবার (খ) পরিবার

(গ) সমবায় (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: 1. (ঘ) 2. (খ) 3. (গ) 4. (খ) 5. (খ)
6. (খ) 7. (ক) 8. (গ) 9. (গ) 10. (খ)

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. অতিক্ষুদ্র কারবার কাকে বলে?
2. ক্ষুদ্র কারবার বলতে কী বোঝায়?
3. মাঝারি কারবার কাকে বলে?
4. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পসংস্থা আইন ভারতে কোন বছরে প্রবর্তন করা হয়?
5. অতিক্ষুদ্র কারবারের অর্থসংস্থান কিভাবে হয়?

গ. দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারের অর্থনৈতিক ভূমিকা আলোচনা করুন।
2. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারের সামাজিক ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
3. 1951 সালের শিল্পোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রথম তফশিলে উল্লিখিত শিল্প সংস্থাগুলি কি কি?
4. অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কারবারের অর্থসংস্থান এবং ব্যবস্থাপনা আলোচনা করুন।

একক-8 ❑ বিভিন্ন প্রতিনিধির ভূমিকা এবং কার্যাবলি (Role and Functions of Different Agencies)

গঠন

8.0 উদ্দেশ্য

8.1 প্রস্তাবনা

8.2 শিল্প সংক্রান্ত অভিযোজন

8.3 উদ্যোক্তা সমিতির ভূমিকা

8.4 উদ্যোগ গ্রহণে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর ভূমিকা

8.5 কারবারি ইনক্যুবেটর

8.5.1 কারবারি ইনক্যুবেটরের ভূমিকা

8.5.2 কারবারি ইনক্যুবেটরের কার্যাবলি

8.6 দেবদূত লগ্নিকারী

8.6.1 দেবদূত লগ্নিকারীর ভূমিকা

8.6.2 দেবদূত লগ্নিকারীর কার্যাবলি

8.7 উদ্যোগ মূলধন

8.7.1 উদ্যোগ তহবিলের ভূমিকা

8.7.2 উদ্যোগ মূলধনের কার্যাবলি

8.8 প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ড

8.9 সারাংশ

8.10 প্রশ্নাবলী

8.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন—

- উদ্যোক্তা সমিতির ভূমিকা
- উদ্যোগ গ্রহণে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর ভূমিকা
- কারবারি ইনক্যুরেটর, দেবদূত লগ্নিকারী উদ্যোগ মূলধন এবং প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ড

8.1 প্রস্তাবনা

উদ্যোগ গড়ে তোলা কোনো সহজ কাজ নয়। উদ্যোগ গঠন হল স্বপ্নের বাস্তবায়ন। উদ্যোক্তা যে স্বপ্ন দেখেন তা সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ পায় উদ্যোগের মধ্যে। উদ্যোগ গড়ার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা দেখা যায়। এই উদ্দীপনা দু-ধরনের—অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। উদ্যোগের অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা তাকে উদ্যোগ গড়ে তুলতে উৎসাহ দেয়। আর বাহ্যিক পরিবেশ যখন উদ্যোগ গড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয় তখন উদ্যোগ গঠন গতিশীল হয়। একেই বলে বাহ্যিক উদ্দীপনা যা কারবারি পরিবেশ থেকে উদ্ভূত হয় আবার উদ্যোগকে গতিশীল এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে বিভিন্ন সমিতি, গোষ্ঠী, উদ্যেগ মূলধন, দেবদূত লগ্নিকারীসহ বিভিন্ন প্রতিনিধি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই এককে আমরা বিভিন্ন প্রতিনিধির ভূমিকা এবং কার্যাবলি সম্পর্কে জানতে পারব।

8.2 শিল্প সংক্রান্ত অভিযোজন

উদ্যোগ গড়ে তোলা সহজ কাজ নয়। নতুন কোনো ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা থাকলে উদ্যোগ গড়ে তোলা হয়। একটি শিল্প উদ্যোগ গড়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত পরিবেশ ও শিল্পের উপযোগী পরিকাঠামো থাকলে সেখানে উদ্যোগ স্থাপন করা হয়। একেই শিল্প সংক্রান্ত অভিযোজন বা শিল্প স্থাপন বলে। শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান বলতে বোঝায় যেখানে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সুবিধা রয়েছে এবং শিল্প স্থাপনের স্থান বা জায়গা সরকার উদ্যোক্তাকে দেয় যাতে তারা শিল্প গড়ে তুলতে পারে। ভারতবর্ষে এদের শিল্প তালুক আখ্যা দেওয়া হয়। এই শিল্প তালুক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও এগুলি গ্রামীণ ও পশ্চাৎপদ এলাকায় শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলতে ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতেও সাহায্য করে। এরা বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন—শিল্পাঞ্চল, শিল্প-পার্ক, শিল্প এলাকা ইত্যাদি।

যে শিল্প তালুকে শিল্পের কারখানা গড়ে তোলা হয় সেখানে অনুরূপ শিল্প কারখানা কেন্দ্রীভূত হয় এবং শিল্প স্থানিকভাবে সুবিধা অর্জন করা যায়। শিল্পের জায়গা বা স্থানে শিল্প গঠনের প্রয়োজনীয় সুবিধা যেমন জল, পরিবহন, বিদ্যুৎ, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, ক্যান্টিন, প্রাথমিক চিকিৎসা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা জনিত সুবিধা ও অন্যান্য সাধারণ সুবিধা থাকে। অর্থাৎ শিল্প গড়ে তোলার জায়গাটি ছোট প্লটে বিভক্ত করে কারখানা স্থাপনের উপযোগী করে তোলা হয়। এজন্য একটি সুসংহত পরিকল্পনা তৈরি করা হয় যাতে শিল্প-সমাজের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়।

উদ্দেশ্য (Objective)

শিল্পগত অভিযোজন বা শিল্প স্থাপনে শিল্প তালুকের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল :

(i) উদ্যোক্তাদের উদ্যোগের কারখানা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা;

(ii) দেশের ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়নকে উৎসাহিত করা;

(iii) গ্রামীণ ও পশ্চাৎপদ এলাকায় শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ;

(iv) বৃহৎ শিল্পকারখানার সহযোগী শিল্প হিসাবে উদ্যোগ স্থাপন;

(v) উদ্যোগ উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং উদ্যোগের কাজকর্ম যাতে বিনা বাধায় চলতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

8.3 উদ্যোক্তা সমিতির ভূমিকা

ভারতের উদ্যোক্তাদের সমিতি 2016 সালের 8 ফেব্রুয়ারি একটি ঘরোয়া কোম্পানি হিসাবে গড়ে ওঠে। এর প্রধান কার্যালয় দিল্লিতে অবস্থিত। এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হল 10 লক্ষ টাকা এবং আদায়িকৃত মূলধনের পরিমাণ হল 1 লক্ষ টাকা। এটি একটি ঘরোয়া কোম্পানি হিসাবে গড়ে উঠলেও এর উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়। এর মূখ্য উদ্দেশ্য হল জেলাস্তরে উদ্যোক্তা এবং স্টার্ট-আপ ব্যবসায় শুরু করার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা ও রাজ্যের জন্য উদ্যোগ নীতি তৈরি করা। উদ্যোক্তা সমিতি এযাবৎ বিভিন্ন রাজ্যের জেলাস্তরের উদ্যোক্তাদের চিহ্নিত করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে তারা অংশীদার গড়ে তুলেছে এবং সমস্ত উদ্ভাবন মনস্ক যুবককে একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্মে আনার জন্য কাজ করে চলেছে। উদ্যোক্তাদের সমিতি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন বা সমিতির সহায়তায় নিউ দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে 2017 সালে 26 আগস্ট 'জাতীয় কৃষি উদ্যোক্তা সম্মেলন' (National Agropreneur Summit) অনুষ্ঠিত করে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের কৃষকদের সশক্তিকরণ (Empowerment)। এজন্য সমিতি যুবক উদ্যোক্তাদের কৃষি উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য প্রচারের সাথে সাথে তাদের কৃষিক্ষেত্রে আকর্ষণ, তাদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলা এবং তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে ও কৃষি সহযোগী ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোক্তাদের আকর্ষণ করা ও কৃষি উদ্যোগ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করাই ছিল সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ ভারতীয় অর্থনীতি এখনও কৃষি নির্ভর এবং সাথে সাথে গতানুগতিক। তাই এই ক্ষেত্রকে আধুনিক করে তুলতে ও দেশের কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সমিতি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা করে। এই জাতীয় সম্মেলনে যেমন যুবক ও স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তারা যোগদান করেছিল তেমনি বিভিন্ন কৃষি বিশেষজ্ঞ, ডেয়ারি শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য চাষ, উদ্যান পালন, ই-বাণিজ্য, প্যাকেটজাত খাদ্য, কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী, কৃষি প্রযুক্তি, রপ্তানি ও আমদানিকারক ব্যক্তিরা ওই সম্মেলনে যোগদান করে ভারতীয় কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচনা করে। এদের মধ্যে ভারতের অগ্রণী ও সফল কৃষি উদ্যোক্তারাও যোগদান করেন। সংক্ষেপে এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষি সহযোগী ক্ষেত্রে যুবকদের ও নতুন ধারণার উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং সম্মেলনে স্থির হয় যে পরবর্তী 5 বছরে ভারতের কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রে 1 লক্ষ কৃষি উদ্যোক্তা গড়ে তোলা। উদ্যোক্তা সমিতি অদ্যাবিধি যেসব ভূমিকা পালন করেছে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) ভারতের কৃষিক্ষেত্রকে আকষর্ণীয় করে তোলা যাতে যুবক উদ্যোক্তারা তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা নিয়ে নতুন কৃষি উদ্যোগ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসে।

(ii) যাতে ভারতের 707টি জেলা থেকেই প্রতিনিধিরা বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করে তার ব্যবস্থা করা।

(iii) কৃষি উদ্যোগের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের জন্য 20টি জাতীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করা

(iv) সর্বোত্তম ধারণা নিয়ে কৃষি ও কৃষি সহায়ক উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 1 কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা।

(v) কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিদেশি সরকারের সাথে জ্ঞানের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(vi) কৃষিক্ষেত্রে পেশাদারি কারবারি দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজন হলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহায়তা নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

(vii) দেশের অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন IIM, IIT থেকে প্রয়োজনে পরামর্শ পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

(viii) কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের সাথে সাথে জৈব বৈচিত্র্য যাতে বজায় থাকে ও পরিবেশের ভারসাম্য যাতে কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

উদ্যোক্তা সমিতি 2016 সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই স্বল্প সময়ে যে ভূমিকা পালন করেছে তা হল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কেবলমাত্র পণ্য বা সেবা উৎপাদনের দিকে গুরুত্ব না দিয়ে কৃষিক্ষেত্রকে অধিক গুরুত্ব দিলে উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এবং ভারতীয় অর্থনীতিও এর প্রভাবে শক্তিশালী হবে।

8.4 উদ্যোগ গ্রহণে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর ভূমিকা

দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচি দারিদ্র্য ও অন্যান্য সামাজিক বৈষম্য দূর করতে যথেষ্ট নয়। সাথে সাথে এসবের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান হওয়াও সম্ভব নয়। কারণ সম্পদ, কর্মসংস্থান ও শিক্ষা হল সীমিত এবং এর ফলে বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ, কষ্টের মধ্যে জীবন কাটায়। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটি কৌশল হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য সামাজিক উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা। বিভিন্ন সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সামাজিক সমস্যাগুলি দূর করার জন্য উদ্ভাবন ও স্থানীয় সম্পদগুলিকে কাজে লাগায়। সামাজিক উদ্যোগগুলি অন্যান্য কারবারি উদ্যোগ থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্র। সামাজিক উদ্যোগ কর্মসূচি সমাজ পরিবর্তনের অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করে। ভারতবর্ষ জুড়ে সামাজিক উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়েছে এসব স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) মাধ্যমে।

স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী হল একটি গ্রামভিত্তিক মধ্যবর্তী আর্থিক সংস্থা যা সাধারণভাবে স্থানীয় 10 থেকে 20 জন মহিলাকে নিয়ে গড়ে ওঠে। যদিও অন্য দেশেও অল্প-বিস্তার এধরনের গোষ্ঠী বিশেষত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেখা যায় তবে ভারতবর্ষে এ ধরনের গোষ্ঠী সর্বাধিক। গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেরাই

নিয়মিতভাবে অল্প পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় হিসাবে প্রতি মাসে গোষ্ঠীতে জমা দেয় এবং যতদিন না পর্যন্ত গোষ্ঠীর এভাবে সংগৃহীত অর্থ সদস্যদের মধ্যে ঋণ হিসাবে বণ্টনের উপযোগী হয়। এভাবে সংগৃহীত তহবিল থেকে সদস্য বা গ্রামের অন্য কারও প্রয়োজনে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। ভারতে অনেক স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে যারা কম পরিমাণ ঋণ (Micro-Credit) দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত। মাইক্রো-ক্রেডিট বা স্বল্প ঋণ বলতে কম পরিমাণে ঋণ যা গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের তাৎক্ষণিক ঋণের প্রয়োজন মেটায়।

স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী যে দৃষ্টিভঙ্গির উপর গড়ে উঠেছে তা হল 'মহিলাদের সাহায্য করা যাতে তারা স্ব-নির্ভর হয়ে ওঠে'। বর্তমানকালে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন কৌশল হল মহিলাদের সশক্তিকরণ (Women Empowerment)। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যাতে গরিব গ্রামীণ মহিলাদের স্বল্প পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

একটি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত হতে পারে। এই গোষ্ঠী কিছু ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের নিয়ে গড়ে ওঠে যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমরূপ। এদের উদ্দেশ্যও এক অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিয়মিতভাবে স্বল্প পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে গোষ্ঠীর তহবিলে প্রদান করা এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের আপৎকালীন প্রয়োজন মেটানো। সদস্যরা তাদের ব্যক্তিগত সম্পদও অনেকসময় গোষ্ঠীতে প্রদান করে যাতে গোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থা মজবুত হয়। গোষ্ঠীর তহবিল থেকে সদস্যরা ঋণ নিয়ে স্ব-নিযুক্ত হয়। প্রত্যেক সদস্যই সম্মিলিত স্বাধীনতা ভোগ করে এবং ঋণ গ্রহীতা যাতে সঠিকভাবে ঋণ ব্যবহার করে এবং ঋণ পরিশোধ করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে। এর ফলে ঋণের জন্য বন্ধকের প্রয়োজন হয় না, পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে ঋণ দেওয়া হয় যা সাধারণত ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়। ঋণের ক্ষেত্রে একই সুদের হার এবং সরল হিসাবরক্ষণ সাধারণভাবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত হয়।

বর্তমানে মহিলা স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী ভারতে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য এর পিছনে প্রধান কারণ হল কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও নাবার্ড (NABARD—National Bank for Agriculture and Rural Development) মহিলা সশক্তিকরণের লক্ষ্যে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে থাকেন। এর ফলে ভারতে লিঙ্গ-বৈষম্যও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও নীতিগত যেসব প্রচেষ্টা এ ধরনের গোষ্ঠীর উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল '**গ্রামীণ এলাকার মহিলা ও শিশুদের উন্নয়ন কর্মসূচি**' (DWACRA—Development of Women and Children in Rural Areas Programme) এবং '**দক্ষিণ এশিয়া দারিদ্র্য দূরীকরণ মডেল**' (SAPAP—South Asia Poverty Alleviation Programme)। **সাপাপ** (SAPAP)-এর ক্ষেত্রে **রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি** (UNDP) থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়। এই কর্মসূচিটি সার্কভুক্ত দেশগুলির ঢাকা সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাকে অর্থাৎ '**দারিদ্র্য দূরীকরণ ও লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস**' (Eradication of Poverty and Reduction of Gender Inequality) সার্থক করার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছিল। স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী যেহেতু সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে অর্থাৎ অসাম্য থেকে সাম্য, কর্মহীন থেকে স্বকর্মে নিযুক্তি, আর্থিক দুর্বলতা থেকে আর্থিক দিক থেকে

স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে তাই প্রকৃতপক্ষে এও হল উদ্যোগ। একটি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী উদ্যোগ ক্ষেত্রে যেসব ভূমিকা পালন করে সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল—

(i) স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী একটি বিধিসম্মত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠে এবং এবং সমাজের গরিবদের স্ব-নির্ভর করার লক্ষ্যে কাজ করে। এভাবে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী সামাজিক পরিবর্তনের অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে।

(ii) অর্থনৈতিক বৃদ্ধির একটি কার্যকরী বিকল্প হিসাবে এরা গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের সশক্তিকরণের কাজ করে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে।

(iii) দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদন ও ভোগস্পৃহা মেটানোর জন্য এইসব গোষ্ঠী কম পরিমাণ ঋণের ব্যবস্থা করে যার সাহায্যে তারা আপৎকালীন প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয় ও স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

(iv) দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূলস্রোতে যোগদান করার সুযোগ পায় এবং গোষ্ঠীগুলি প্রকৃতই দরিদ্র মহিলাদের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে।

(v) দরিদ্র মহিলাদের সামর্থ্য বাড়াতে যেমন স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলি সাহায্য করে তেমনি তাদেরকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি সম্বন্ধে অবহিত ও সচেতন করে তোলে। বিশেষত যেসব কর্মসূচি নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত।

(vi) বস্তুত এসব গোষ্ঠী সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের বাস্তবায়ন ঘটায়। এদের অপর একটি সাফল্য হল সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস করা। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাই এদের ভূমিকা কোনোভাবেই খাটো করা যায় না।

8.5 কারবারি ইনক্যুবেটর

ধারণা (Concept) : ইনক্যুবেটর হল একটি যন্ত্রবিশেষ যা পরীক্ষাগারে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। যারা রোগের জীবাণু নিয়ে গবেষণা করেন তারা এই য়ন্ত্রের মাধ্যমে সেগুলি সংরক্ষণ করেন। আবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অপুষ্টি নিয়ে কোনো শিশু জন্মালে তাকে ইনক্যুবেটরে রাখা হয় যাতে শিশুর অবস্থা উন্নতি হয়। কারণ এই যন্ত্রে শিশুর উপযোগী কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যেখানে সঠিক মাত্রায় উষ্ণতা, আর্দ্রতা বায়ুর চাপ ইত্যাদি বজায় রাখা সম্ভব হয়। তেমনি একটি উদ্যোগ যখন গড়ে ওঠে তখন ওই উদ্যোগকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে অন্যান্য যেসব কারবারি এগিয়ে আসেন তাদেরই কারবারি ইনক্যুবেটর বলা হয়। অন্য একটি অর্থে ইনক্যুবেটর হল যে যন্ত্রের সাহায্যে ডিম থেকে হাঁস মুরগি ইত্যাদি জন্ম নেয়। মা মুরগি ডিমে তা দিয়ে যেমন বাচ্চা মুরগির জন্ম দেয় তেমনি বিজনেস ইনক্যুবেটর একটি কারবারকে সবল করে কারবারের উপযোগী করে গড়ে তোলে। অর্থাৎ কারবারি ইনক্যুবেটর হল যারা সদ্যোজাত কারবারকে বিভিন্ন সহায়তা দিয়ে বিকশিত করে।

বস্তুত কারবারি ইনক্যুবেটর হল এমন একটি কোম্পানি যা নতুন এবং স্টার্ট-আপ কোম্পানির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা প্রদান করে, যেমন ব্যবস্থামূলক পরামর্শ, উৎপাদন বা অফিসের

জন্য জায়গা, কর্মী, প্রশিক্ষণ, বিপণন সংক্রান্ত ইত্যাদি। জাতীয় কারবারি ইনক্যুবেশন সমিতির প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে কারবারি ইনক্যুবেটর হল যা জাতীয় ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে। কারবারি ইনক্যুবেটর কোম্পানি নতুন শুরু হওয়া উদ্যোগকে জায়গার ব্যবস্থা করে দেয় ও অফিস চালানোর ক্ষেত্রে যেসব পরিষেবার প্রয়োজন হয় তার জোগান দেয়, বিপণনের ক্ষেত্রে সাহায্য করে এমনকি অনেক সময় অর্থ ও পরামর্শ দিয়েও সাহায্য করে। ইনক্যুবেটররা সাধারণত এক বা একাধিক সংগঠন যারা নতুন উদ্যোগের অংশীদার বা শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে কাজ করে। যেসব সংগঠন কারবারি ইনক্যুবেটর হিসাবে কাজ করে তাদের মধ্যে কয়েকটি সংস্থা নীচে তুলে ধরা হল।

(i) স্থানীয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়

(ii) সরকারি সংস্থা যেমন পৌরসভা

(iii) অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুক্ত সংস্থা

(iv) যেসব উদ্যোগ মুনাফার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে এবং লগ্নি সংক্রান্ত সংস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত।

8.5.1 কারবারি ইনক্যুবেটরের ভূমিকা

ভূমিকা (Role) : একটি কারবারি ইনক্যুবেটর সদ্য প্রতিষ্ঠিত নতুন কারবারি উদ্যোগকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার ভূমিকা পালন করে। বস্তুত একটি কারবারি ইনক্যুবেটর হল একটি প্রতিষ্ঠিত কারবারি সংস্থা যাদের কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সদ্য গড়ে ওঠা নতুন কারবারকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। নীচে এধরনের সংস্থার ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল—

(i) **এলেন ও রহমান** (Allen and Rahaman) এদের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে এর ফলে উদ্যোগের টিকে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও কারবারি ইনক্যুবেটর সদ্য প্রতিষ্ঠিত কারবারি সংস্থার মধ্যে গুণগত মান (value) যুক্ত করে যাতে সংস্থার উন্নয়ন সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

(ii) নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে কারবারি ইনক্যুবেটর বিভিন্ন পরিষেবা ও সহায়তা দেয় যাতে উপরিব্যয় (overhead) হ্রাস পায়। এর ফলে নতুন উদ্যোগের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

(iii) কারবারি ইনক্যুবেটরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল যে এরা ছোট ছোট ও নতুন শুরু হওয়া উদ্যোগকে কম ভাড়ায় জায়গার ব্যবস্থা করে, এমনকি তাদের অফিস ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এছাড়াও অনেক সময় এসব সংস্থা ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সহায়তাও করে থাকে।

(iv) **শেরম্যান ও চ্যাপেল** (Sherman and Chappel) একটি কারবারি সংস্থার ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে 'কারবারি ইনক্যুবেটর সংস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক হাতিয়ার যারা নতুন গড়ে ওঠা উদ্যোগকে সাহায্য করে থাকে। এরা নতুন উদ্ভাবনী সংস্থাকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তামূলক পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে যাতে তারা রুগ্ন হয়ে না পড়ে। এই

ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তারা নতুন উদ্যোগী সংস্থার কারবার উন্নয়নের ও বিপণনের পরিকল্পনা করে, ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়, মূলধন সংগ্রহ করতে সাহায্য করে এবং সর্বোপরি প্রয়োজনীয় পেশাগত সহায়তা প্রদান করে। এমনকি তারা নতুন উদ্যোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ দেয় এবং প্রশাসনিক সহায়তাও দিয়ে থাকে।

(v) **ডাল্ফ** (Dulf) বলেছেন যে একজন কারবারি ইনক্যুবেটরের মূল ভূমিকা হল যারা নতুন শুরু হওয়া উদ্যোগকে বহুধরনের পরিষেবা প্রদান করে তাদের চলার পথকে মসৃণ করে তোলে এবং যাতে তারা অস্তিত্বের স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে এবং ধারাবাহিক উন্নতির পথে চলতে পারে তার জন্য সব ধরনের সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করে। নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে এদের এই ভূমিকার কারণেই নতুন উদ্যোগের সাফল্য ও উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিরও সর্বাধিকীকরণ ঘটে।

(vi) জাতীয় কারবারি ইনক্যুবেটর সমিতির (NBIA) মতে কারবারি ইনক্যুবেটর সংস্থা আঞ্চলিক ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

8.5.2 কারবারি ইনক্যুবেটরের কার্যাবলি

একটি কারবারি ইনক্যুবেটর সংস্থার প্রধান কাজ হল একটি নতুন উদ্ভাবনী কারবারি সংস্থা কারবার আরম্ভ করার সময় যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয় সেগুলি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও সহায়তা দিয়ে তার যাত্রাপথ মসৃণ করা। এ ধরনের সংস্থা নতুন উদ্যোগের জন্য যেসব কাজ করে সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল।

(i) **উদ্যোগের অর্থসংস্থানে সাহায্য করে (Helps Financing) :** নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাড় করা সহজ নয়। একটি কারবারি ইনক্যুবেটর নতুন উদ্যোগকে অর্থসংস্থানে সাহায্যে করে এজন্য তারা বিভিন্ন দেবদূত লগ্নিকারক (Angel Investors) ও উদ্যোগে মূলধন সরবরাহকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে দেয় এবং অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে।

(ii) **কর্মী প্রশিক্ষণ (Personnel Training) :** নতুন উদ্যোগের কর্মীদের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে কাজের ক্ষেত্রে তারা অসুবিধায় পড়ে। সেকারণে তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার দায়িত্বও কারবারি ইনক্যুবেটর নিয়ে থাকে এবং একটি সুসংহত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মীদের কারবারের উপযোগী করে গড়ে তোলে।

(iii) **পরামর্শ দান (Advisory Functions) :** ইনক্যুবেটর সংস্থার যেহেতু কারবারি অভিজ্ঞতা থাকে তাই কারবার সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে নতুন উদ্যোগকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। এজন্য তারা পরামর্শ পর্ষদ গঠন করে তাদের উপর দায়িত্ব দেয়। এর ফলে নতুন উদ্যোগকে কারবারি সমস্যায় বিশেষ পড়তে হয় না।

(iv) **ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠী বা দল গঠন (Formations of Management Team) :** ইনক্যুবেটর সংস্থা নতুন উদ্যোগের ব্যবস্থাপনামূলক কাজ সম্পাদনের জন্য একটি দল তৈরি করে দেয় যাতে নতুন উদ্যোগের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় কোনো সমস্যা না হয়।

(v) **কারবারি শিষ্টাচার বা আদবকায়দা শিখতে সাহায্য করে (Helps with Business Etiquette) :** একটি ইনক্যুবেটর সংস্থা নতুন উদ্যোগের কর্মীদের কারবারি শিষ্টাচার ও আদবকায়দা শিখতে সাহায্য করে। এর ফলে নতুন উদ্যোগের কর্মীরা সহজেই কারবারি পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে। সেকারণে এরূপ সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নতুন উদ্যোগের কর্মীদের কারবার জগতের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

(vi) **প্রযুক্তি বাণিজ্যিকীকরণ সহায়তা দান (Technology Commercialisation Assistance) :** কারবারি ইনক্যুবেটর সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নতুন উদ্যোগের প্রযুক্তি বাণিজ্যিকীকরণ সহায়তা প্রদান করে যাতে প্রযুক্তি নির্ভর কারবার বিনা বাধায় চলতে পারে।

(vii) **আইন সংক্রান্ত বা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা পালনে সহায়তা দান (Helps with regulatory Compliance) :** যে কোনো উদ্যোগকেই কিছু আইনগত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। এছাড়াও দৈনন্দিন কারবারি কাজকর্মের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন আইন যেমন চুক্তি আইন, কর আইন, হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন ইত্যাদি মেনে চলতে হয়। নতুন উদ্যোগের এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান না থাকার ফলে তারা যাতে অসুবিধায় না পড়ে সেজন্য ইনক্যুবেটর সংস্থা তাদের আইনগত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে।

(viii) **মেধাস্বত্ব সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে (Helps in Management of Intellectural Property) :** নতুন উদ্যোগ সাধারণত নতুন কোনো উদ্ভাবনের উপর গড়ে ওঠে। এই উদ্ভাবন পেটেন্ট আইন অনুসারে পেটেন্টযোগ্য হলে তার যথাযথ নিবন্ধনের প্রয়োজন হয়। অন্যথায় তার উদ্ভাবনকে অন্য কারবারিরা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করতে পারে। একটি কারবারি ইনক্যুবেটর সংস্থা মেধাস্বত্ব সম্পত্তির সুরক্ষা ও ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন উদ্যোগকে সাহায্য করে।

8.6 দেবদূত লগ্নিকারী

ধারণা (Concept) : সাধারণভাবে দেবদূত বলতে এক অতিপ্রাকৃতিক মানুষকে বোঝায় যাদের অস্তিত্ব বিভিন্ন ধর্মীয় পুরাণে খুঁজে পাওয়া যায়। দেবদূতকে একজন সাহায্যকারী বন্ধু হিসাবে তুলে ধরা হয় যারা মানুষের কোনো অনিষ্ট তো করেই না বরঞ্চ তাদের উপকার করে। দেবদূত হল এমন এক স্বর্গীয় সুষমামন্ডিত ব্যক্তি যিনি ঈশ্বর বা স্বর্গের সাথে মানবজাতির যোগসূত্র স্থাপন করেন। সংক্ষেপে একজন দেবদূত হল এমন একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি যে মানবজাতির অভিভাবক হিসাবে এবং ঈশ্বরের বার্তাবাহক হিসাবে কাজ করে। এরা ভালো, উপকারী, দয়ালু এবং ধূসর নীল রঙের সুন্দর ব্যক্তি বা শিশুবেশে মর্ত্যে

আবির্ভূত হয়। ঈশ্বরের 7টি দেবদূত সপ্তাহের সাতটি দিনের সাথে সম্পর্কিত। এগুলি হল— **মাইকেল** (Michael)—রবিবার, **গ্যাব্রিয়েল** (Gabriel)—সোমবার, **রাফায়েল** (Raphael)—মঙ্গলবার, **উরিয়েল** (Uriel)—বুধবার, **সেলফিয়েল** (Selphiel)—বৃহস্পতিবার, **রাগুয়েল** বা **জেগুড়িয়েল** (Raguel or Jegudiel)—শুক্রবার এবং **বরাচিয়েল** (Barachiel)—শনিবার।

কারবারি ক্ষেত্রে দেবদূত লগ্নিকারী বলতে বোঝায় যেসব ব্যক্তির আর্থিক প্রাচুর্য রয়েছে এবং যারা নতুন উদ্যোগে অর্থ লগ্নির ঝুঁকি বহন করতে রাজি থাকে। কারণ সদ্যোজাত কারবারে সাধারণ লগ্নিকারীরা অর্থ বিনিয়োগ করতে সম্মত হয় না কারণ তারা কারবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো ধারণা গড়ে তুলতে সমর্থ হয় না। দেবদূত লগ্নিকারীরা নতুন শুরু হওয়া উদ্যোগে সাধারণত রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র বা মালিকানা শেয়ার-এর মাধ্যমে অর্থ লগ্নি করে থাকে। অনেক সময়ই নতুন উদ্যোগের উদ্যোক্তাদের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব দেবদূত লগ্নিকারীর ভূমিকা পালন করে। এরা একবারে অর্থ লগ্নি করে বা মাঝে মাঝেই মূলধনের প্রয়োজন হলে বারে বারেই অর্থ লগ্নি করে। অন্যান্য মূলধন সরবরাহকারীদের থেকে অনেক সহজ শর্তে এরা নতুন উদ্যোগে মূলধন সরবরাহ করে। এরা প্রাথমিকভাবে নতুন উদ্যোগকে সাহায্য করার অভিপ্রায়ে অর্থ সরবরাহ করে, ভবিষ্যৎ মুনাফার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। এর পুরোপুরি উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থার বিপরীত। এদের নানা নামে অভিহিত করা হয় যেমন দেবদূত লগ্নিকারী, প্রথাবহির্ভূত লগ্নিকারী, দেবদুত তহবিল প্রদানকারী, ঘরোয়া লগ্নিকারী, বীজ লগ্নিকারী, কারবারি দেবদুত ইত্যাদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন দেবদূত লগ্নিকারী হতে হলে তার কমপক্ষে 10 লক্ষ ডলার থাকতে হবে এবং তার বার্ষিক আয় 2 লক্ষ ডলার হতে হবে। এ ধরনের লগ্নিকারীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে এরা নিজের টাকা নতুন উদ্যোগ লগ্নি করে। উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থার মতো অন্যের টাকা সংগ্রহ করে এরা উদ্যোগে মূলধন সরবরাহ করে না। ভারতে বহু দেবদূত লগ্নিকারী রয়েছে যাদের মধ্যে কয়েকজন অগ্রণী ব্যক্তি হলেন—রতন টাটা, সুনীল কালরা, শরদ শর্মা, রহুন আনন্দন, মীনা গণেশ, কৃষ্ণাণ গণেশ, অনুপম মিত্তাল, রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালা ইত্যাদি।

8.6.1 দেবদূত লগ্নিকারীর ভূমিকা

একজন দেবদূত লগ্নিকারী হল এমন এক ব্যক্তি যে তার নিজস্ব অর্থ নতুন উদ্যোগে রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র বা মালিকানার অংশ-এর বিনিময়ে মূলধন হিসাবে সরবরাহ করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এরা উদ্যোক্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

এদের মুখ্য ভূমিকা হল উদ্যোগ শুরুর প্রথম দিকে যখন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংগ্রহ করা দুরূহ হয়ে ওঠে তখন দেবদূত লগ্নিকারীরা অনেকটাই সহজ শর্তে উদ্যোগে এককালীন বা শুরুর প্রথম দিকে প্রয়োজনমতো অর্থ সরবরাহ করে যাতে নতুন উদ্যোগটি কারবারি জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। উদ্যোগ শুরুর সময় উদ্যোক্তাদের যেমন বীজ মূলধনের প্রয়োজন হয় তেমনি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রপাতি ক্রয়, উৎপাদন চালানো ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। আর এই অর্থের প্রয়োজন পূরণ করে দেবদূত লগ্নিকারী। সুতরাং এদের মুখ্য ভূমিকাই হল, নতুন শুরু হওয়া উদ্যোগের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করা। অর্থের অভাবে যাতে নতুন উদ্যোগটি শুরুতেই না বন্ধ হয়ে যায় সেজন্য এই

লগ্নিকারীরা তাদের অর্থ সরবরাহ করে। তবে এরা নতুন শুরু হওয়া উদ্যোগের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে না অর্থাৎ ব্যবস্থাপনামূলক কোনো ভূমিকা পালন করে না।

8.6.2 দেবদূত লগ্নিকারীর কার্যাবলি

দেবদূত লগ্নিকারীর প্রধান কাজ হল সম্ভাবনা রয়েছে এ ধরনের নতুন কারবারি উদ্যোগে অর্থ লগ্নি করা। নীচে এদের কার্যাবলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল—

(i) নতুন উদ্যোগের জন্য প্রয়েজনীয় মূলধন সরবরাহ করা যা জ্বালানী সরবরাহের (Supply of Fuel) সাথে তুলনা করা হয়। নতুন উদ্যোগ যাতে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে বন্ধ না হয়ে যায় এবং যাতে কারবারি জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই কাজটি দেবদূত লগ্নিকারীরা সম্পাদন করে।

(ii) এরা নতুন উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও অর্থ সরবরাহের কাজ করে। যখন ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সদ্য প্রতিষ্ঠিত কারবারি উদ্যোগে ঋণ দিতে সম্মত হয় না তখন এরূপ লগ্নিকারীরা ঋণ দিতে বা মালিকানার অংশের বিনিময়ে অর্থ লগ্নি করতে আগ্রহী হয়। অর্থাৎ এরা নতুন উদ্যোগের অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে দূর করে।

(iii) ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঋণের শর্ত অনেক কঠোর এবং একটি নতুন উদ্যোগের পক্ষে সেসব শর্ত পূরণ করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কিন্তু দেবদূত লগ্নিকারীরা অনেক নমনীয় এবং তারা আনুপাতিকভাবে অনেক সহজ শর্তে নতুন উদ্যোগে ঋণ দিতে সম্মত হয়। এছাড়াও তাদের ঋণের পরিমান বা মূলধন সরবরাহের পরিমাণও স্থির নয়।

(iv) উদ্যোগে অর্থ সরবরাহ করা ছাড়াও অনেক সময় এরা বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে বা বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে উদ্যোগকে সাহায্য করে। একারণেই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে যেসব উদ্যোগ দেবদূত লগ্নিকারীদের আর্থিক সহায়তা লাভ করেছে তাদের সাফল্যের হার ও বৃদ্ধির হার অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি।

8.7 উদ্যোগ মূলধন

কারবার স্থাপন করলেই মূলধনের প্রয়োজন হয়। মূলধন সংগ্রহ কারবারের প্রাথমিক কাজ কারণ এর উপরই কারবারের স্থায়িত্ব ও বৃদ্ধি নির্ভর করে। কিন্তু নতুন কোনো উদ্যোগের ক্ষেত্রে এই সমস্যা অত্যন্ত জটিল। কারণ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নতুন উদ্যোগে অর্থ সরবরাহ করতে অনেক সময়ই রাজি হয় না কারণ এসব উদ্যোগের কোনো অতীত কারবারি রেকর্ড থাকে না এবং এরা অপরীক্ষিত। অথচ নতুন কোনো উদ্ভাবনের উপর নতুন গড়ে ওঠা উদ্যোগের মূলধনের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা না করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোগে মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে ও বেসরকারি স্তরে কিছু উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা গড়ে উঠেছে এবং এদের কাজ হল অপরীক্ষিত কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ উদ্যোগে মূলধন সরবরাহ করা। উদ্যোগে মূলধনকে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন মূলধন

হিসাবে গণ্য করা হয়। উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা নতুন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগের শুরুর ক্ষেত্রে অর্থসংস্থানের উৎস হিসাবে গণ্য হয় এবং এসব সংস্থা যে অর্থ নতুন উদ্যোগে সরবরাহ করে তাকেই উদ্যোগ মূলধন বলে। বস্তুত উচ্চ হারে প্রতিদান পাবার আশায় উচ্চ ঝুঁকিবহুল পরিস্থিতিতে আর্থিক লগ্নিই হল উদ্যোগ মূলধন। এরূপ মূলধন হল দীর্ঘমেয়াদী মালিকানা মূলধনের বিনিয়োগ এবং মূলধন সরবরাহকারী মূলধনী লাভের প্রত্যাশায় নতুন উদ্যোগে মূলধন বিনিয়োগ করে। **আই. এম. পান্ডে** (I. M. Pandey)-এর সংজ্ঞায় বলেছেন যে '**উদ্যোগ মূলধন হল ইক্যুইটি, আধা ইক্যুইটি অথবা ঋণ হিসাবে শর্তসাপেক্ষে বা শর্তহীন এমন এক বিনিয়োগ যা পেশাগত অথবা প্রযুক্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো উদ্যোক্তার দ্বারা সৃষ্ট নতুন প্রযুক্তি ও ঝুঁকিসম্পন্ন উদ্যোগে ব্যবহৃত হয়**'।

উদ্যোগ মূলধনের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে সেগুলি হল—

(i) উচ্চ ঝুঁকি

(ii) দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ

(iii) ইক্যুইটি অর্থাৎ মালিকী মূলধনের অংশগ্রহণ

(iv) ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ

(v) মধ্যস্থকারী হিসাবে জনগণের অর্থ উদ্যোগে বিনিয়োগ করে

(vi) বিনিয়োগ পরিচালনায় অংশগ্রহণ

ভারতে তিন ধরনের উদ্যোগ মূলধন দেখা যায়। এগুলি হল—(i) ইক্যুইটি বা মালিকানা (ii) শর্তাধীন ঋণ ও (iii) আয়ের দাবি। ভারতবর্ষে কয়েকটি উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হল—(i) ভারতের শিল্প অর্থ কর্পোরেশন (IFCI), (ii) ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (IDBI), (iii) ভারতের শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICICI), (iv) বিভিন্ন ব্যাঙ্কের উদ্যোগ মূলধন তহবিল যেমন কানাড়া ব্যাঙ্কের Canfina, স্টেট ব্যাঙ্কের SBI Cap. গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের India Investment ইত্যাদি। (v) বেসরকারি ক্ষেত্রে Indus Venture Capital Fund, Credit Capital Venture Fund Ltd. IL & FS, 20 Century Finance Company ইত্যাদি।

8.7.1 উদ্যোগ তহবিলের ভূমিকা

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোগ তহবিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সেকারণে একবিংশ শতকের শুরু থেকে এর উপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরোপ করতে দেখা যাচ্ছে। উদ্ভাবনীমূলক ছোট ছোট কারবার বা স্টার্ট-আপ কোম্পানির মূলধনের প্রয়োজন উদ্যোগ তহবিল অনেকটাই পূরণ করে। আবার কেবলমাত্র প্রারম্ভিক মূলধনের সংস্থান ছাড়াও কারবারের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের ক্ষেত্রেও উদ্যোগ তহবিল কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়াও উদ্যোগ তহবিল সংস্থাগুলি নতুন উদ্যোগের মূলধন সরবরাহ ছাড়াও প্রযুক্তিগত সাহায্য, বিপণন পরিকল্পনা ও অন্যান্য পরামর্শমূলক সাহায্যও দিয়ে থাকে। নীচে এদের কিছু ভূমিকা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল—

(i) নতুন উদ্ভাবনী কারবারের মূলধন সরবরাহ করে উদ্যোগকে সজীব ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ মূলধন তহবিল সংস্থা খুবই কার্যকরি ভূমিকা পালন করে।

(ii) নতুন উদ্যোগের প্রবর্তকরা তাদের নিজস্ব তহবিল উদ্যোগে লগ্নি করা সত্ত্বেও আরও মূলধনের প্রয়োজন হলে তারা উদ্যোগ তহবিলের সাহায্যে তা পূরণ করে। অর্থাৎ মূলধনের ঘাটতি পূরণে উদ্যোগ তহবিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(iii) উদ্যোগ মূলধন তহবিল গঠনকারী সংস্থা সাধারণত নতুন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগে মালিকানার বিনিময়ে মূলধন সরবরাহ করে। যেহেতু এরূপ ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ অনিশ্চত হওয়ায় ঝুঁকির পরিমাণও বেশি থাকে তাই এরা মালিকানার সাথে সাথে ঝুঁকিও বহন করে। কাজেই এরূপ তহবিল ঝুঁকি বহনের মাধ্যমে নতুন প্রতিষ্ঠিত কারবারের ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রেও কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। আর উদ্যোগ মূলধন দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করে কাজের দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিও বহন করে।

(iv) উদ্যোগ মূলধন তহবিল কেবলমাত্র নতুন উদ্যোগে মূলধন-ই সরবরাহ করে না, সাথে সাথে তাদের প্রযুক্তিগত সাহায্যও করে। অর্থাৎ নতুন শুরু হওয়া উদ্যোগ যাতে প্রকৃত অর্থেই সফল হতে পারে তার জন্য প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

(v) নতুন উদ্যোগের উদ্ভাবনী ধারণাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং চালু উদ্যোগকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ মূলধন তহবিল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

(vi) উদ্যোগ মূলধল তহবিল নতুন উদ্যোগকে আর্থিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। এর ফলে অর্থ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা অনেকাংশে দূর হয়। কারণ প্রয়োজনমতো অর্থ সরবরাহের নিশ্চয়তা দিয়ে উদ্যোগ মূলধল তহবিল নতুন উদ্যোগের সবচেয়ে সংকটজনক সমস্যা সমাধানের পথ দেখায়।

(vii) উদ্যোগ মূলধন তহবিল যেহেতু উদ্যোগের মালিকানায় অংশগ্রহণ করে সেহেতু তারা অংশীদারির ভূমিকাও পালন করে। একারণেই নতুন উদ্যোগের বিভিন্ন পরিকল্পনা, উৎপাদন সূচি, বিপণন কৌশল ইত্যাদি চূড়ান্ত করতেও এরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও এরা উদ্যোগের ব্যবস্থাপনাতেও অংশগ্রহণ করে।

(viii) উপরোক্ত ভূমিকাগুলি ছাড়াও উদ্যোগ মূলধনের অপর একটি ব্যতিক্রমী ভূমিকা হল যে এরা উদ্যোগ শুরু হওয়ার আগে উদ্যোগ শুরু করতে উদ্ভাবনের জন্য যে বীজ মূলধনের প্রয়োজন তাও সরবরাহ করে।

(ix) সবশেষে বলা যায় যে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা নতুন উদ্যোগ ও জনসাধারণের মধ্যবর্তী প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। কারণ জনসাধারণের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা এবং এভাবে যে তহবিল সৃষ্টি হয় তা থেকে নতুন উদ্যোগে মূলধন সরবরাহ করা হয়।

8.7.2 উদ্যোগ মূলধনের কার্যাবলি

বর্তমানে উদ্যোগ মূলধন সারা বিশ্বজুড়েই অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মূলধন সংগ্রহের উৎস হিসাবে গণ্য হয়েছে—বিশেষত নতুন শুরু হওয়া উদ্ভাবনমূলক ক্ষুদ্র কারবারি ও স্টার্ট-আপ কোম্পানির ক্ষেত্রে। তার

পিছনে কারণ হল যে উদ্যোগ মূলধন দেশের শিল্পোন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরীক্ষিত সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনের উপর যেসব কারবার গড়ে ওঠে তাদের সবরকম সাহায্যের ব্যবস্থা করে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা। উদ্যোগ মূলধনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নীচে তুলে ধরা হল।

(i) উদ্যোগ মূলধন নতুন গড়ে ওঠা উদ্যোগটিকে বা একটি চালু কারবার যখন নতুন কোনো উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ গ্রহণ করে তাকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও প্রযুক্তি সরবরাহ করে।

(ii) অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোগ মূলধন উদ্যোগ শুরুর আগেও উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ মূলধন সরবরাহ করে যাতে উদ্ভাবন ফলপ্রসূ হয়।

(iii) উদ্যোগ উন্নয়নের স্তরে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা উদ্যোগের জন্য একটি কারবারি পরিকল্পনা তৈরি করে অবশ্যই উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে। এই পরিকল্পনায় বাজার সংক্রান্ত সুযোগ, পণ্য ও পণ্য উন্নয়ন এবং আর্থিক প্রয়োজন ইত্যাদি চূড়ান্ত করা হয়।

(iv) এই স্তরেই উদ্যোগ মূলধন সংস্থানকারী সংস্থা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব বিচার করে এবং দেখে যে উদ্ভাবনী সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে এবং কারবারি পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম। সুতরাং উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল উদ্ভাবনের প্রকৃত মূল্যায়ন করা।

(v) উদ্যোগ মূলধন সংস্থার নতুন স্থাপিত উদ্যোগকে উদ্ভাবনের রূপায়ণ করতে সাহায্য করে। এজন্য তারা একটি সময়-সীমা তৈরি করে যাতে পূর্বনির্ধারিত বিপণন, বিক্রয় এবং মুনাফার লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হয়।

(vi) উদ্যোগ মূলধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা নতুন উদ্যোগের সামগ্রিক ঝুঁকিই বহন করে না এবং তাদের ভূমিকা কেবলমাত্র মূলধন সরবরাহকারী হিসাবে অর্থের যোগান দেওয়া নয়। তারা প্রকৃতই সক্রিয় অংশীদার হিসাবেও কাজ করে।

(vii) উদ্যোগ মূলধনী সংস্থা উদ্যোগের অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা ছাড়াও কিছু বিশেষত্বসূচক পরিষেবাও উদ্যোগে সরবরাহ করে। এগুলি হল—প্রযুক্তিগত পরামর্শ, বাণিজ্যিক, ব্যবস্থাপনামূলক ও উদ্যোগমূলক সহায়তা দান।

(viii) এ ধরনের সংস্থা নতুন উদ্যোগকে যেমন সবধরনের সাহায্য দেয় তেমনি সাথে সাথে পুরানো উদ্যোগ যাতে কাম্য সাফল্য পায় তার জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করে এবং অনুঘটকের কাজ করে।

(ix) আবার কিছু ক্ষেত্রে উদ্যোগ মূলধনী সংস্থা নতুন উদ্যোগের উদ্যোক্তাকে কর্মী নিয়োগ, কর্মী প্রশিক্ষণ ও কর্মী নির্বাচনে সাহায্য করে যাতে দক্ষ, পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ও বিশেষ গুণসম্পন্ন কর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হয়।

8.8 প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ড

ধারণা (Concept) : উদ্যোগ মূলধনের অপর একটি উৎস হল প্রাইভেট বা বেসরকারি ইক্যুইটি তহবিল। এ ধরনের তহবিল হল একটি সম্মিলিত বা সংযুক্ত বিনিয়োগ কর্মসূচি যা অংশত ইক্যুইটিতে ও অংশত ঋণের মাধ্যমে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের তহবিল হল এক ধরনের সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারি কারবার যাদের মেয়াদ 10 বছরের জন্য স্থির। শুরুতে প্রাতিষ্ঠানিক লগ্নিকারীরা সীমিত দায়বিশিষ্ট অংশীদারি কারবারকে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু কোনো অর্থ দেয় না। লগ্নিকারীদের দিক থেকে এরূপ তহবিল চিরাচরিত (Traditional) হতে পারে যেক্ষেত্রে সকল বিনিয়োগকারীরা একই শর্তে লগ্নি করে অথবা বিভিন্ন লগ্নিকারী বিভিন্ন শর্তে লগ্নি করে।

একটি বেসরকারি ইক্যুইটি তহবিল সংস্থা তহবিল বিনিয়োগ বিশারদ দ্বারা গড়ে তোলা হয় এবং পরিচালনা করা হয়। সংক্ষেপে এরূপ সংস্থার তহবিল পরিচালনা করে সাধারণ অংশীদাররা ও লগ্নি উপদেষ্টা। অনেকে সময়ই একটি বেসরকারি ইক্যুইটি সংস্থা একাধিক স্বতন্ত্র বেসরকারি ইক্যুইটি তহবিল পরিচালনা করে এবং একবার সম্পূর্ণ তহবিল লগ্নি হয়ে গেলে তারা নতুন তহবিল প্রতি 3 থেকে 5 বছরের জন্য গড়ে তোলে।

অধিকাংশ প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ড সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারি কারবার (LLP) এবং কারবার পরিচালিত হয় সংশ্লিষ্ট অংশীদারি চুক্তি অনুসারে। এরূপ সংস্থার একজন সাধারণ অংশীদার (General Partner) থাকে যারা বিত্তশালী অর্থাৎ ধনী প্রাতিষ্ঠানিক লগ্নিকারীদের থেকে মূলধন সংগ্রহ করে। এ-ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক লগ্নিকারীর উদাহরণ হল— পেনসন প্রকল্প, বিশ্ববিদ্যালয়, বিমা কোম্পানি, এনডাউমেন্ট, অতি ধনী ব্যক্তিবিশেষ ইত্যাদি যারা সীমিত দায়যুক্ত অংশীদার হিসাবে (LPs) তহবিলে অর্থ লগ্নি করে। এরূপ তহবিলের মধ্যে নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় :

(i) অংশীদারিত্বের মেয়াদ—সাধারণভাবে 10 বছর, তবে এরপরও মেয়াদ 1 বছর করে কয়েক বছর বাড়ানো যায়।

(ii) তহবিল পরিচালনার জন্য লগ্নিকারীদের একটি নির্দিষ্ট হারে ব্যবস্থাপনা ফী দিতে হয় বা সাধারণত তহবিল মূলধনের 1 থেকে 2 শতাংশ হয়।

(iii) এ ধরনের সংস্থায় 5 ধরনের অংশীদার থাকে—সাধারণ অংশীদার (GP) ও সীমিত অংশীদার (LP) তহবিলের আয় থেকে প্রথমে সীমিত অংশীদারদের প্রদান করা হয় এবং ন্যূনতম আয়ের হার হল 8 শতাংশ। এই 8 শতাংশকে বলে পছন্দের আয়। অন্যদিকে একজন সাধারণ অংশীদার (GP) পছন্দের আয়ের হার থেকে বেশি হারে মুনাফার অংশ হিসাবে পায় এবং এই হার সাধারণত 20 শতাংশ হয়। তবে উপরোক্ত সমস্ত হারই অংশীদারি চুক্তির নিরিখে স্থির হয়।

(iv) এ ধরনের তহবিলে লগ্নিকারী অনেক উচ্চ হারে আয় করার সুযোগ পায়। অবশ্য তাদের ঝুঁকিও অনেক বেশি, এমনকি তাদের পুরোপুরি ক্ষতি হওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

এসব কারণে এ ধরনের তহবিল সেইসব লগ্নিকারীদের ক্ষেত্রেই উপযোগী বলে গণ্য হয় যারা দীর্ঘকালীন মেয়াদে তাদের অর্থ লগ্নি করতে সক্ষম হয় এবং তাদের লগ্নির বড় অংশই ক্ষতি হতে পারে এই ঝুঁকি বহন করতে সমর্থ হয়। তবে যেহেতু একটি প্রাইভেট ইক্যুইটি সংস্থা যদি ভালোভাবে পরিচালিত হয় তাহলে বাৎসরিক আয় 30% পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কয়েকটি প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ডের উদাহরণ নীচে দেওয়া হল—

(i) কোটাক প্রাইভেট ইক্যুইটি ফার্ম—ভারতের সবচেয়ে বড় এবং এটি হল কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের অংশ।

(ii) সেকুওয়া ক্যাপিটাল ইন্ডিয়া

(iii) হিলটন ভেঞ্চার পার্টনারস

(iv) টাইগার গ্লোবাল ভেঞ্চার ইত্যাদি।

8.9 সারাংশ

এই এককটি পড়ে আপনারা যে বিষয়গুলি জানতে পারলেন তাহল—

- উদ্যোক্তা সমিতির ভূমিকা
- উদ্যোগ গ্রহণে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর ভূমিকা
- কারবারি ইনক্যুবেটরের ভূমিকা এবং কার্যাবলি
- দেবদূত লগ্নিকারীর ভূমিকা এবং কার্যাবলি
- উদ্যোগ মূলধনের ভূমিকা এবং কার্যাবলি, এবং
- প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ড সম্পর্কে ধারণা

8.10 প্রশ্নাবলী

ক. এমসিকিউ প্রশ্নাবলি

1. ভারতের উদ্যোক্তাদের সমিতি কত সালে এবং কোথায় গঠিত হয়েছিল?

   (ক) দিল্লিতে, 2010 সালে (খ) দিল্লিতে, 2016 সালে

   (গ) রাজকোটে, 2012 সালে (ঘ) চেন্নাইতে, 2014 সালে

2. গ্রামভিত্তিক স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী সাধারণভাবে কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়?

   (ক) 10 জন মহিলা (খ) 20 জন মহিলা

   (গ) 10 থেকে 20 জন মহিলা (ঘ) 15 জন মহিলা

3. স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে নীচের কোন উদ্দেশ্যটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ?
   (ক) দারিদ্র্য দূরীকরণ (খ) নারী সশক্তিকরণ
   (গ) লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস (ঘ) মহিলা ও শিশুদের উন্নয়ন
4. ইনক্যুবেটর সম্বন্ধে নীচের কোন বক্তব্যটি তুমি সঠিক বলে মনে করো?
   (ক) একটি যন্ত্র বিশেষ (খ) কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টিকারী একটি যন্ত্র
   (গ) (ক) ও (খ) (ঘ) কোনোটিই নয়
5. যেসব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ইনক্যুবেটর হিসাবে কাজ করে তাদের মধ্যে নীচের কোনটি পড়ে না?
   (ক) বিশ্ববিদ্যালয় (খ) পৌরসভা
   (গ) সরকারি বিভাগ (ঘ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুক্ত সংস্থা
6. একটি ইক্যুবেটর সংস্থা নতুন উদ্যোগকে যেসব সহায়তা প্রদান করে তার মধ্যে নীচের কোনটি অন্তর্ভুক্ত হয়?
   (ক) পরামর্শ দান (খ) কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে
   (গ) ব্যবস্থাপনার জন্য দল গঠন (ঘ) সবগুলিই
7. দেবদূত লগ্নিকারী সম্বন্ধে নীচের কোন্ বক্তব্যটি তুমি যথার্থ মনে করো?
   (ক) যেসব ব্যক্তির আর্থিক প্রাচুর্য রয়েছে এবং যারা নতুন উদ্যোগে অর্থ লগ্নি করতে চায়
   (খ) এরা অর্থলগ্নির ঝুঁকি অল্প বহন করে লভ্যাংশের আশায়
   (গ) এরা সাধারণত উদ্যোগে স্বল্প মেয়াদে অর্থলগ্নি করে
   (ঘ) সবগুলিই
8. ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেবদূত লগ্নিকারী হিসাবে গণ্য হয় এমন ব্যক্তির নাম নীচের বিকল্পগুলি থেকে বেছে নাও।
   (ক) রাকেশ ঝুনঝুওয়ালা (খ) শরদ শর্মা
   (গ) সুনীল কালরা (ঘ) সকলেই
9. একজন দেবদূত লগ্নিকারী নতুন উদ্যোগে কীসের মাধ্যমে অর্থ লগ্নি করে?
   (ক) ইক্যুইটির মাধ্যমে (খ) রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্রের মাধ্যমে
   (গ) (কা) ও (খ) (ঘ) অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মাধ্যমে
10. দেবদূত লগ্নিকারীদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে নীচের কোন বিকল্পটি তুমি সঠিক বলে মনে করো?
   (ক) এরা নিজস্ব অর্থ লগ্নি করে
   (খ) এরা জনগণের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে উদ্যোগে লগ্নি করে
   (গ) এরা সহজ শর্তে উদ্যোগে ঋণ দেয়
   (ঘ) কোনোটিই নয়

11. নীচের কোন বক্তব্যটি উদ্যোগ মূলধন সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা দেয়?

(ক) উদ্যোগ মূলধন হল উচ্চ ঝুঁকির মূলধন

(খ) ইক্যুইটি, আধা ইক্যুইটি অথবা ঋণ হিসাবে শর্তসাপেক্ষে বা শর্তহীন বিনিয়োগ যা নতুন প্রযুক্তি ও ঝুঁকিসম্পন্ন উদ্যোগ ব্যবহৃত হয়

(গ) উচ্চ হারের প্রতিদানের আশায় যে মূলধন বিনিয়োগ করা হয় তাই হল উদ্যোগ মূলধন

(ঘ) কোনোটিই নয়

12. নীচে উল্লিখিত কোন্‌টি উদ্যোগ মূলধনের বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য হয়?

(ক) উচ্চ ঝুঁকি (খ) দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ

(গ) ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ (ঘ) সবগুলিই

13. নীচের সংস্থাগুলির মধ্যে কোন্‌টি উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা হিসাবে গণ্য হয় না?

(ক) ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (খ) ভারতের জীবনবিমা নিগম

(গ) কানাড়া ব্যাঙ্কের Canfina (ঘ) গ্রীন্ডলেজ ব্যাঙ্কের Indian Investment

14. বেসরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা হিসাবে নীচের কোনটি সঠিক নয়?

(ক) Indus Venture Capital Fund (খ) IL & FS

(গ) 20th Century Finance Company (ঘ) কোনোটিই সঠিক নয়

15. উদ্যোগ মূলধনের কাজ হিসাবে নীচের কোনটি গণ্য হয়?

(ক) উদ্যোগ মূলধন নতুন উদ্যোগে অর্থ ও প্রযুক্তি সরবরাহ করে

(খ) উদ্যোগ মূলধন উদ্যোগ শুরুর আগেও বীজ মূলধন হিসাবে অর্থ সরবরাহ করে

(গ) একটি চালু উদ্যোগের নতুন প্রযুক্তি সংগ্রহের জন্যও অর্থ সরবরাহ করে

(ঘ) সবগুলিই

16. প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ড বোঝাতে নীচের কোন বক্তব্যটি সঠিক?

(ক) একটি সম্মিলিত বা সংযুক্ত বিনিয়োগ কর্মসূচি যা অংশত মালিকানায় ও অংশত ঋণের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়

(খ) এ ধরনের তহবিল হল এক ধরনের সীমিত দায় বিশিষ্ট অংশীদারি কারবার (LLP)

(গ) এরূপ তহবিল পরিচালনা করা হয় বিনিয়োগ বিশারদ ও সাধারণত অংশীদার

(ঘ) কোনোটিই নয়

17. নীচের উল্লিখিত প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ডের বৈশিষ্ট্য হিসাবে কোনটি গণ্য হয় না?

(ক) এরূপ তহবিলের মেয়াদ 10 বছর এবং তা আর বাড়ানো যায় না

(খ) তহবিল পরিচালনার ফী হল 1 থেকে 2 শতাংশ

(গ) নূন্যতম আয়ের হার হল 8 শতাংশ যাকে বলে পছন্দের হার

(ঘ) সাধারণ অংশীদারদের ক্ষেত্রে আয়ের হার 20 শতাংশের মতো

18. ভারতের সবচেয়ে বড় প্রাইভেট ইক্যুইটি ফার্মটি হল—

(ক) সেকুওয়া ক্যাপিটাল ইন্ডিয়া (খ) হিলটন ভেঞ্চার পার্টনারস্

(গ) কোটাক প্রাইভেট ইক্যুইটি ফার্ম (ঘ) টাইগার গ্লোবাল ভেঞ্চার

উত্তর: 1. (খ) 2. (গ) 3. (খ) 4. (গ) 5. (গ) 6. (ঘ)
7. (ক) 8. (ঘ) 9. (গ) 10. (ক) 11. (খ) 12. (ঘ)
13. (খ) 14. (ঘ) 15. (ঘ) 16. (খ) 17. (ক) 18. (গ)

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. ভারতের উদ্যোক্তাদের সমিতি কত সালে কোথায় ঘরোয়া কোম্পানি হিসেবে গঠিত হয়?
2. NABARD পুরো কথাটি কি?
3. ইনক্যুবেটর কাকে বলে?
4. দেবদূত লগ্নিকারী বলতে কী বোঝায়?
5. উদ্যোগ মূলধন কাকে বলে?
6. উদ্যোগ মূলধনের যে কোনো দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
7. ভারতে কয়েকটি উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ দিন।
8. সীমিত দায়যুক্ত অংশীদারি কারবার কাকে বলে?

গ. দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. উদ্যোক্তা সমিতির ভূমিকা আলোচনা করুন।
2. উদ্যোগ গ্রহণে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর ভূমিকা আলোচনা করুন।
3. কারবারি ইনক্যুবেটরের ভূমিকা ও কার্যাবলি আলোচনা করুন।
4. উদ্যোগ মূলধনের ভূমিকা ও কার্যাবলি আলোচনা করুন।
5. দেবদূত লগ্নিকারীর ভূমিকা ও কার্যাবলি আলোচনা করুন।
6. প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ড সম্পর্কে টীকা লিখুন।

8.11 গ্রন্থপঞ্জী

1. Kuratko and Rao, Entrepreneurship: A South Asian Perspective, Cengage Learning
2. Robert Hisrich, Michael Peters, Dean Shepherd, Entrepreneurship, McGraw-Hill Education.
3. Desai, Vasant. Dyanamics of Entrepreneurial Development and Management, Himalaya Publishing House,
4. Dollinger, Mare J. Entrepreneurship : Strategics and Resources, Illinois, Irwin.
5. Holt, David H. Entrepreneurship : New Venture Creation, Prentice-Hall of India, New Delhi.
6. Bhadra & Satpati, Entrepreneurship Development & Business Ethics (Bengali Version), Dishari Prakashani, Kolkata.
7. Gangopadhyay and Halder, Entrepreneurship Development & Business Communication (Bengali Version) Dey Book Concern, Kolkata.
8. Chakraborty, Manas, Entrepreneurship Development and Business Communication (Bengali Version) B. M. Publication Pvt. Ltd. Kolkata.